ফিকহে হানাফি কুরআন ও হাদিসেরই নির্যাস

ফিকহে হানাফির শ্রেষ্ঠত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

ফিকহে হানাফি কুরআন ও হাদিসেরই নির্যাস

ফিকহে হানাফির শ্রেষ্ঠত্ব

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

অনুবাদ
মাওলানা মুবাশশির বিন মিল্লী
উলুমুল হাদিস : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া, ঢাকা।

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল হেরা সম্পাদনা বিভাগ

মাকতাবাতুল হেরা

ফিকহে হানাফির শ্রেষ্ঠত্ব

মূল : মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

অনুবাদ : মাওলানা মুবাশশির বিন মিল্লী

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল হেরা সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক : হাবিবুল্লাহ মিসবাহ
প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস সানি ১৪৩৮, মার্চ ২০১৭
চতুর্থ প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৪৬, ডিসেম্বর ২০২৪
স্বত্ব : সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

ISBN : 978-984-8037-36-2

মাকতাবাতুল হেরা

- **ইসলামী টাওয়ার**, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং-০৩,
  ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৫৫-২৪২৫২২, ০১৯৬১-৪৬৭১৮১
- **কওমী মার্কেট**, প্রথম তলা, দোকান নং-৩, ৬৫/১ প্যারিদাস রোড,
  বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৫৫-২৪২৫২৩, ০১৯৬১-৪৬৭১৮১

মূল্য	৫০০ [পাঁচশ] টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ড. আসাদুল্লাহ গালিব, মুতীউর রহমান মাদানী, কাযি ইবরাহীম, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ, মুযাফফর বিন মুহসিন, আমানুল্লাহ মাদানী-সহ সকল গায়রে মুকাল্লিদ শায়খদের উদ্দেশে, বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মুসলমানের অনুসৃত হানাফি মাযহাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যারা প্রকারান্তরে এ বিপুল সংখ্যক মুসলমানের ঈমান ও আমল ধ্বংসের জঘন্য খেলায় লিপ্ত হয়েছেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে তাদের শক্তি খর্ব করার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের দোসরের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন...

আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুন। আমীন॥

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم . أما بعد!

গায়রে মুকাল্লিদিয়াত বর্তমান যুগের এক ভয়াবহ ফেতনা। এ ফেতনার ধ্বজাধারীদের প্রধান কাজ হচ্ছে, যুগ যুগ ধরে উম্মতে মুসলিমার স্বীকৃত ও অনুসৃত মাযহাবসমূহ ও ইমামগণের ব্যাপারে অযৌক্তিক আপত্তি তুলে সাধারণ মুসলমানদের মন থেকে মাযহাব ও ইমামগণের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট করে দেওয়া এবং তাদেরকে দ্বীনের নিরাপদ ও সুরক্ষিত গণ্ডি থেকে বের করে প্রবৃত্তি পূজার ঈমান বিধ্বংসী অঙ্গনে ছেড়ে দেওয়া। তারা সাধারণ মুসলমানদের সামনে হাদীস অনুসরণের জিগির তোলে, কিন্তু এর আড়ালে তারা হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যাকার আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ব্যাখ্যাগুলোর ওপর অহেতুক আপত্তি তুলে মুসলমানদের ওপর নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেয়।

পাক-ভারত উপমহাদেশে গায়রে মুকাল্লিদদের ইতিহাস অনেক পুরানো। সেই ইংরেজ আমলেও তাদের জোর অপতৎপরতার ইতিহাস আমাদের চোখে পড়ে। তাদের ইতিহাসে নজর বুলালে যে বিষয়টি খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তা হচ্ছে, তাদের সবসময়ের প্রচেষ্টা হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করে তাদের মধ্যে দলাদলি ও সংঘাত সৃষ্টি করে দেওয়া। ইতিহাস সাক্ষী, মূলত এ অপকর্মটির সুবাদেই ইংরেজরা তাদেরকে তাদের মতবাদের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল।

সূচনালগ্ন থেকেই গায়রে মুকাল্লিদদের প্রধান টার্গেট ছিল হানাফি মাযহাব। কারণ এটি বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মুসলিমের অনুসৃত মাযহাব। যার ফলে এ মাযহাবটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারা মানে একসাথে বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ মুসলিমের আকিদা ও আমলে সংশয় সৃষ্টি করতে পারা। একারণেই গায়রে মুকাল্লিদরা হানাফি মাযহাব ও এর ইমামগণকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এমন কোনো হীন পন্থা নেই যা অবলম্বন করেনি। তারা ইমাম আযম আবূ হানীফা

রহ.কে হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞ বলে অপপ্রচার চালিয়েছে। তাঁর যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর উক্তির অপব্যাখ্যা করেছে। ইমাম ইবনে আবী শায়বা রহ. ও আরো অনেক ইমামের কিতাবের খণ্ডিত অংশ ও তাদের বক্তব্যের অংশবিশেষ বিভ্রান্তিমূলকভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মনে হানাফি মাযহাবের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা হানাফি মাযহাবের ২৭টি মাসআলাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে 'কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ওয়া হাদীস কা নিচোড় হায়' নামক একটি বই রচনা করে হানাফি মাযহাবকে কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী একটি মাযহাব হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াসী হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, তিনি এই দীনকে রক্ষা করবেন আর নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক যুগেই এই দীনের সহিহ ইলমের ধারকদেরকে সৃষ্টি করবেন, যারা দীনকে সকল প্রকার অপব্যাখ্যা, বিকৃতি সাধন ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন। একারণেই আমরা দেখি, যখনই গায়রে মুকাল্লিদরা কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে হানাফি মাযহাবকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়েছে তখনই সমকালীন ওলামায়ে আহলে হক্ব তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং বক্তৃতা ও রচনার মাধ্যমে তাদের অপব্যাখ্যার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে উম্মতের সামনে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে তৎপর হয়েছেন।

এই বইটি ওলামায়ে আহলে হক্বের সেই তৎপরতারই একটি অংশ। মুতাকাল্লিমে ইসলাম আল্লামা ইলিয়াস ঘুম্মান দা. বা. বইটিতে গায়রে মুকাল্লিদদের উপরোক্ত বইয়ে হানাফি মাযহাবের ওপর উত্থাপিত ২৭টি বিভ্রান্তিকর আপত্তির দালিলিক দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তাঁর এ জবাবগুলোর মাধ্যমে আলোচ্য মাসআলাগুলোতে হানাফি মাযহাবের ওপর উত্থাপিত আপত্তিগুলোর যেমন সুরাহা হয়ে যায়, তেমনিভাবে হানাফি মাযহাব ও এর ইমামগণের ওপর আস্থাও বহুগুণে বেড়ে যায় এবং হৃদয়ে একথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, হানাফি মাযহাব মূলত কুরআন ও হাদীসেরই নির্যাস এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য সহিহ দীন মেনে চলার সর্বোত্তম পথ।

এ মূল্যবান বইটি এক সাক্ষাতে মাকতাবাতুল হেরার স্বত্বাধিকারী মুফতি হাবীবুল্লাহ মিসবাহ দা. বা. অধমের হাতে তুলে দেন এবং এর অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে ভাবতে বলেন। বিষয়ের গুরুত্ব, এ বিষয়ে উম্মাহর জানার প্রয়োজনীয়তা এবং মজলুম হানাফি মাযহাবের প্রতি আমার ভালোবাসা সবকিছু বিবেচনা করে আমি বইটি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেই এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হই। আলহামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের সময় পাঠকের হাতে একটি নির্ভুল বই তুলে দেওয়ার ইচ্ছা বরাবরই মনে লালন করেছি এবং সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। তবে মানুষ হিসেবে যেহেতু কেউই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়, তাই এরপরেও ভুল থেকে যেতে পারে, তাই কারো চোখে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অবহিত করার অনুরোধ রইল।

পরিশেষে শোকর আদায় করছি মুফতি হাবীবুল্লাহ মিসবাহ দা. বা. এর, যার সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার ফলে অধমের পক্ষে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদের কাজে লাগা সম্ভব হয়েছে এবং যিনি বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে এর উপকারিতাকে ব্যাপক করেছেন। আল্লাহ তাঁর ইলম, খেদমত ও হায়াতে বরকত দান করুন এবং মাকতাবাতুল হেরার ইলমী অগ্রযাত্রাকে আরো গতিময় ও চিরস্থায়ী করুন। আমীন।

—অনুবাদক

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

তালেবুর রহমানের কিতাব 'কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ও হাদিস কা নিচোড় হায়'-এর প্রথম পৃষ্ঠা থেকে অষ্টাদশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিতবটির ভূমিকা। এই ভূমিকাটি লিখেছেন 'আল মাহাদুল ইসলামি ইসলামাবাদ'-এর পরিচালক ড. আবু উসামা। এরপর ১৯-২৩ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঁচ পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ রয়েছে; কিন্তু এর উপর কোনো লাল দাগ দেওয়া হয়নি এবং সেখানে একথাও বলা হয়নি যে, এটা কে লিখেছেন। একারণে এর দায়িত্বও তালেবুর রহমানের উপরই বর্তায়। নিবন্ধটি পড়লে মনে হয়, কিতাবের প্রাথমিক আলোচনা তিনি নিজের পক্ষ থেকেই লিখেছেন। এরপর ২৩ পৃষ্ঠা থেকে মূল কিতাব শুরু করা হয়েছে, যা ৫০ পৃষ্ঠায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠা থেকে ১২৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কিতাবের তথ্যসূত্র বর্ণনা করা হয়েছে, যা বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা মূল কিতাবে তালেবুর রহমানের সকল অভিযোগের জবাব দিয়েছি। এখানে শুধু ভূমিকা এবং প্রাথমিক কিছু কথার জবাব পেশ করছি।

ভূমিকার পর্যালোচনা

ভূমিকায় ড. আবু উসামা কোনো নতুন কথা উল্লেখ করেননি। এসব কথার সবটাই পূর্ব থেকেই গায়রে মুকাল্লিদরা প্রচার করে আসছে এবং হানাফি আলেমগণ এগুলোর জবাবও দিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমরা এখানে বিস্তারিত জবাব দেওয়ার পরিবর্তে কিছু মৌলিক কথা পেশ করছি। জনাব আবু উসামা অধিকাংশ তথ্য গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম মায়মান জুনাগড়ীর কিতাব থেকে নিয়েছেন। কিছু কিছু বিষয় তিনি ইরশাদুল হক আসারীর পুস্তিকা থেকে চুরি করেছেন। আবু উসামার সকল লেখার সারাংশ নিম্নোক্ত কথায় এসে যায়। (আবু উসামা ছাড়া অন্যান্য গায়রে মুকাল্লিদও হিদায়ার উপর যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন, সেগুলোর সারাংশও এটাই।)

১. ফিকহে হানাফির কিতাবসমূহে বিশেষ করে হিদায়ায় মিথ্যা, জাল এবং দুর্বল হাদিস রয়েছে।

২. হিদায়ায় অনেক নোংরা মাসআলা রয়েছে।

৩. হিদায়ায় অনুমাননির্ভর মাসআলা রয়েছে।

৪. হিদায়ায় কুরআন ও হাদিসবিরোধী মাসআলা রয়েছে।

৫. হিদায়া সনদবিহীন একটা কিতাব। অর্থাৎ হিদায়া ষষ্ঠ শতাব্দীর কিতাব, যা ইমাম আবু হানিফার যুগ থেকে প্রায় সাড়ে চারশ বছর পর লেখা হয়েছে। এতে যেসকল মাসআলা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর সনদ উল্লেখ করা হয়নি। তাহলে এটা কী করে বিশ্বাস করা যায় যে, এসব মাসআলা বাস্তবেই ইমাম আবু হানিফার?

৬. হানাফিরা হিদায়াকে কুরআনের সমতুল্য মনে করে।

৭. খোদ হানাফি আলেমরাই ফিকহে হানাফির কিতাবসমূহের উপর বিশেষ করে হিদায়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

এ সকল আপত্তির সবক'টিই অথবা এগুলো ছাড়া আর যত আপত্তি রয়েছে, যা ড. আবু উসামা ও আপত্তি উত্থাপনকারী অন্যান্য গায়রে মুকাল্লিদ আলেম ফিকহে হানাফির কিতাবাদির ব্যাপারে করে থাকে, ঠিক এই আপত্তিগুলোই মুনকিরিনে হাদিস তথা হাদিস অস্বীকারকারীরা হাদিসের কিতাবসমূহের উপরও করে থাকে। যেসকল আলেম হাদিস অস্বীকারকারীদের কিতাবসমূহ মুতালাআ করেছেন, বিষয়টি তাদের খুব ভালো করেই জানা থাকার কথা। যদি আবু উসামা এটা অস্বীকার করতে চান তাহলে আমরা এটা হাদিস অস্বীকারকারীদের কিতাবসমূহ দিয়ে প্রমাণ করতে রাজি আছি। দুঃখজনক সত্য হল, আপত্তি উত্থাপনকারীরা আজ পর্যন্ত হাদিস হেফাজতের উদ্দেশ্যে হাদিস অস্বীকারকারীদের কোনো কিতাবের জবাব দেননি। আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে লেখাটাই তাদের প্রধান কাজ। ইতিপূর্বেও তারা যেসমস্ত কিতাব লিখেছে, সেগুলো দেওবন্দের হক্কানী আলেমদের বিরুদ্ধেই লিখেছে। উদাহরণত,

১. الديوبندية تعريفها، عقائدها (আরবি ভাষায় লিখিত)

২. عقائد علماء الديوبند من كتاب الديوبندية، এটা الديوبندية এর উর্দু অনুবাদ।

৩. তাবলিগী জামাত, তারিখ ও আকাইদ ইত্যাদি।

৪. কিছুদিন পূর্বে তারা 'কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ও হাদিস কা নিচোড় হায়' কিতাবটি প্রকাশ করেছে।

আমি তাদের উত্তরে 'আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ কে মুকাবেলে মে ফিরকায়ে আহলে হাদিস : পাক ও হিন্দ কা তাহকীকী জায়েযা' (ওলামায়ে দেওবন্দের আকিদার মোকাবেলায় পাক-ভারত উপমহাদেশের আহলে হাদিস ফিরকা : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) নামে একটি কিতাব প্রকাশ করেছি। তাবলিগ জামাতের উপর আপত্তিসমূহের জবাবেও একটি বই প্রকাশ করেছি। আর এখন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এ কিতাবের জবাবও প্রকাশ করা হচ্ছে। যদি গায়রে মুকাল্লিদরা ইমাম আবু হানিফা এবং অন্যান্য আহলে হক আলেমের প্রতি গালিগালাজ বন্ধ করে এবং ফিকহে হানাফির বিরুদ্ধে বিষ না ছড়ায় তাহলে বিপরীত দিক থেকেও কোনো কিতাব জনসম্মুখে আসবে না। এসকল কিতাব জনসম্মুখে আসার সকল দায়ভার এইসব আপত্তি উত্থাপনকারীর মতো ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে এসকল আপত্তির জবাব পেশ করছি।

আপত্তি নং এক

হিদায়ায় মওযু (জাল) এবং যয়িফ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে ফিকহে হানাফির অন্যান্য কিতাবেও এসব রয়েছে।

জবাব : এই জবাবটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আমরা কিছু মৌলিক কথা বলবো, যেগুলোর মাধ্যমে সকল আপত্তির জবাব এমনিতেই হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ভাগে আমরা বিশেষভাবে হিদায়ার হাদিসসমূহের মাসআলার ব্যাপারে আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

প্রথম ভাগ : নবিদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি দেওবন্দিগণ ইসলামের দলিলচতুষ্টয় (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস) এর আলোকে এই আকিদা

ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি যে, পৃথিবীতে শুধু নবিগণই মাসুম বা নিষ্পাপ হন। নবিদের পর কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষের মধ্যে কেউ নিষ্পাপ নেই।

সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবায়েকেরামের ব্যাপারে আমাদের আকিদা-বিশ্বাস হচ্ছে– সকল সাহাবিই জান্নাতী, সত্যের মাপকাঠি; তাদের সমালোচনা করা নাজায়েয ও হারাম। আমরা কোনো সাহাবির সমালোচনা সহ্য করি না। সাহাবায়েকেরাম শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বই নন, তারা হচ্ছেন কুরআনি ব্যক্তিত্ব। যারা সাহাবিদের সমালোচনা করে, আমরা তাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে খারিজ মনে করি। যারা সাহাবিদের কাফের বলে, আমরা তাদের কাফের মনে করি। তবে আমরা সাহাবিদের নবিগণের মতো মাসুম বা নিষ্পাপ মনে করি না। যেমন শিয়ারা তাদের ইমামদের মাসুম মনে করে।

আহলে বাইতের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবা ও আহলে বাইত উভয়ের ব্যাপারে একই রকম মহব্বত লালন করি এবং এদের উভয়দলের সাথে শত্রুতা পোষণ করাকে পথভ্রষ্টতা মনে করি।

তাবেয়ি ও তাবয়ে তাবেয়িদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক তাদের যামানাকে খায়রুল কুরুনের যামানা বলা হয়। এজন্য তারা হচ্ছেন উত্তম যামানার মানুষ। তবে আমরা তাদের মাসুম মনে করি না। আমরা তাদের ব্যাপারে সমালোচনা সহ্য করি, কিন্তু তাদের অপমান করাটা সহ্য করি না। তবে সমালোচনাও কেবল তখনই সহ্য করি, যখন কেউ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি এবং জরাহ-তাদীলের মূলনীতি বজায় রেখে তাদের সমালোচনা করে।

মুজতাহিদ ইমামদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইমামচতুষ্টয় তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ি এবং ইমাম আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি দেওবন্দিগণ তাদের খোদা মনে করি না, রাসুলও মনে করি না। আমরা না তাদের কালেমা পড়েছি এবং না তাদের নিষ্পাপ মনে করি, যেমন শিয়ারা তাদের ইমামদের নিষ্পাপ মনে করে। তাদের ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, একটা হচ্ছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা, আরেকটা হচ্ছে বাস্তবেই ভুল হওয়া। কারো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার বাস্তবেই ভুল হয়ে যাওয়া জরুরি নয়। ইসলামের জন্য মুজতাহিদ ইমামদের খেদমতের পরিধি বিশাল। তারা সবাই আল্লাহর অলি ছিলেন। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার উপর তাদের অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। উম্মতের আলেমগণ তাদের মুজতাহিদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইজতিহাদি মাসআলায় তাদের গবেষণার উপর আমল করাকে তাকলিদ বলা হয়। (তাকলীদ সম্পর্কে জানতে হলে পড়ুন– তাকলিদ কি শরয়ি হায়সিয়ত : মাওলানা তাকি উসমানি ও আলকালামুল মুফিদ ফী ইসবাতিত তাকলীদ : মাওলানা সারফারাজ খান সফদার রহ.)।

যাইহোক, তারা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাদের সমালোচনা করা অথবা তাদের এমনভাবে জরাহ করা, যা মানহানির পর্যায়ে পৌঁছে, আমাদের মতে কোনোভাবেই জায়েয নেই। যারা অকারণে তাদের বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করে তারা ভ্রষ্ট। হ্যাঁ, আহলে হক ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত জরাহ-তাদিলের যেসকল মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন, এগুলো বজায় রেখে যদি কেউ তাদের উপর জরাহ করে (মনে রাখা দরকার, জরাহ করা ভিন্ন জিনিস আর মানহানি করা এবং কাফের বলা ভিন্ন জিনিস) তাহলে আমরা একে শুধু জায়েয মনে করি। এই জরাহ সঠিক না ভুল, সেটা ভিন্ন কথা।

তাদের পরবর্তী লোকদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

সাহাবা, তাবেয়ি, তাবয়ে তাবেয়ি, আইম্মায়ে মুজতাহিদ রাহিমাহুমুল্লাহর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবেন, তারা যে শ্রেণিরই হোক, যেমন– মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ফকিহ, লেখক, হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি

ও হামবলি ইত্যাদি যে শ্রেণিরই হোক, তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, এরা কেউই নিষ্পাপ নন। তাদের ভুল হতে পারে এবং তাদের কারো কারো বাস্তবেই ভুল হয়েছে। এ সকল হযরতের উপর মূলনীতি রক্ষা করে সমালোচনা করা যেতে পারে। তাদের কথা গ্রহণ করারও সুযোগ রয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করারও সুযোগ রয়েছে।

তাদের কিতাবসমূহে সবধরনের কথাই পাওয়া যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এগুলোকে এভাবে ভাগ করা যায়–

১. যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর কোন কথা তাদের কিতাবে বর্ণনা করেন তাহলে তা মানা জরুরি। কারণ এটা তো তাদের কথা নয়, বরং এটা বর্ণনা মাত্র।

২. যদি তাদের কিতাবে এমন কোন কথা চোখে পড়ে যা বাহ্যত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মনে হয়, তাহলে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব, একে কুরআন-সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য। যদি এটা সম্ভব না হয় এবং তা কুরআন-সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ থেকেই যায়, তাহলে আমরা তা পরিত্যাগ করব এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করব। কিন্তু এ কিতাবের মুসান্নিফকে কাফের বলব না এবং তাঁর মানহানিও করব না। কেননা সে মুসলিম আলেম। আমরা তার ক্ষেত্রে একজন মুসলমান হিসাবে তার প্রাপ্য হকের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

৩. যদি তাদের কিতাবে এমন কোন কথা পাওয়া যায়, যা দলিল চতুষ্টয় (কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস) দ্বারা তো প্রমাণিত নয়, কিন্তু এগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণও নয় তাহলে এক্ষেত্রে একজন মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে চাইলে কথাটি মেনে নিবে অথবা কথাটিকে প্রত্যাখ্যান করবে, কিন্তু আমাদের নিয়ম হল, আমরা তা মেনে নেই।

৪. যদি একটি বিষয়ে কোন আলেমের থেকে দু-ধরনের মত পাওয়া যায় তাহলে তার শেষ মতকে গ্রহণ করা হবে। যদি এটা জানার কোন উপায় না থাকে তাহলে তার মতকে পরিত্যাগ করা হবে।

৫. যদি কোন আলেমে দীনের একটি মত কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায় আর কোথাও বিস্তারিত আকারে পাওয়া যায়, তাহলে বিস্তারিত আকারে যা পাওয়া যাবে, তা গ্রহণ করা হবে।

৬. যদি কোন আলেমের স্বরচিত কিতাব এবং তার মৌখিক আলোচনা অথবা এ ধরনের অন্যান্য জিনিসগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য করা যায় তাহলে তার স্বরচিত কিতাবকেই গ্রহণ করা হবে।

৭. যদি কোন আলেমের ফাতওয়াসমূহের মধ্যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায় তাহলে যে ফাতওয়া শেষ সময়ের হবে এবং তার মাযহাব মোতাবেক হবে তাই আমলযোগ্য হবে, অন্যটা শায হিসাবে গণ্য হবে।

৮. সমস্ত সূফিয়ায়েকেরামের যে সকল বাণী রয়েছে, এগুলো দীনের ক্ষেত্রে দলিল হওয়ার যোগ্য নয় এবং তাদের পক্ষ থেকে কুরআন-সুন্নাহর এমন কোন ব্যাখ্যা, যা মুহাদ্দিস ও ফুকাহায়েকেরামের প্রদত্ত ব্যাখ্যার সাথে বিরোধপূর্ণ, গ্রহণ করা যাবে না। সূফিয়ায়েকেরামের শুধু সেই কথাগুলোকেই গ্রহণ করা যাবে, যা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হবে।

আমরা সূফিয়ায়েকেরামের মাশহুর ও মাকবুল সিলসিলাগুলোকে গ্রহণীয় মনে করি। আমরা এমন তাসাওউফের সমর্থক, যা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী। যে তাসাওউফ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নয়, আমরা একে তাসাওউফই মনে করি না। আমরা কোন হক্কানী পীর, সুফি এবং আল্লাহর অলিকে কাফেরও বলি না, তার মানহানিও করি না এবং তাকে অপছন্দও করি না। আমরা তার বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার হাতে সোপর্দ করি।

৯. যদি কোন মতাদর্শের একজন আলেম তার ইলম অনুযায়ী কোন কথা লেখেন বা কোন ফাতওয়া দেন এবং ঐ মতাদর্শেরই আরেকজন আলেম তার গবেষণা অনুযায়ী ভিন্ন ফাতওয়া দেন, তাহলে যে কথাটি মুফতা বিহি বা উক্ত মতাদর্শে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত এবং আমলকৃত হবে সেটিই মাযহাবের মাসআলা বলে গণ্য হবে, আর অন্য কথাটিকে শায বা ভুল বা রহিত বলে গণ্য করা হবে।

১০. আমাদের মতে ইলমে তাফসিরের আলোচনা তাফসিরের মূলনীতি অনুসারে, ইলমে হাদিসের আলোচনা উসুলে হাদিসের মূলনীতি অনুসারে, ফিকহের আলোচনা ফিকহের মূলনীতি অনুসারে, তাসাওউফের আলোচনা তাসাওউফের মূলনীতি অনুসারে এবং ফিকহে হানাফির আলোচনা ফিকহে হানাফির মূলনীতি অনুসারে হওয়া চাই। অন্য ফিকহের মূলনীতি ফিকহে

হানাফির উপর প্রয়োগ না করা চাই। জরাহ-তাদিল এবং গবেষণা ও সমালোচনারও মূলনীতি প্রণীত রয়েছে, প্রয়োজনের সময় সেগুলোরও অনুকরণ করা চাই।

আমাদের ধারণা, যদি উল্লিখিত বিষয়গুলোকে মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমাদের পারস্পরিক অনেক বিবাদ মিটে যাবে। যদি এ সকল মূলনীতি অনুযায়ী বিচার করা হয় তাহলে ড. আবু উসামা এবং তালেবুর রহমানসহ অন্যান্যরা হিদায়া ও ফিকহে হানাফির অন্যান্য কিতাবসমূহের উপর যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেছে, সেগুলোর এমনিতেই দফারফা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ প্রথম আপত্তির জবাব

১. ড. আবু উসামা এবং আপত্তি উত্থাপনকারীর জানা থাকা চাই যে, হিদায়া মূলত ফিকহের কিতাব, হাদিসের নয়। কিন্তু আপনার এ আপত্তি শুধুই ইলমে হাদিসের ব্যাপারে অজ্ঞতাপ্রসূত অথবা শুধুই প্রতিহিংসার ভিত্তিতে। হিদায়ার মুসান্নিফকে আল্লাহ তায়ালা যেমনিভাবে ফিকহের ক্ষেত্রে উঁচু মাকাম দান করেছিলেন, তেমনিভাবে তিনি তাকে হাদিসের ক্ষেত্রেও উঁচু মাকাম দান করেছিলেন। কোনো প্রকার তাহকিক ও বিচার-বিবেচনা ছাড়াই এ কথা বলে দেওয়া যে, এ হাদিস জাল, নিছক গোঁয়ারতুমি ছাড়া কিছু নয়।

২. যদি –আল্লাহ না করুন– হিদায়ার মুসান্নিফের উল্লেখ করা হাদিসসমূহের মধ্যে কিছু হাদিস জাল বা দুর্বল প্রমাণিত হয়েও যায়, তাহলে এর কারণে সমস্ত কিতাব কীভাবে পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে? অথবা হাদিস দুর্বল হওয়ার কারণে ফিকহের মাসআলাকে কীভাবে ভুল বলা যাবে?

এভাবে বিচার করলে তো হাদিসের অধিকাংশ কিতাবকেই পরিত্যাগ করতে হবে। বরং সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহের মধ্যেও এধরনের কিছু কিছু হাদিস রয়েছে। আলবানি সাহেব তো এখন যয়িফে তিরমিযি, যয়িফে আবু দাউদ, যয়িফে নাসায়ি এবং যয়িফে ইবনে মাজাহ নামে এসবের ভিন্ন ভিন্ন সংকলনও তৈরি করে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সিলসিলায়ে আহাদিসে যয়িফার মধ্যে যে সকল হাদিস জমা করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন কোন হাদিসের কিতাবে মওযু ও জাল হাদিস রয়েছে। তাহলে এতে কি

আপনি মুনকিরিনের হাদিসের মত সকল হাদিসকেই প্রত্যাখ্যান করে দিবেন? আপনি কি এসকল কিতাবের সাথেও হিদায়ার মতই আচরণ করবেন? হিদায়াগ্রন্থকার শাখাগত ফিকহি মাসআলাসমূহকে হাদিস দ্বারা প্রমাণ করার জন্য হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা তার হানাফি মাযহাবের সুনির্ধারিত মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। এটা তো সুস্পষ্ট বাস্তবতা যে, হানাফি মাযহাবের একটা মুফতা বিহি ও আমলকৃত মাসআলাও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নয়।

আবু উসামা ও আপত্তি উত্থাপনকারী যে সকল হাদিসের কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন, উদাহরণত মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, মুসতাদরাকে হাকেম, তবারানি কাবির, তবারানি আওসাত, তাবারানি সগির, মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে ফেরদাউস, মাজমাউয যাওয়াইদ, মামবাউল ফাওয়াইদ, জামেউল উসুল, শরহুস সুন্নাহ, কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়ামে', মেশকাত, মুসনাদে রাযীন, সুনানে কুবরা, হিসনে হাসিন, ইবনুস সাকান, ইমাম বুখারির তারিখে কাবির ও সগির, তারিখে ইবনে আসাকির, তারিখে বাগদাদ, আবু নুআইমের হিলইয়া, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, বায়হাকির শোআবুল ঈমান, বায়হাকীর দালাইলুন নবুওয়াহ, সুয়ুতির জামে সগীর, ফয়যে কাদির, সিরাজুল মুনির ইত্যাদি, এগুলোর মধ্যে কি জাল হাদিস নেই? যদি আপনি বলেন, আছে, আর বাস্তবেই এগুলোতে জাল হাদিস রয়েছে, তাহলে ফিকহে হানাফির কিতাবসমূহের সাথে আপনার এত দুশমনী কেন? আপনি তাহলে মুনকিরিনে হাদিসের মত এই সকল হাদিসের উপর হুকুম লাগিয়ে দিন এবং এগুলোকে পরিতাজ্য বলে দিন! আর যদি আপনি বলেন, এ সকল কিতাবে যয়িফ হাদিস নেই তাহলে আমরা আপনাদের মতাদর্শী আলেমদের কথা দিয়েই প্রমাণ করে দিচ্ছি, যেমন আপনারা মোল্লা আলি কারী, শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এবং আল্লামা আবদুল হাই লাখনবি রহ. এর কথা কুরআন-হাদিসের মনে করে উদ্ধৃত করেছেন।

এমনিভাবে আপনারা তাফসিরের কিতাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন। উদাহরণত তাফসিরে ইবনে জারির তাবারী অথবা তাফসিরে ইবনে কাসির

অথবা ফাতহুল কাদির শাওকানী, আপনারা কি এ সকল কিতাবের সকল হাদিসকে সহিহ বলে মানেন? অথবা আপনারা কি এ দাবি করতে পারবেন যে, এ কিতাবগুলোতে বর্ণিত সকল হাদিস উঁচু মানের সহিহ? হাঁ অথবা না বলে জবাব দিন। আরো সামনে চলুন, বুখারি শরিফ ছাড়া ইমাম বুখারির আরো যে সকল কিতাব রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আপনাদের মত কি? এগুলোর সকল হাদিস কি সহিহ এবং উঁচু মানের? এগুলোর সব হাদিসকে কি আপনারা গ্রহণ করেন এবং আমলযোগ্য মনে করেন?

আচ্ছা, এটাও রাখুন, আপনারা আপনাদের আলেমদের কথাই চিন্তা করুন। নবাব সিদ্দিক হাসান খান আউনুল বারী, আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ, তাফসিরে তরজমানুল কুরআন বা এছাড়া তার অন্যান্য কিতাবসমূহে যে সকল হাদিস উল্লেখ করেছেন, এগুলোর মধ্যে কোন মাওযু ও জাল হাদিস আছে কি নেই? এ সকল কিতাবের সকল হাদিসগুলো কি মূল কিতাবগুলোতে একই শব্দে বিদ্যমান রয়েছে? মাওলানা শামসুল হক আযিমাবাদীর আউনুল মাবুদ, মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরীর তুহফাতুল আহওয়াযী, উবায়দুল্লাহ মোবারকপুরীর মিরআতুল মাফাতিহ ইত্যাদির মধ্যে যয়িফ হাদিস আছে কি নেই? আপনারা বেশি নয়, আপনাদের শুধু একজন নির্ভরযোগ্য আলেমের নাম বলুন, যার কিতাবে একটা যয়িফ হাদিসও নেই এবং যার ব্যাপারে আপনাদের এ আস্থা রয়েছে যে, তিনি প্রত্যেকটি হাদিসকে যাচাই-বাছাই করে লিখেছেন। একটু সাহস দেখান তো। বাস্তবতা হচ্ছে, হিদায়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করা সহজ, কিন্তু আপত্তি করার পর নিজেকে রক্ষা করা কঠিন।

হিদায়ার হাদিস ও আপত্তি উত্থাপনকারী

হিদায়াগ্রন্থকার ফিকহের মাসআলাসমূহকে দলিলযুক্ত করার জন্য স্বীয় কিতাবে কুরআনের আয়াতও উল্লেখ করেছেন এবং হাদিস শরিফও উল্লেখ করেছেন। হিদায়াগ্রন্থকার কোথাও একথা লেখেননি এবং এ দাবি করেননি যে, আমি আমার এ কিতাব হিদায়ায় শুধু বুখারি ও মুসলিমের হাদিস উল্লেখ করব অথবা এ কথা বলেননি যে, আমি হাদিসের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা থেকে শুধু এক প্রকার বর্ণনাই উল্লেখ করব।

আপত্তি উত্থাপনকারী জনাব, হিদায়ার মধ্যে সকল প্রকার বর্ণনাই বিদ্যমান রয়েছে। যেমনিভাবে হাদিসের অনেক কিতাবের মধ্যেই সকল প্রকার বর্ণনা থাকে। কিন্তু সেসব কিতাবের বেলায় তো আপনি মুনকিরীনে হাদিসের পথে হাঁটেন না যে, হাদিসের সে সকল কিতাবের কোন একটি থেকে মাওযু বা যয়িফ হাদিস নিয়ে ঐ মুহাদ্দিসের মানহানি করতে শুরু করে দিবেন। আমাদের মতে তো হিদায়াগ্রন্থকার আহকাম সংক্রান্ত হাদিসসমূহের হাফেয ছিলেন। এজন্য তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে হাদিস উল্লেখ করেন। এটাই কারণ যে, তিনি কিছু কিছু জায়গায় হাদিস বিল মা'না অর্থাৎ হাদিসের অর্থ ও মর্ম ঠিক রেখে নিজস্ব শব্দে হাদিস বর্ণনা করে দেন। আর হাদিস বিল মা'না বলা অর্থাৎ কোন হাদিসের মর্ম ঠিক রেখে নিজস্ব শব্দে প্রকাশ করা অথবা অন্য কেউ এরকম হাদিস বিল মা'না বলে থাকলে তার হাদিসটাকে নকল করা উভয়টাই জায়েয আছে। খোদ আপনাদের বড়রাও এটা স্বীকার করেছেন।[১]

হিদায়ার ব্যাখ্যাকার এবং তাখরিজকারগণ হিদায়ার অধিকাংশ হাদিসের তাখরিজ করে দিয়েছেন। এখনও এর কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যেকবারের তাখরিজকারগণ তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে কিছু না কিছু হাদিস বেশি পেয়ে যান। মনে করুন, কোন একজন তাখরিজকারী হাদিস পেলেন না তাহলে এতে হিদায়াগ্রন্থকারের দোষ কি? হিদায়ার অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে হিদায়ার হাদিসসমূহের তাহকিক করা হয়েছে এবং হাদিসগুলোর তাখরিজের উপর স্বতন্ত্র কিতাবও লেখা হয়েছে। এখানে আমরা কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি, যাতে এ বিষয়ে আপনাদের ইলমে বৃদ্ধি ঘটে–

১. ফাতহুল কাদীর শরহে হিদায়া, ইবনে হুমাম রচিত। এ কিতাবে হিদায়ার হাদিসসমূহের যথেষ্ট পরিমাণ তাখরিজ করা হয়েছে।

২. আল বিনায়া শরহে হিদায়া, আল্লামা আইনী রচিত। এতেও হিদায়ার হাদিসসমূহের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

---

১. হুজ্জিয়াতে হাদিস, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সালাফী।

৩. হাশিয়ায়ে হিদায়া, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান সামভালি, প্রকাশক : এইচ এম সায়িদ কোম্পানি করাচি। এতেও হাদিসসমূহের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

হিদায়ার হাদিসের তাখরীজের উপর স্বতন্ত্র কিতাব

১. আল কিফায়া ফী মা'রিফাতি আহাদিসিল হিদায়া, রচয়িতা : শাইখ আলাউদ্দীন আলী ইবনে উসমান; যিনি ইবনুত তুরকুমানী আল মারদিনী নামে প্রসিদ্ধ, (মৃত্যু ৭৫০ হিজরি)

২. নাসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদিসিল হিদায়া, শাইখ জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ যায়লায়ী (মৃত্যু ৭৬২ হিজরি) কর্তৃক ৫ খণ্ডে রচিত।

৩. আল ইনায়া বি মা'রিফাতি আহাদিসিল হিদায়া, শাইখ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ আল কুরাশী আল মিসরী (মৃত্যু ৭৭৫হিজরি) কর্তৃক রচিত।

৪. আদ দিরায়াহ ফী মুনতাখাবি আহাদিসিল হিদায়া, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী শাফিয়ি (মৃত্যু ৮৫২ হিজরি) কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত।

৫. মুনয়াতুল আলমায়ী, আল্লামা যায়নুদ্দীন কাসেম ইবনে কুতলুবাগা আল হানাফি (মৃত্যু ৮৭৯ হিজরি) কর্তৃক রচিত।

এ মুহাদ্দিসগণ বিশেষভাবে হিদায়ার হাদিসের উপরই আলোচনা করেছেন। হাজার হাজার হাদিসের তাখরিজ করা হয়ে গেছে, আপনাদের তা নজরে পড়ে না। এ সকল তাখরিজ থেকেই বুঝা যায়, হিদায়াগ্রন্থকার কত বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। এখন এ মুহাদ্দিসগণ যদি কোন হাদিস না পেয়ে থাকেন তাহলে হতে পারে, পরবর্তী কোন মুহাক্কিক তা পেয়ে যাবেন। তাই শুধু এর উপর ভিত্তি করে হিদায়াগ্রন্থকারর ব্যাপারে এমন মন্তব্য করা যে, তিনি আল্লাহর নবির উপর মিথ্যা বলেছেন, কতই না বড় জুলুম!

আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে কিছু প্রশ্ন

আপত্তি উত্থাপনকারী জনাব, আমরা আপনার কাছে জানতে চাই–

১. ইমাম বুখারির তা'লীকাতে বুখারির মধ্যে যে সকল হাদিস রয়েছে হাফেয ইবনে হাজার শাফিয়ি ফাতহুল বারী, তা'লীকুত তা'লীকের মধ্যে কি এর সবগুলোর পূর্ণ সনদ বের করতে পেরেছেন এবং একথা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, এগুলোর মান হুবহু তেমন, যেমন বুখারি শরিফের মূল অংশের হাদিসের, না এর উপর এখনও কাজ বাকি রয়ে গেছে? অথবা ইবনে হাজার রহ. ছাড়া কোন মুহাদ্দিস কি এ কাজটিকে পূর্ণ করে ফেলেছেন? তাহলে এর কারণে কি কেউ ইমাম বুখারি রহ. এর ব্যাপারে একথা বলছে যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ নবির উপর মিথ্যা বলেছেন?

২. ইমাম তিরমিযি রহ. তিরমিযি শরিফের في الباب এর অধীনে যে সকল হাদিস, আসার অথবা ফিকহি মতামত উল্লেখ করেছেন, এগুলোর সবগুলোর কি তাখরিজ করা হয়ে গেছে? এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর কিতাব তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী কি তুহফাতুল আহওয়াযীতে এর পূর্ণাঙ্গ তাখরিজ করে ফেলেছেন? তাহলে কি এ কারণে আপনি ইমাম তিরমিযি রহ. কে বলবেন যে, ইমাম তিরমিযি তিরমিযি শরীফে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করেছেন?

৩. তাফসিরে কাশশাফে অগণিত হাদিস রয়েছে, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী "আল কাফিউশ শাফ ফী তাখরীজি আহাদিসিল কাশশাফ" নামক কিতাবে এগুলোর তাখরিজ করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এতে কাশশাফের সকল হাদিসের তাখরিজ করে ফেলেছেন? আচ্ছা, কাশশাফে কি জাল বা মাওযু রেওয়ায়েত নেই? তাহলে কি আপনি সাহেবে কাশশাফকেও অপমান করবেন?

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফিকহে শাফিয়ির একটি কিতাবের তাখরিজ "আত তালখীসুল হাবীর ফী তাখরীজি আহাদিসির রাফিয়ী আল কাবীর" নামক কিতাবে করেছেন, যা বেশ প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। কিতাবটিতে হাফেয ইবনে হাজার জায়গায় জায়গায় রাফিয়ীর বর্ণিত হাদিসের উপর হুকুম লাগিয়েছেন এবং কিছু কিছু রেওয়ায়েত ঐ শব্দে তিনি পাননি, যে শব্দে রাফিয়ী বর্ণনা করেছেন। আপনি কি সাহেবের হিদায়ার মত ইমাম রাফিয়ীর ব্যাপারে কোন হুকুম লাগিয়েছেন?

৫. হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাকী ইমাম গাযালির ইহইয়াউল উলুমের হাদিসসমূহের তাখরিজ করেছেন। আপনার জানা থাকার কথা, ইহইয়াউল উলুমে সব ধরনের হাদিস রয়েছে। ইরাকী অনেকগুলো হাদিসের হদিস বের করেছেন। কিন্তু সবগুলো হাদিসের হদিস বের করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই বলে কি আপনি ইমাম গাযালির ব্যাপারে কুফরের ফাতওয়া দিয়ে দিবেন? আপনি কি হিদায়াগ্রন্থকারের মত তারও মানহানি করবেন এবং তার ব্যাপারেও বলবেন যে, তিনি জেনে বুঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলেছেন?

৬. আপনাদের মুবাশশির হোসাইন লাহোরী গুনয়াতুত তালিবিনের তাখরিজ করেছেন। গুনয়াতুত তালিবিনের সকল রেওয়ায়েত কি সঠিক? আপনাদের কাছে তো এটি বড় মূল্যবান কিতাব। আপনারা এটিকে ইমাম আযমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন?

৭. তাফসিরে ইবনে কাসিরের রেওয়ায়েতেরও যথেষ্ট পরিমাণ তাখরিজ হয়ে গেছে এবং আপনাদের গায়রে মুকাল্লিদ আলেমরাই বেশি তাখরিজ করেছেন। এখন ঈমানদারীর সাথে বলুন, এতে কি যয়িফ রেওয়ায়েত নেই? নাকি এ হাদিসগুলো সব হুবহু ঐ শব্দেই খুঁজে পাওয়া গেছে, যে শব্দে ইবনে কাসীর তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন?

৮. তাফসিরে দুররে মানসূরে হাদিসের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার বলা হয়ে থাকে। এর সবগুলো কি সহিহ? এগুলোর ক্ষেত্রেও কি সেই পথ অবলম্বন করা হবে, যা আপনারা হিদায়ার ক্ষেত্রে করছেন?

৯. মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানির মধ্যেও যথেষ্ঠ পরিমাণ হাদিস রয়েছে, আপনি কি কখনো এগুলোর ব্যাপারে কথা বলেছেন? এ রেওয়ায়েতগুলোরও তাখরিজ করা হয়েছে। এগুলো কি সব খুঁজে পাওয়া গেছে?

১০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. ১. ফুয়ূযুল হারামাইন ২. দুররুস সামীন ফী মুবাশশারাতিন নাবিয়্যিল আমীন ৩. আল আরবাঈন (আরবি) ৪. তা'বীলুল হাদিস ৫. আল ফাযলুল মুবীন ফীল মুসালসাল মিন হাদিসিন নাবিয়্যিল আমীন ৬. আন নাওয়াদির মিন আহাদিসি সায়্যিদিল

আওয়াইল ওয়াল আওয়াখির ইত্যাদির মধ্যে যে সকল হাদিস নকল করেছেন, এগুলোর ব্যাপারে কি আপনি তার সাথে একমত? না আপনি যেভাবে হিদায়াগ্রন্থকারর মানহানি করেন, সেভাবে শাহ সাহেব রহ. এরও মানহানি করে থাকেন?

আমি এখানে সামান্য কিছু কিতাবের তাখরীজের কথা বলেছি। নচেৎ এমন অগণিত কিতাব রয়েছে, যেগুলোর হাদিস এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ এ সকল কিতাবের মুসান্নিফদের ব্যাপারে এ কথা বলেননি যে, তারা আল্লাহর নবির উপর মিথ্যা বলেছেন। এমনিভাবে কিছু হাদিস কোন সনদে মারফু হয়, কোন সনদে মাওকুফ বা মুরসাল হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ কোন কিতাবের ব্যাপারে এ আপত্তি তোলেনি যে, এতে মুরসাল হাদিসকে মারফু বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি তো হাদিসের অধিকাংশ কিতাবেই পাওয়া যায়। ইলমের সাথে যার সামান্য পরিমাণ সম্পর্কও রয়েছে, সে এমন আশ্চর্যজনক কথা বলতে পারে কী করে!

যাইহোক, আল্লামা যায়লায়ী বা হাফেয ইবনে হাজার হিদায়ার কোন হাদিসের ব্যাপারে যদি নিজেদের তাহকিকের ভিত্তিতে কোন হুকুম লাগান তাহলে তো ঠিক আছে, এটা তাদের মত। কিন্তু এটাকে পুঁজি করে হিদায়াগ্রন্থকারর মানহানি করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? এরপর কথা হচ্ছে, হিদায়াগ্রন্থকার তো মাসুম নন, যদি তার থেকে কোন ভুল হয়েও থাকে তাহলে এতে এত উতলা হওয়ার কী আছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মাফ করে দেন। এ ধরনের ভুল তো অধিকাংশ মুহাদ্দিস থেকেও হয়ে থাকে, কিন্তু আমরা তো তাদের মানহানি করি না।

এ দশটি উদাহরণ আমি উল্লেখ করেছি। আল্লাহর দোহাই, এ বিদ্বেষ ত্যাগ করুন। যদি আপনার ইলম থাকে, তাহলে কোন ইলমি ও তাহকিকি কাজ করুন। আল্লাহর অলিদের কাফের আখ্যায়িত করে এবং তাদের মানহানির পথে হেঁটে নিজের আমলনামাকে কালো করবেন না। ডা. আবু উসামা যে সকল বিষয় নকল করেছেন, এ ধরনের বিষয় তো আমরা নবাব সিদ্দিক হাসান খান থেকেও নকল করতে পারি, কিন্তু আমরা একে সঙ্গত মনে করি না।

দ্বিতীয় আপত্তি
হিদায়ায় নোংরা মাসআলা রয়েছে

জবাব : এ আপত্তিটিও ফিকহে হানাফির প্রতি বিদ্বেষ এবং ইলমে হাদিসের জ্ঞানের অভাবপ্রসূত। কেননা যে ধরনের মাসআলাগুলোর ব্যাপারে বলা হয় যে, এগুলো নোংরা মাসআলা, উদাহরণত গোসলের মাসআলাসমূহ, পবিত্রতার মাসআলাসমূহ, হায়েয ও নেফাসের মাসআলাসমূহ, তালাক ও রজআতের মাসআলা ইত্যাদি, এগুলো তো হাদিসের কিতাবসমূহেও রয়েছে। তাহলে হাদিসের কিতাবসমূহের ব্যাপারে এ আপত্তি কেন তোলা হয় না? বাস্তবতা হচ্ছে, এ আপত্তি শুধুই ফিকহের প্রতি চরম ঘৃণাবোধ এবং সালাফে সালিহিনের প্রতি চরম বিদ্বেষের কারণেই তোলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় আপত্তি
হিদায়ায় অনুমান নির্ভর মাসআলা রয়েছে

জবাব : এ আপত্তিও মূলত বাস্তবতাকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা ফুকাহায়েকেরাম মাসআলা ইসতেখরাজ ও ইসতেমবাত করে লোকদের সঠিক পথ দেখান। ফুকাহায়েকেরাম এধরনের যে মাসআলাগুলো লিখে গিয়েছিলেন, আজ হুবহু সেই মাসআলাগুলো সামনে আসছে।

উদাহরণত ফকিহরা এ মাসআলা লিখেছিলেন, যদি তোতা পাখির মুখে সেজদার আয়াতের বুলি এনে দেওয়া হয় আর সে তা আওড়াতে থাকে তাহলে শ্রবণকারীর উপর তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব হবে না। পরবর্তীতে যখন টেপরেকর্ডার আবিষ্কার হল তখন অত্যন্ত সহজভাবে এর জবাব বেরিয়ে আসল। তবু কি এ ধরনের মাসআলা উল্লেখ করাকে নাজায়েয বলা হবে? আপনাদের কাছে কি এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কুরআন হাদিসের কোন সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে?

চতুর্থ আপত্তি
হিদায়ায় কুরআন হাদিস বিরোধী মাসআলা রয়েছে–

জবাব : এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সামনে কিতাবের মূল অংশে ঐ মাসআলাগুলো আসছে, যেগুলোর ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনকারী বলেছেন,

এই মাসআলাগুলো কুরআন ও হাদিস বিরোধী। পাঠকবৃন্দ তখন নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে, এ সকল মাসআলার একটিও কুরআন ও হাদিস বিরোধী নয়।

পঞ্চম আপত্তি
হিদায়ায় সনদ নেই

জবাব : এ আপত্তি মূলত জীপুরী সাহেবের, যা তিনি 'হাকীকাতুল ফিকহে' উত্থাপন করেছেন। এর জবাবের জন্য এতটুকু বুঝে নিন যে, যেমনিভাবে হাদিসের কিতাব দু-ধরনের রয়েছে, একটা হচ্ছে সনদ যুক্ত আর আরেকটা হচ্ছে সনদবিহীন। সনদ যুক্ত কিতাব হচ্ছে যেমন– বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি ইত্যাদি। আর সনদবিহীন কিতাব হচ্ছে যেমন– মেশকাত শরিফ, বুলুগুল মারাম, রিয়াযুস সালিহিন, জামেউল উসুল মিন আহাদিসির রাসুল, কানযুল উম্মাল, জামে সগীর সুয়ুতী, মাশারিকুল আনওয়ার, মাজমাউয যাওয়াইদ, হিসনে হাসিন, ইতহাফুল খিয়ারাহ, জামউল জাওয়ামে'– সুয়ুতী, মুখতারায়ে মাকদিসী ইত্যাদি। তেমনিভাবে ফিকহে হানাফির কিতাবও দু-ধরনের; সনদযুক্ত, সনদবিহীন–

ফিকহে হানাফির সনদযুক্ত কিতাবসমূহ

১. কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ ২. কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী ৩. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী ৪. জামে সগীর, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি।

অথবা ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার ও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বিভিন্ন শাগরেদদের সে সকল কিতাব, যেগুলোর মধ্যে মাসআলাগুলোকে সনদসহ লেখা হয়েছে। উদাহরণত ইমাম আযম রহ. এর সমস্ত মুসনাদ এবং জামেউল মাসানিদ ইত্যাদি।

ফিকহে হানাফির সনদবিহীন কিতাবসমূহ

কুদুরি, হিদায়া ইত্যাদি। হিদায়া মূলত কুদুরি ও জামে সগীর-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ। জামে সগীর ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কিতাব। আর ইমাম

মুহাম্মদ রহ. ইমাম আযম রহ. এর শাগরিদ। সে হিসাবে হিদায়াগ্রন্থকার এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাঝে শুধু একজনের মাধ্যম রয়েছে। বুখারি শরিফে এমন কোন হাদিস নেই, যা ইমাম বুখারি রহ. শুধু একজনের মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। এজন্য এ আপত্তিও অনর্থক।

ষষ্ঠ আপত্তি

খোদ হানাফি আলেমগণই হিদায়াগ্রন্থকারর উপর আপত্তি করেছেন–

জবাব : মুহতারাম, হানাফি ওলামায়েকেরাম তো তাদের এ কাজের মাধ্যমে তার মাসুম বা ত্রুটিমুক্ত হওয়াকে নাকচ করেছেন, তারা আপনার মত তার মানহানি করেননি। আর উসুলে হাদিসের আলোকে হাদিসের মৌলিক কিতাবগুলোতে থাকা হাদিসসমূহের যে মান হয়ে থাকে, ফিকহের কিতাবে থাকা হাদিসগুলোর সেই মান হতে পারে না। একথা শুধু ফিকহের কিতাবগুলোর ক্ষেত্রেই নয়, বরং তাফসির, ইতিহাস, তাসাওউফ ইত্যাদি সকল কিতাবের হাদিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে, উসুলে হাদিসের আলোকে এগুলোর ঐ মান হয় না, যা হাদিসের মৌলিক কিতাবসমূহে থাকা হাদিসের হয়ে থাকে। হানাফি আলেমগণ তো ইনসাফের সাথে কাজ করেছেন এবং উসুলে হাদিস মোতাবেক কথা বলেছেন, তারা আপনাদের মত নন।

পাঠকবৃন্দ, আমরা সকল আপত্তির জবাব শেষ করলাম। আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নার উপর আমল করার তাওফিক দান করেন এবং সালাফে সালিহিন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণের অভিশাপ থেকে আমাদের হেফাজত করেন।

ওয়াসসালাম

মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

পৃষ্ঠপোষক, মারকাযে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সেরগোধা
সভাপতি, ইত্তিহাদে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পাকিস্তান
চিফ এক্সিকিউটর, আহনাফ মিডিয়া সোর্স

ফিকহে হানাফির উপর আপত্তির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, আসুন কুরআনের বিরুদ্ধাচরণকারী হানাফিদের এসব মাসআলা প্রসঙ্গে আলোচনা করি।[২]

আপত্তি উত্থাপনকারী তার মতানুযায়ী এমন দশটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তার দাবি অনুযায়ী কুরআন বিরোধী। গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে ৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এসব মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠক, আমি অবাক হয়েছি, আপত্তি উত্থাপনকারীর এই নতুন গবেষণার উপর। কারণ তিনি এখানে এই দশ মাসআলার মধ্যে একটিও এমন পেশ করতে পারেননি, যা নতুন অথবা তার ব্যক্তিগত গবেষণা। এই মাসআলাগুলো আগেও গায়রেমুকাল্লিদরা পেশ করেছে এবং আমাদের আকাবির মনীষীগণ এগুলোর জবাবও দিয়ে দিয়েছেন। আপত্তি উত্থাপনকারী এগুলো নতুন শিরোনামে পরিবেশন করেছে। এজন্য আমরা তার সমস্ত আপত্তি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করার পর এর জবাব দিচ্ছি, যাতে আপত্তি উত্থাপনকারী এমন মনে না করতে পারে যে, আমার আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়া হয়নি।

বি. দ্র. : আমরা প্রথমে আপত্তি উত্থাপনকারীর পূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করব। তারপর এর জবাব দিব, যাতে পাঠকের কাছে এসব আপত্তির বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তারা গায়রে মুকাল্লিদদের জালিয়াতির ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন।

২. ফিহহে হানাফি কি কুরআন ও হাদিসের নির্যাস : পৃষ্ঠা ২৩।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

আপত্তি : এক
কিসাস গ্রহণের মাসআলা

ইসলাম ও হত্যার শাস্তি....................৪০
ফিকহে হানাফি ও হত্যার শাস্তি....................৪০
প্রথম আপত্তির জবাব.................... ৪৩
আয়াতের কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়ার কারণ.................... ৪৩
ফিকহে হানাফিতে কিসাসের হুকুম ৪৪
সুন্নাত শরিফাহ এবং অপরাধ ও শাস্তির বিধান.................... ৪৭
গোলাম হত্যা.................... ৪৮
হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবক.................... ৪৮
বাঁদী হত্যা ৪৯
গর্ভবতী মহিলা হত্যা ৫১
সামষ্টিক জরিমানা অথবা কাসামাত....................৫১
কূপে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি....................৫২
সৎমাকে বিবাহ করা ৫৩
দাঁতের কিসাস....................৫৪
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা.................... ৫৫
কিসাস.................... ৫৫
কিসাসের শরয়ি সংজ্ঞা ৫৬
১. قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা ৫৭
قتل عمد قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার হুকুম.................... ৫৮
মাসআলা : এক....................৫৯
মাসআলা : দুই....................৬১
প্রথম হাদিস ৬১
দ্বিতীয় হাদিস....................৬২
তৃতীয় হাদিস....................৬২

বিষয় পৃষ্ঠা
মাসআলা নং (৩) ৬৩
মাসআলা : চার..৬৪
মাসআলা নং (৫)..৬৫

আপত্তি : দুই
যিনার শাস্তির মাসআলা

ইসলাম ও ব্যভিচার (যিনা) এর শাস্তি ৬৬
ফিকহে হানাফি ও ব্যভিচারের শাস্তি..৬৬
দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর ৬৭

আপত্তি : তিন
চুরির শাস্তির মাসআলা

ইসলাম ও চুরির শাস্তি ৭১
ফিকহে হানাফি ও চুরির শাস্তি ৭১
তৃতীয় আপত্তির জবাব ৭২
ফিকহে হানাফিতে চুরির শাস্তি.. ৭২
হানাফিদের উপর আরেকটি অপবাদ.. ৭৬
একটি মৌলিক কথা.. ৭৬
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার আসার ৭৮

আপত্তি : চার
মদ পানের শাস্তির মাসআলা

ফিকহে হানাফি ও মদ পানের শাস্তি..৮৫
চতুর্থ আপত্তির জবাব..৮৭
ফিকহে হানাফিতে খামার (মদ) এর হুকুম ৮৭
মদের বিধান..৮৭
হালাল পানীয় ৯০
হিদায়ার প্রথম এবারতের বিশ্লেষণ ৯১
ফিকহে হানাফিতে মদ পান করার শাস্তি..৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

আপত্তি : পাঁচ

মুশরিকদের হারাম শরিফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মাসআলা

ফিকহে হানাফিতে মুশরিকদের হারামে প্রবেশের অনুমতি ৯৯
পঞ্চম আপত্তির উত্তর ১০০
এব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি..................১০২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির...১০২
সাহাবি থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির..................১০৩
তাবেয়ি থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির ১০৩
ফারুকি শাসনামলে হারাম শরিফে এক খ্রিস্টানের প্রবেশের অনুমতি ...১০৩

আপত্তি : ছয়

কিসাস শুধু তরবারি দিয়ে নেওয়ার মাসআলা

ইসলাম ও সীমালঙ্ঘনের শাস্তি ১০৫
ফিকহে হানাফি ও সীমালঙ্ঘনের শাস্তি ১০৫
ষষ্ঠ আপত্তির উত্তর..................১০৭
প্রথম রেওয়ায়েতের জবাব..................১০৯
দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের জবাব ১১০
জবাব নং (২) ১১০

আপত্তি : সাত

দিরহাম পরিমাণ নাপাকের মাসআলা

ইসলাম ও পবিত্রতা..................১১১
ফিকহে হানাফি ও পবিত্রতা..................১১১
সপ্তম আপত্তির উত্তর..................১১২
মুরগি ইত্যাদির বিষ্ঠার মাসআলা..................১১৬

আপত্তি : আট

নাপাকি চেটে পবিত্র করার মাসআলা

ইসলামে নাপাকি ধৌত করার বিধান..................১১৯
ফিকহে হানাফিতে নাপাকি চাটা..................১১৯

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম আপত্তির উত্তর ১২০

আপত্তি : নয়

মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ের মাসআলা

ইসলাম ও মাতৃদুগ্ধ পানের সময়.. ১২২

ফিকহে হানাফি ও মাতৃদুগ্ধ পানের সময়.. ১২২

নবম আপত্তির জবাব.. ১২৩

আপত্তি : দশ

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলা

দশম আপত্তির জবাব.. ১২৬

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলা ও হানাফিগণের দৃষ্টিভঙ্গি.. ১৬৬

প্রথম সংক্ষিপ্ত জবাব.. ১৬৬

আপত্তি উত্থাপনকারীর মিথ্যা দাবি ১২৯

শরহে ফিকহে আকবরের এবারতের বিশ্লেষণ.. ১৩১

গায়রে মুকাল্লিদ হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ীর ফাতওয়া.. ১৩২

দ্বিতীয়ত বিস্তারিত জবাব ১৩৩

আপত্তি : এগারো

ফজর ও আসরের মধ্যখানে সূর্যের উদয় ও অস্তের মাসআলা

হাদিসের অর্ধেক অংশ গ্রহণ ও অর্ধেক বর্জন.. ১৪৮

একাদশ আপত্তির জবাব ১৪৯

আপত্তি : বারো

জোরপূর্বক বিবাহ ও তালাকের মাসআলা

ইসলামে জোরপূর্বক তালাক ও বিবাহ ১৫৮

ফিকহে হানাফিতে জোরপূর্বক তালাক ও বিবাহ.. ১৫৯

দ্বাদশ আপত্তির জবাব ১৫৯

বিষয় পৃষ্ঠা

আপত্তি : তেরো

মদিনা মুনাওয়ারা হারাম শরিফ হওয়ার মাসআলা

ইসলামে মদিনা হারাম শরিফ হিসাবে গণ্য ১৭৪

ফিকহে হানাফিতে মদিনা হারাম শরিফ নয় ১৭৪

ত্রয়োদশ আপত্তির জবাব..১৭৫

আপত্তি : চৌদ্দ

ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাতে কেরাতের মাসআলা

সুরা ফাতেহা ও নামায ১৭৮

ফিকহে হানাফি ও সুরা ফাতেহা..১৭৮

চতুর্দশ আপত্তির জবাব..১৭৯

আপত্তি : পনেরো

নামায ধীরস্থিরভাবে পড়ার মাসআলা

ইসলাম ও ধীরস্থিরভাবে নামায ১৮১

ফিকহে হানাফি ও ধীরস্থিরভাবে নামায ১৮২

পঞ্চদশ আপত্তির জবাব..১৮৩

আপত্তি : ষোলো

সাত অঙ্গের উপর সেজদা করার মাসআলা

ইসলামে সেজদা করার পদ্ধতি..১৮৬

ফিকহে হানাফিতে সেজদার পদ্ধতি..১৮৬

ষোড়ষ আপত্তির জবাব..১৮৭

আলমগিরির মাসআলার সমাধান ১৮৯

আপত্তি : সতেরো

কুকুর ও গাধার গোশতের ব্যবসার মাসআলা

ইসলামে হিংস্র প্রাণীর ব্যবসা..১৯১

ফিকহে হানাফিতে হিংস্র প্রাণীর ব্যবসা..১৯১

সপ্তদশ আপত্তির জবাব..১৯২

বিষয় পৃষ্ঠা
ফাতাওয়ায়ে আলমগিরির উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ ১৯৬
গায়রে মুকাল্লিদদের খেয়ানত ১৯৭
হানাফি মাযহাবের مفتى به ফাতওয়াযোগ্য মত ১৯৮
নুরুসতানির দলিলসমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২০১

আপত্তি : আঠারো
পাগড়ির উপর মাসাহ্ করার মাসআলা
ইসলামে পাগড়ির উপর মাসাহ ২০৪
ফিকহে হানাফিতে পাগড়ির উপর মাসাহ ২০৪
অষ্টাদশ আপত্তির জবাব ২০৫
হানাফিগণের দলিলসমূহ ২০৫
প্রথম দলিল ২০৫
দ্বিতীয় দলিল ২০৫
তৃতীয় দলিল ২০৬
চতুর্থ দলিল ২০৬
পঞ্চম দলিল ২০৬
ষষ্ঠ দলিল ২০৭
সপ্তম দলিল ২০৭
সারকথা ২০৮

আপত্তি : উনিশ
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশের রোযা রাখার মাসআলা
ইসলামে ওয়ারিশের উপর রোযা ২০৯
ফিকহে হানাফি ও ওয়ারিশদের দায়মুক্তি ২১০
উনবিংশ আপত্তির জবাব ২১০

আপত্তি : বিশ
শেষ তাশাহহুদে জেনে বুঝে অযু ভাঙ্গার মাসআলা
ইসলামে অযুর অবস্থান ২১৪
ফিকহে হানাফিতে পাদ সালামের স্থলাভিষিক্ত ২১৫
বিংশ আপত্তির জবাব ২১৫

বিষয় পৃষ্ঠা

আপত্তি : একুশ
ইমামতির শর্তাবলির মাসআলা

ইসলামে ইমামতির শর্তাবলি ২১৯
ফিকহে হানাফিতে ইমামতির শর্তাবলি ২২০
একবিংশ আপত্তির জবাব ২২০
ইমামতের অধিক উপযুক্ত হওয়ার জন্য প্রথম গুণ ২২২
ইমামতের অধিক উপযুক্ত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় গুণ ২২৩
হানাফি ফকিহগণের উপর মারাত্মক অপবাদ ২২৪
জবাব : عضو দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য নেওয়া নির্জলা অপবাদ ২২৫

আপত্তি : বাইশ
সমকালীন বাদশার উপর হদ (শরয়ি শাস্তি) এর মাসআলা

ইসলাম ও হদসমূহ ২৩১
ফিকহে হানাফি ও হদসমূহ ২৩২
দ্বাবিংশ আপত্তির জবাব ২৩২

আপত্তি : তেইশ
মদ থেকে সিরকা বানানোর মাসআলা

ইসলামে মদ থেকে সিরকা বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ২৩৪
ফিকহে হানাফিতে মদ থেকে সিরকা বানানোর অনুমতি ২৩৪
ত্রয়োবিংশ আপত্তির জবাব ২৩৫
হারেস উকলীর উদ্ধৃতি ২৪০
হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের উদ্ধৃতি ২৪০
সারকথা ২৪০

আপত্তি : চব্বিশ
হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করার মাসআলা

ইসলাম ও হিংস্র প্রাণীর চামড়া ২৪২
ফিকহে হানাফি ও কুকুরের চামড়া ২৪২
চতুর্বিংশ আপত্তির জবাব ২৪৪

বিষয় পৃষ্ঠা

দাবাগাত দেওয়ার দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়......................২৪৪
একটি মাসআলার বিশ্লেষণ......................২৪৮
রদ্দুল মুহতারের এবারতের বিশ্লেষণ......................২৫১
আপত্তি উত্থাপনকারীর অজ্ঞতা না খেয়ানত......................২৫৩
গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে প্রশ্ন......................২৫৩
গায়রে মুকাল্লিদিনের মাযহাব......................২৫৪

আপত্তি : পঁচিশ
জোরপূর্বক তালাকের মাসআলা

ইসলামে জোরপূর্বক তালাক......................২৫৫
ফিকহে হানাফি ও জোরপূর্বক তালাক......................২৫৬
পঞ্চবিংশ আপত্তির জবাব......................২৫৬
জোরজবরদস্তির কারণে দেওয়া তালাক পতিত হয়ে যাওয়ার দলিলসমূহ..২৫৬

আপত্তি : ছাব্বিশ
গোস্তাখে রাসুল (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি)-এর শাস্তির মাসআলা

ইসলামে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া কুফর..২৬০
ফিকহে হানাফিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া প্রসঙ্গ......................২৬১
ষড়বিংশ আপত্তির জবাব......................২৬১
হিদায়ার এবারতের বিশ্লেষণ......................২৬৪

আপত্তি : সাতাইশ
মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ করার ক্ষেত্রে হদের মাসআলা

ইসলামে মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ হারাম......................২৬৭
ফিকহে হানাফিতে মাহরাম নারীদের বিবাহ......................২৬৮
সপ্তবিংশ আপত্তির জবাব......................২৬৯
গায়রে মুকাল্লিদদের কিছু মাসআলা......................২৭২
বীর্য পবিত্র......................২৭২

বিষয় পৃষ্ঠা

বীর্য খাওয়া জায়েয ২৭২
লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা পবিত্র....................২৭৩
লজ্জাস্থান খোলা থাকলেও নামায জায়েয ২৭৩
পুরুষাঙ্গ অন্যকে দিয়ে স্পর্শ করানো জায়েয ২৭৩
পায়ুপথে সহবাস জায়েয....................২৭৪
মুতআ জায়েয....................২৭৪
যিনা জায়েয ২৭৪
মা, বোন ও মেয়ের শরীর দেখা জায়েয....................২৭৫
বেগানা মহিলা দাড়ি বিশিষ্ট পুরুষকে দুধ পান করানো জায়েয....................২৭৫
চারজনের বেশি বিবাহ করা জায়েয ২৭৫
নিজের মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েয....................২৭৫
হস্তমৈথুন জায়েয....................২৭৬
একই নারী পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য হালাল ২৭৬
পিতা ও পুত্রের অংশীদারিত্বপূর্ণ স্ত্রী ২৭৬
যিনার সন্তান বণ্টনের পদ্ধতি ২৭৬
গায়রে মুকাল্লিদদের দৃষ্টিতে উত্তম নারী ২৭৭
লজ্জাস্থানের জায়গা ঠিক রাখার টিপ্‌স ২৭৭
নারী হায়েয থেকে কীভাবে পবিত্র হবে....................২৭৭
হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ২৭৮
শূকরের সম্মান ২৭৮
শূকর মায়ের মত পবিত্র.................... ২৭৮
শূকরের ঝুটা ও কুকুরের পেশাব-পায়খানা পবিত্র.................... ২৭৮
গাধী, কুত্তি ও শূকরীর দুধ গায়রে মুকাল্লিদদের মতে পবিত্র.................... ২৭৮
গায়রে মুকাল্লিদদের মতে হালাল প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র....................২৭৯
ঘোড়া হালাল....................২৭৯
ঘোড়ার কুরবানি জরুরি ২৭৯
গুইসাপ হালাল....................২৭৯
সজারু হালাল....................২৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা

সামুদ্রিক মৃত প্রাণী হালাল ২৭৯

স্থলভাগের ঐ সকল প্রাণী হালাল, যেগুলোতে রক্ত নেই..................২৮০

আবদুল্লাহ রোপড়ীর কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডার..................................২৮০

নারীর জরায়ুর আকৃতি ২৮০

বীর্য জরায়ুতে পৌঁছানোর অন্য পদ্ধতি ২৮০

জরায়ুর পূর্ণ চিত্র ২৮০

পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থানের সঙ্গম এবং গর্ভধারণ..........................২৮১

জরায়ুর অবস্থানস্থল..২৮১

ভেতরের খবর ২৮২

সহবাসের উত্তম পদ্ধতি ২৮২

এ কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপারে মাওলানা জুনাগড়ীর পর্যালোচনা....২৮৩

মাওলানা জুনাগড়ীর শালীন ভাষা..২৮৩

শেষকথা ২৮৩

আপত্তি : এক
কিসাস গ্রহণের মাসআলা

ইসলাম ও হত্যার শাস্তি

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى... وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ফরয করা হয়েছে...। আর হে বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা পরহেযগার হয়ে যাও।[৩]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: ٤٥﴾

আর আমি তাতে তাদের উপর ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বদলায় প্রাণ..., যারা আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই জালেম।[৪]

---

৩. সুরা বাকারা, আয়াত ১৭৮-১৭৯।

ফিকহে হানাফি ও হত্যার শাস্তি

এই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতগুলো হত্যাকারীকে শাস্তি না দেওয়ার পক্ষে। লক্ষ্য করুন,

১. হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

ومن غرق صبيا أو بالغا في البحر فلا قصاص عند أبي حنيفة.

যে ব্যক্তি কোনো শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নদীতে ডুবিয়ে দিবে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর কিসাস নেই।[৫]

২. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে উল্লেখ আছে,

وإذا سقى رجلا سما فمات من ذلك، فإن أوجره إيجارا على كره منه، أو ناوله ثم أكرهه على شربه حتى شرب، أو ناوله من غير إكراه عليه، فإن أوجره، أو ناوله وأكرهه على شربه فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية،

যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে জোর করে বিষ পান করতে বাধ্য করে আর এতে সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর কিসাস নেই, বরং তার গোত্র এর জন্য দিয়ত আদায় করবে। –ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী- ৬/৬।

৩. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে,

ولو أن رجلا أخذ رجلا، فقيده وحبسه في بيت حتى مات جوعا فقال محمد - رحمه الله تعالى -: أوجعه عقوبة، والدية على عاقلته والفتوى على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -: أنه لا شيء عليه،

যদি কেউ কেউকে আটকে রেখে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, এজন্য তাকে মারপিট করা হবে এবং তার গোত্রের উপর দিয়ত আসবে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের উপর ফাতওয়া; তার উপর কোনো শাস্তি আরোপ হবে নেই।

---

৪. সুরা মায়িদা, আয়াত ৪৫।

৫. হিদায়া আখিরাইন, পৃষ্ঠা ৫৬২।

৪. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে,

قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في رجل قمط رجلا فطرحه قدام سبع فقتله السبع لم يكن على الذي فعل ذلك قود، ولا دية لكنه يعزر ويضرب ويحبس حتى يتوب. (٦/٦)

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যদি কেউ কাউকে বেঁধে হিংস্র প্রাণীর সামনে ছেড়ে দেয় আর প্রাণীটি তাকে মেরে ফেলে, তাহলে এ ব্যক্তির উপর কোনো জরিমানা বা দিয়ত নেই। তবে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক শাস্তিস্বরূপ তাকে প্রহার বা বন্দি করা যেতে পারে, যতক্ষণ না সে তাওবা করে। তাওবা করলে সে মাফ পেয়ে যাবে।

৫. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে,

ولو أن رجلا أدخل رجلا في بيت، وأدخل معه سبعا، وأغلق عليهما الباب فأخذ الرجل السبع فقتله لم يقتل به، ولا شيء عليه، وكذا لو نهشته حية، أو لسعته عقرب لم يكن فيه شيء أدخل الحية والعقرب معه، أو كانتا في البيت، ولو فعل ذلك بصبي فعليه الدية. (٦/٦)

যদি কেউ কাউকে একটি ঘরে ঢুকায় এবং তার সাথে হিংস্র প্রাণী ঢুকিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় আর ঐ প্রাণী তাকে আক্রমণ করে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না এবং তার উপর কোনো শাস্তিও আসবে না। এমনিভাবে যদি এমন ঘরে কোনো সাপ বা বিচ্ছু কাউকে দংশন করে, তাহলে যে ব্যক্তি এমন ঘরে আটক করেছে তার উপর কোনো শরয়ি শাস্তি নেই, সে নিজেই সেখানে সাপ-বিচ্ছু ঢুকিয়ে দিক বা আগে থেকেই সেখানে এগুলো থাকুক। অবশ্য যদি সে কোনো শিশুর সাথে এ ধরনের আচরণ করে, তাহলে তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষ খাইয়ে এক সাহাবিকে হত্যা করার দায়ে এক মহিলাকে হত্যা করিয়েছিলেন। যেমনটি এ রেওয়ায়েতে আছে,

عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتها فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأكل القوم فقال: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» فمات بشر بن البراء بن معروف الأنصاري فأرسل إلى اليهودية «ما حملك على الذي صنعت؟» قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال: في وجعه الذي مات فيه «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعت أبهري»

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়ার জিনিস খেতেন। কিন্তু তিনি সদকার কিছু খেতেন না। একবার খায়বারে এক ইহুদি মহিলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি বিষ-মেশানো ভুনা ছাগল পাঠাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবিগণ খেতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা খাওয়া বন্ধ কর। কারণ এ ছাগল আমাকে বলেছে সে বিষযুক্ত। কিন্তু হযরত বিশর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাওয়ার কারণে মারা গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি মহিলাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে? সে বলল, আমি কাজটা এজন্য করেছি, যদি আপনি সত্য নবি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আর যদি আপনি বাদশা হয়ে থাকেন তাহলে লোকেরা আপনার থেকে নিস্তার পাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ইহুদি মহিলাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। পরবর্তীকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুস্থতায় তার মৃত্যু হয়েছিল, সেসময় তিনি বলেছিলেন, খায়বারের সময় বিষযুক্ত খাবারের কষ্ট আমি সবসময়ই অনুভব করেছি। এখন ঐ বিষই আমার শাহরগ কাটছে।[৬]

---

৬. কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ২৩-২৬।

প্রথম আপত্তির জবাব

সম্মানিত পাঠক, আপত্তি উত্থাপনকারী প্রথম যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, সেটি তিনি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করেননি। যদি তিনি আয়াতটি পূর্ণরূপে উল্লেখ করতেন, তাহলে কিসাসের মাসআলা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যেত। আপত্তি উত্থাপনকারী জনাব, আপনি প্রথমে সুরা বাকারার ১৭৮ নং আয়াতের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا থেকে নিয়ে فِي الْقَتْلَى পর্যন্ত, অথচ আয়াত عَذَابٌ أَلِيمٌ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এরপর আপনি ১৭৯ নং আয়াত উল্লেখ করেছেন। মাঝখান থেকে ১৭৮নং আয়াতের বেশির ভাগ অংশ বাদ দিয়েছেন। এমন কেন করলেন? ফিকহের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে কিতাব ভরিয়ে ফেলেছেন। অথচ কুরআনে কারিমের আয়াত আনার আপনার জায়গা হল না। আপনার যখন ১৭৯নং আয়াত আনার দরকারই ছিল তাহলে আপনি ১৭৮নং আয়াত পূর্ণরূপে এনে তারপর এটা নিয়ে আসতেন।

আয়াতের কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়ার কারণ

আয়াতের কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়ার আসল কারণ হল, এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি কথা ইরশাদ করেছেন। এগুলোর মধ্যে একটিমাত্র কথা আপত্তি উত্থাপনকারীর অনুকূলে ছিল, তাই তিনি তা নিয়ে এসেছেন। আর দুটি কথা তার প্রতিকূলে ছিল। তাই তিনি সেগুলো এড়িয়ে গেছেন। এই তিন কথার প্রথমটি হল হত্যার বদলায় হত্যা অর্থাৎ কিসাস গ্রহণ করা। দ্বিতীয়টি হল, কিসাস মাফ করে দেওয়া। আর তৃতীয়টি হল, দিয়ত আদায় করা। যেমনটি এই আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ তারপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এই পূর্ণ আয়াতে তিনটি মাসআলার উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি খোদ গায়রে মুকাল্লিদদের মুফাসসির মাওলানা সালাহুদ্দীন ইউসুফ উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন,

এটা (অর্থাৎ কিসাস অথবা মাফ করে দেওয়া অথবা দিয়ত, তিনটি সুরত) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর সহজীকরণ এবং অনুগ্রহ।[৭]

যখন আল্লাহ তায়ালা তিনটি কথা ইরশাদ করেছেন তখন কোনো ব্যক্তি এগুলোর যেকোনো একটির উপর আমল করা মানেই কুরআনের উপর আমল করা। অনেক বিধান এমন আছে, যেগুলোর মধ্যে দিয়ত প্রযোজ্য হয়। আর অনেক বিধান এমন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে যদি কেউ কোনো অপরাধীকে মাফ করে দেয় তাহলে তার শাস্তি মওকুফ হয়ে যায় এবং খালাস পেয়ে যায়। এটা জরুরি নয় যে, তাকে সর্বাবস্থায় হত্যাই করতে হবে। ওয়ারিশরা যদি কিসাসই নিতে চায় তাহলে তারা কিসাসও নিতে পারবে। আপত্তি উত্থাপনকারী শুধু কিসাস নির্দেশক কথাটি উল্লেখ করার মতলব হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, কুরআনে তো কিসাসের হুকুম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফিকহে হানাফি দিয়তের কথা বলছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, শরিয়তের দৃষ্টিতে এমন অনেক অপরাধ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে দিয়ত বাস্তবায়ন করার বিধান প্রযোজ্য।

এ চাতুরীপনাকে পুঁজি করে আপত্তি উত্থাপনকারী লিখেছেন, হানাফিরা কুরআনের হুকুম মানে না, অর্থাৎ কিসাস মানে না। তার এ কথাটা নির্জলা মিথ্যা। শুধু হানাফিগণ কেন, যে কেউই কিসাসকে অস্বীকার করবে সে নিঃসন্দেহে কাফের হয়ে যাবে।

ফিকহে হানাফিতে কিসাসের হুকুম

১. কুদুরিতে আছে, হত্যা পাঁচ প্রকার : ১. قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা। ২. قتل شبه عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় এমন হত্যা। ৩. قتل خطا বা ভুলক্রমে হত্যা। ৪. قتل شبه خطا বা ভুলক্রমে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ভুলক্রমে নয় এমন হত্যা। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে অথবা এমন কোনো জিনিস দিয়ে, যা অস্ত্রের মত টুকরা বা ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন ধারালো কেচি বা পাথর বা আগুন,

৭. তাফসীরে আহসানুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৭১, টিকা নং ২, সৌদি আরব থেকে মুদ্রিত।

ইত্যাদি দিয়ে মেরে ফেলা। এভাবে হত্যাকারীর শাস্তি হল, সে গুনাহগার হবে এবং তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে।[৮]

২. কানযুদ দাকাইকে আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি : (যা চার প্রকার হত্যার প্রথম প্রকার) আর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বলা হয়, জেনে বুঝে কোনো অস্ত্র দিয়ে অথবা এমন কোনো জিনিস দিয়ে মেরে ফেলা, যা (শরীরের) অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পৃথক করতে পারে, তা ধারালো খড়ি হোক অথবা পাথর হোক কিংবা বাঁশের ফালি হোক। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া। এই সকল সুরতের হুকুম হল, হত্যাকারী গুনাহগার হবে এবং তার উপর কিসাস (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) ওয়াজিব হবে। (অর্থাৎ হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যা করা হবে।)[৯]

৩. কানযুদ দাকাইকেই আরেকটু পরে আছে, এমন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করলে, যাকে খুন করা সর্বাবস্থায় হারাম, কিসাস (অর্থাৎ খুনের বদলায় খুন) ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তি অন্য কোনো স্বাধীন ব্যক্তি বা দাসকে প্রাণে মেরে ফেলে, তাহলে নিহত ব্যক্তির বদলায় তাকেও প্রাণে মেরে ফেলা যাবে। (আহসানুল মাসাইল উর্দু তরজমা কানযুদ দাকাইক : পৃষ্ঠা ৩৮৭)।

৪. শরহে বেকায়ায় আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার কারণে হত্যাকারী গুনাহগার হয় এবং তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়।[১০]

এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা আতা' মুহাম্মদ উচাকযায়ী লেখেন, "ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসই প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ। তোমাদের উপর কিসাস (ফরয করে দেওয়া হয়েছে) লিখে দেওয়া হয়েছে নিহতদের ক্ষেত্রে। এমনিভাবে হাদিসে এসেছে, العمد قود (رواه ابن أبي شيبة ودار قطني) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা কিসাসকে ওয়াজিব করে"।[১১]

---

৮. ইশরাকে নূরী উর্দু তরজমা কুদূরী, কিতাবুল জিনায়াত।

৯. আহসানুল মাসাইল উদূ তরজমা কানযুদ দাকাইক : পৃষ্ঠা ৩৮৬।

১০. শরহে বেকায়া : কিতাবুল জিনায়াত।

১১. আশরাফুল বেকায়া উর্দু শরহে বেকায়া, কিতাবুল জিনায়াত, পৃষ্ঠা ২৪৩।

৫. হিদায়ায় আছে, ইমাম কুদুরি বলেছেন, আর কিসাস ওয়াজিব আল্লাহর তায়ালার হুকুম كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى এর কারণে। তবে কিসাস ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে শর্তযুক্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম العمد قود (ইচ্ছা কিসাস ওয়াজিব করে) এর কারণে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে করার ব্যাপারে হুকুম হল কিসাস নেওয়া। আর এজন্যও যে, ইচ্ছাকৃতভাবে করলে অপরাধ পূর্ণতা পায় এবং ভীতি প্রদর্শনের হেকমত ইচ্ছাকৃতভাবে করার উপর পূর্ণ হয়ে যায়, আর সর্বোচ্চ শাস্তির হিসাবে কিসাস ছাড়া শরিয়তে আর কোনো জিনিসের কথা বলা হয়নি।

এ ইবারতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তায মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ হানাফি তাওলাবী লেখেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে গুনাহের সাথে সাথে কিসাসও ওয়াজিব হয়। কেননা কুরআনের এ আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى কিসাস ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করে।[১২]

৬. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে, অপরাধ দুই প্রকার : এক প্রকার কিসাস ওয়াজিবকারী, আর তা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত অপরাধ।[১৩]

৭. দুররে মুখতারে আছে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে মূলত কিসাস ওয়াজিব হয়, মাল ওয়াজিব হয় না।[১৪]

৮. মুফতি মুহাম্মদ শফি হানাফি দেওবন্দি রহ. লেখেন, "এজন্যই শরীয়তের পরিভাষায় কিসাস বলা হয় হত্যা এবং আহত করার ঐ শাস্তিকে, যার মধ্যে সমতা এবং সাদৃশ্যের বিষয়কে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।"

মাসআলা : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার সংজ্ঞা হল, ইচ্ছা করে লোহার অস্ত্র অথবা এমন কোনো জিনিস দিয়ে হত্যা করা, যা দ্বারা চামড়া ও গোশত কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়। কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই ওয়াজিব হয়ে থাকে।

---

১২. আশরাফুল হেদায়া তরজমা ওয়া শরহে উর্দু হেদায়া আখেরাইন, খণ্ড নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৫, কিতাবুল জিনায়াত।

১৩. ফাতাওয়া আলমগিরী উর্দু খন্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৯৪, কিতাবুল জিনায়াত।

১৪. দুররে মুখতার, উর্দু তরজমা, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৪৯, কিতাবুল জিনায়াত।

মাসআলা : এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় হত্যা করা যাবে, তেমনিভাবে গোলামের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে। এবং যেমনিভাবে মহিলার বদলায় মহিলাকে হত্যা করা যাবে, ঠিক তেমনিভাবে মহিলার বদলায় পুরুষকেও হত্যা করা যাবে।[১৫]

৯. মাওলানা মুফতি আজিজুর রহমান বিজনুরী, যিনি মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর শাগরিদ এবং রেসালায়ে মদিনার সম্পাদক, তিনি লেখেন;

সুন্নাত শরিফাহ এবং অপরাধ ও শাস্তির বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হত্যা আর পুরা জগত হত্যা একই কথা। এর মাধ্যমে রক্তপাতের ধারা শুরু হয় এবং এমন এক আগুন জ্বলে ওঠে, যা বছরের পর বছরেও নিভে না। এজন্য একে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হত্যার বদলায় হত্যা ফরয করা হয়েছে। আর তা এভাবে যে, স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলায় দাস এবং মহিলার বদলায় মহিলা, যদি হত্যাকারীকে তার নিহত ভাইয়ের কিসাসের ক্ষেত্রে কিছু মাফ করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ কর এবং তা ভালভাবে আদায় কর। এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সহজীকরণ এবং দয়া। আর যে এরপরও সীমলঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর হে

১৫. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৫।

বুদ্ধিমানগণ, তোমাদের জন্য কিসাসের বিধানের মধ্যেই জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বেঁচে থাক।

ইসলাম এ হুকুম দিয়ে খুন-খারাবীর ধারার যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। নিম্নে সুন্নাত শরিফার আলোকে এ ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফের কিছু নমুনা পেশ করা হচ্ছে–

গোলাম হত্যা

ইমাম আওযায়ী রহ. রেওয়ায়েত করেছেন, এক ব্যক্তি নিজের গোলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একশ চাবুকাঘাত করলেন এবং এক বছরের জন্য তাকে শহর থেকে বহিষ্কার করলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন, সে যেন একজন গোলাম আযাদ করে দেয়, আর তিনি তার থেকে কিসাস নিলেন না। কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. রেওয়ায়েত করেছেন, من قتل عبدا قتلناه (যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে হত্যা করবে আমরা তাকে হত্যা করব)

এ হাদিসটি 'মাহফুয' এবং এটি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আর এ হত্যা রাষ্ট্রীয় শাস্তি, যা সমকালীন শাসক বা বিচারকের সিদ্ধান্তের উপর মওকুফ।[১৬]

হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অভিভাবক

সহিহ মুসলিমে আছে, এক ব্যক্তি দাবি করল, অমুক তার ভাইকে হত্যা করেছে। হত্যাকারী এটা স্বীকারও করে নিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি তাকে আটক কর। যখন সে তাকে আটক করে নিয়ে যেতে লাগল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আটককারী এ হত্যাকারীকে হত্যা করে তাহলে সেও হত্যাকারী হয়ে যাবে। একথা শুনে আটককারী এসে বলল, আমি তো শুধু আপনি বলার কারণেই তাকে আটক করেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না? এমন

---

১৬. যাদুল মাআদ-ইবনুল কায়্যিম, বাযল ৫/১২৭।

করলে তুমি তার এবং তার হাতে নিহত ব্যক্তি উভয়ের গুনাহ তোমার ঘাড়ে নিতে। এরপর লোকটি তাকে ছেড়ে দিল।[১৭]

ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে হাদিস রেওয়ায়েত করেছেন, এক ব্যক্তি জনাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একলোককে হত্যা করল। বিষয়টা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থাপন করা হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের হাতে তুলে দিলেন। হত্যাকারী বলল, আমি তাকে জেনে বুঝে হত্যা করিনি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবককে বললেন, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং এরপরেও তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল।[১৮]

বাঁদী হত্যা

সহিহাইনে আছে, এক ইহুদি এক আনসারীর বাঁদীকে অলংকারের লোভে দুটি পাথরে মাথা থেতলে হত্যা করল। তাকে আটক করা হল। আবু দাউদ রেওয়ায়েত করেছেন, তাকে আটক করার সময় ঐ বাঁদী জীবিত ছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? সে মাথার ইশারায় নাকচ করল। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন ব্যক্তির নাম বললেন। যখন তিনি ঐ ইহুদির নাম নিলেন, তখন সে হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। বোঝাল যে, সেই হত্যা করেছে। এরপর সেই ইহুদিও স্বীকার করল। তখন জনাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও পাথরে মাথা থেতলে হত্যা করলেন।

এ হাদিসে একথার দলিল রয়েছে যে, পুরুষকে মহিলার বদলায় হত্যা করা হবে। এবং একথার দলিলও রয়েছে যে, অপরাধী যে আচরণ করবে, তার সাথেও একই রকম আচরণ করা হবে। এছাড়া একথারও দলিল রয়েছে যে,

---

১৭. যাদুল মাআদ ও আবু দাউদ কিতাবে এ ঘটনা কয়েক সনদে বর্ণিত হয়েছে।।

১৮. যাদুল মা'আদ–আবু দাউদে বর্ণিত।

হত্যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এর শাস্তি দেওয়ার জন্য নিহতের অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন নেই এবং তার কাছে সোপর্দ করারও প্রয়োজন নেই যে, সে নিজেই প্রতিশোধ নিবে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, চাইলে তুমি তাকে মাফ করতে পার, আর চাইলে হত্যা করতে পার। বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করে ফেলেছেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মত এটাই এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. এটাকেই গ্রহণ করেছেন।[১৯]

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, বর্তমানে হত্যার শাস্তি কেবল তরবারির মাধ্যমেই হত্যা করা। এর জন্য অন্য অন্যায় পন্থাগুলো অবলম্বন করা যাবে না। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, لا قود إلا بالسيف কিসাস শুধু তরবারির মাধ্যমেই নেওয়া হবে।

এ হাদিসটি ইমাম তহাবি এবং আবু দাউদ তয়ালিসী রেওয়ায়েত করেছেন।[২০]

আর কোনো কোন আলেম বলেছেন, ইহুদিকে মাথা থেতলে হত্যা করার কারণ ছিল তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেছেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তিও এভাবে দেওয়া যাবে না। এর শাস্তিও তরবারির মাধ্যমে দিতে হবে।[২১]

হানাফি হযরতগণ বলেছেন, সঠিক কথা হচ্ছে, এ হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল, পরে তা রহিত হয়ে গেছে এবং হত্যার শাস্তি শুধু তরবারির মাধ্যমে দেওয়াটাই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের মতে হানাফি ওলামায়েকেরামের মতটি কেয়াসের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ 'মুসলা' তথা শারীরিক আকার বিকৃত করে দেওয়ার হুকুম ৬ষ্ঠ হিজরির পরে রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা এই হিজরিসনেই উরাইনাবাসীর ঘটনা ঘটেছিল। আর বাঁদীকে হত্যা করার ঘটনা খন্দক যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে

---

১৯. যাদুল মাআদ–আবূদাউদে বর্ণিত।

২০. বাযল : ৫/১৭৩।

২১. যাদুল মাআদ।

এবং বনু কুরাইযার হত্যার পূর্বে ঘটেছিল। কেননা এরপর তো মদিনায় কোনো ইহুদি ছিল না, তাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।

গর্ভবতী মহিলা হত্যা

সহিহাইনে আছে, হুযাইল গোত্রের দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। তাদের একজন অপরজনের উপর পাথর নিক্ষেপ করল, এ ছিল গর্ভবতী। ফলে পাথরের আঘাতে তার গর্ভ নষ্ট হয়ে গেল, পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে এল এবং সেও মারা গেল। বিষয়টা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উত্থাপন করা হল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভের শিশুর বদলায় একজন গোলাম বা বাঁদী দিতে বললেন আর নিহত মহিলার বদলায় হত্যাকারিণীর ওয়ারিশদের দিয়ত দিতে বললেন। আর নাসায়ির আছে, তিনি এ মহিলাকে হত্যা করিয়ে ফেললেন। তবে সর্বশেষ প্রমাণিত কথা হচ্ছে, তিনি তাকে হত্যা করাননি। এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, قتل شبه عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় এমন হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস নেই।[২২]

সামষ্টিক জরিমানা অথবা কাসামাত

যদি কোনো হত্যা এমনভাবে সংঘটিত হয় যে, নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যায় না, তাহলে ঐ গোত্রের উপর দিয়ত আসবে। সহিহাইনে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি ও আনসার গোত্রের মাঝে একটি বিচার করেছেন। তিনি হুওয়াইয়িসা, মুহাইয়িসা এবং আবদুর রহমানকে একটি হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বলেছেন, তোমরা কি কসম খেয়ে বলতে পারবে যে, তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তির রক্তের হক অবশ্যই পাবে? তারা জবাব দিলেন, আমরা তো হত্যাকারীকে দেখিনি।

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে এখন ইহুদিদের পঞ্চাশটি কসম নিয়ে ছেড়ে দাও। তারা উত্তর দিলেন, আমাদের কাছে তাদের কসমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

২২. আবু দাউদে বর্নিত–যাদুল মা'আদ।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের দিয়ত নিজের পক্ষ থেকে আদায় করলেন। হাদিসসমূহের শব্দে বিভিন্নতা রয়েছে। কোনো হাদিসে আছে, নিজের পক্ষ থেকে দিয়ত আদায় করেছেন আর কোনো কোন হাদিসে আছে, সদকার উট দ্বারা দিয়ত আদায় করেছেন। আর আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, এর দিয়ত ইহুদিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কারণ নিহত ব্যক্তির লাশ তাদের এলাকাতেই পাওয়া গিয়েছিল। আর মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসমের সূচনা ইহুদিদের থেকে করতে চেয়েছিলেন, তখন তারা কসম করতে অস্বীকার করে দিয়েছিল। এরপর তিনি আনসার গোত্রকে কসম করতে বললেন, তারাও কসম করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তিনি এ দিয়ত ইহুদিদের উপর ন্যস্ত করে দিলেন এবং তা আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের কিছু সাহায্যও করলেন। এই পূর্ণ ঘটনাটি মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত আছে।[২৩]

এ বিচার থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়–

ক. কাসামাত বা সামষ্টিক জরিমানার শরয়ি বিধান।

খ. যিম্মিরা যখন কোনো হক দিতে অস্বীকৃতি জানাবে তখন তাদের সাথে কৃত নিরাপত্তা চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে।

গ. যিম্মিদের (অমুসলিমদের) বিচারও শরিয়ত মোতাবেক করা হবে, যদি তারা আমাদের কাছে বিচার নিয়ে আসে।

কূপে ডুবে যাওয়া ব্যক্তি

একবার চার ব্যক্তি এমনভাবে কূপে পড়ে মারা গেল যে, তারা একে অপরকে রক্ষা করতে গিয়ে একে একে সকলেই প্রাণ হারায়। ইমাম আহমদ রহ. রেওয়ায়েত করেছেন, তাদের মধ্যে একজন ইয়ামানে একটি কূপ খনন করে। এরপর তাদের দ্বিতীয়জন ঐ কূপে পড়ে যায়। পরে তাকে রক্ষা করতে গিয়ে তৃতীয়জন এবং এই তৃতীয়জনকে রক্ষা করতে গিয়ে চতুর্থজন এভাবে তারা চারজনই প্রাণ হারায়।

---

২৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আওজাযুল মাসালিক :৫/৫২৫।

তাদের আত্মীয়রা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে এ বিষয়টি উত্থাপন করে। (ঐ সময় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামানের কাযি ছিলেন) হযরত আলি রা. আদেশ দেন যে, যে কূপ খনন করেছিল, সে চারভাগের একভাগ দিয়ত দিবে এবং এরপর দ্বিতীয়জন এক চতুর্থাংশ আর তৃতীয়জন অর্ধেক দিয়ত দিবে, কেননা তার পর শুধু একজনই মারা গেছে। আর চতুর্থজনের উপর পুর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

পরের বছর তাদের আত্মীয়রা যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় তখন তারা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ফায়সালা শোনায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ফায়সালাকে সঠিক বলে মত দেন। বাযযার এমনই রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে যে, তাদের ওয়ারিশরা প্রথমে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারপর জনাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়েছিল। এ সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে মাকামে ইবরাহিমে অবস্থান করছিলেন।[২৪]

সৎমাকে বিবাহ করা

আহমদ ও নাসায়ি রেওয়ায়েত করেছেন, হযরত বারা' ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি আমার মামার সাথে সাক্ষাত করলাম। তার কাছে একটি ঝান্ডা ছিল। তিনি বললেন, আমাকে জনাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠিয়েছেন। তুমি আমাকে ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়ে দাও যে তার মাকে বিবাহ করেছে, আমি তাকে হত্যা করব এবং তার সম্পত্তি জব্দ করব। আর তারিখে ইবনে খায়সামায় আছে, ঐ লোকটিকে হত্যা করা হয় এবং তার মাল জব্দ করে সেখান থেকে এক পঞ্চমাংশ নিয়ে নেওয়া হয়। (এর কারণ হচ্ছে, এ ব্যক্তি মাকে বিবাহ করাকে হালাল মনে করত, আর হারামকে হালাল বলে বিশ্বাসকারী মুরতাদ হয়ে যায়; তাই তাকে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে হত্যা করা হয়েছে)।

---

২৪. যাদুল মাআদ-ইবনুল কায়্যিম।

আর ইবনে মাজাহতে আছে,

من وقع ذات محرم فاقتلوه

'যে ব্যক্তি নিজের মাহরাম কোনো মহিলার সাথে যিনা করেছে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

জুযজানী উল্লেখ করেছেন, হাজ্জাজের কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে তার বোনকে বিবাহ করেছিল। হাজ্জাজ বলল, তাকে আটক করে রাখ এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যারা রয়েছেন, তাদের তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মুতাররিফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করলেন,

'যে মুমিনদের মাহরামের সাথে জড়াল তাকে তরবারি দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও।'

ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, এমন অপরাধীর ক্ষেত্রে যিনার শরয়ি শাস্তি কার্যকর করা হবে।[২৫]

দাঁতের কিসাস

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেছেন, বিনতে নযর এক বাঁদীকে থাপ্পড় মারল। এতে তার দাঁত পড়ে গেল। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উত্থাপিত হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিসাসের আদেশ প্রদান করলেন। তখন তার মা অনুরোধ করল, আল্লাহর রাসুল, আপনি তার কিসাস নিয়েন না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিতাবুল্লাহর আদেশ এটাই। তার মা আবার অনুরোধ জানাল, আল্লাহর রাসুল, কিসাস নিয়েন না। এ কাকুতি-মিনতির কারণে বাঁদীর গোত্র বিনতে নযরকে মাফ করে দিল এবং তারা দিয়তের উপর রাজি হয়ে গেল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন,

إن من عباد الله من لو أقسموا على الله لأبره

---

২৫. যাদুল মাআদ- ইবনে কাইয়িম।

আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যদি তারা আল্লাহর নামে কসম খায় আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।[২৬]

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা

এক বক্তি অন্যের হাত কামড়ে কেটে ফেলল, যখন সে তার হাত টান দিয়ে ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে বের করল তার সামনের দাঁত পড়ে গেল। এ বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উত্থাপন করা হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার উপর কোনো দিয়ত নেই। এর দ্বারা বোঝা গেল, যদি কোনো ব্যক্তি জালেমের হাত থেকে নিজের মাল বা জান রক্ষা করতে চায়, আর এতে জালেমের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে তা মাফ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়ত দশটি করে উট নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক দাঁতের দিয়ত পাঁচটি করে উট নির্ধারণ করেছেন। আর সকল দাঁতের দিয়তই এক সমান। এছাড়া চোখ নষ্ট করলে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ত এবং হাত কাটলে তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ত আর নাক কাটলে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে।[২৭]

১০. মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদবী হানাফি লেখেন,

কিসাস

মানুষের জান হোক বা মাল হোক অথবা ইজ্জত ও সম্মান হোক, এগুলোর মধ্যে প্রতিটি জিনিসকে ইসলামি শরিয়ত সম্মানিত আখ্যা দিয়েছে। এজন্য এসবের ক্ষতি হয়, এ ধরনের সকল কর্মকাণ্ডকে গুনাহ ও অপরাধ বলা হয়েছে এবং এর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। হদ ও কিসাসের মূলতত্ত্ব এটাই যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শরয়ি কোনো কারণ ছাড়া (শরয়ি কারণের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জিহাদের ক্ষেত্র হওয়া বা যিনাকারী হওয়া অথবা কিসাস ইত্যাদির ব্যাপার হওয়া, তাহলে এ ধরনের ক্ষেত্রে হত্যা করা

---

২৬. আবু দাউদ।

২৭. ইসলামি দসতুর কে বুনিয়াদি আওর রাহনুমা উসুল : পৃষ্ঠা ১১৫-১২২।

জায়েয) হত্যা করা ফেলে তাহলে ইসলামি শরিয়ত নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করে। এটাকেই কিসাস বলে।

এমনিভাবে যদি কারো শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফুকাহায়েকেরাম এর বদলা নেওয়াকেও কিসাস বলে প্রকাশ করে থাকেন। এজন্য ফুকাহায়েকেরাম সাধারণত হত্যা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সংক্রান্ত বিধানাবলি জিনায়াত (আরবিভাষায় ঐ সীমালঙ্ঘনকে জিনায়াত বলে, যা কোনো ব্যক্তি অন্যের উপর করে) বলে প্রকাশ করে থাকেন, যার মধ্যে সকল প্রকার সীমালঙ্ঘনই অন্তর্ভুক্ত। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ফুকাহায়েকেরাম হদসমূহের সাথে কিসাসের কথা উল্লেখ করেন না, বরং এটাকে হদসমূহ থেকে আলাদাভাবে এজন্য উল্লেখ করেন যে, এর মধ্যে বান্দার হকের বিষয়টি প্রধান হয়ে থাকে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা তাকে মাফও করতে পারে। কিন্তু হদসমূহের ক্ষেত্রে যে অপরাধ হয়ে থাকে, এগুলোর হিসাব আল্লাহর হকের মধ্যে হয়ে থাকে। এর মধ্যে আল্লাহর হকের বিষয়টি প্রধান হয়ে থাকে। একে কোনো ব্যক্তি মাফ করতে পারে না।

অবশ্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কিসাসও আল্লাহর হকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ মানুষের প্রাণকে সম্মানিত করেছেন, আর হত্যাকারী এ সম্মানকে নষ্ট করে। এটা আল্লাহর তায়ালার কাছে চরম অপছন্দনীয় বিষয়। এমনিভাবে যে সকল গুনাহের কারণে হদ ওয়াজিব হয়, এগুলোর মধ্যেও কোনো না কোনোভাবে হক নষ্ট হয়ে থাকে। শুধু চুরি, ডাকাতির মধ্যেই নয়, বরং যিনা ও অপবাদের মধ্যেও কোনো না কোনোভাবে থেকে বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে আল্লাহর হকটাই প্রধান, তাই এগুলোর শাস্তি কেউ মাফ করতে পারে না।

কিসাসের শরয়ি সংজ্ঞা

ফুকাহায়েকেরাম এর পারিভাষিক সংজ্ঞা করেছেন–

حقا إنه عقوبة مقدرة تجب[28]

অর্থাৎ এটা একটা নির্ধারিত শাস্তি, যা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত।

২৮. আত তা'যীর ফীশশারীয়াতিল ইসলামিয়াহ : পৃষ্ঠা ২৫।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিসাসও হদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কিসাসের শাস্তিও নির্ধারিত রয়েছে; কিন্তু আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সাধারণ অপরাধগুলো থেকে ভিন্ন যে, এটা নিরেট এক ব্যক্তির হক, এ ব্যক্তি তা মাফ করতে পারে। অর্থাৎ কিসাস ঐ শাস্তিকে বলে, যা কোনো হত্যার বদলায় হত্যাকারীকে দেওয়া হয়।

হত্যা পাঁচ প্রকার :

১. قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা।

২. قتل شبه عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় এমন হত্যা।

৩. قتل خطا বা ভুলক্রমে হত্যা।

৪. قتل شبه خطا বা ভুলক্রমে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ভুলক্রমে নয় এমন হত্যা।

৫. হত্যার কারণ হওয়া।

১. قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা

قتل عمد মানে হল, কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করে ফেলা। এর সংজ্ঞায় হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح.[২৯]

অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কাউকে লোহার অস্ত্র অথবা এর মত কোনো জিনিস দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করা এবং তাকে হত্যা করে ফেলা।

আল্লামা কাসানি লোহার অস্ত্রের উদাহরণের মধ্যে তরবারি, ছুরি, বর্শা ইত্যাদি এবং অস্ত্রসদৃশ বা এর মত আহতকারী জিনিসগুলোর মধ্যে আগুন, কাঁচ, বাঁশের ছাল অথবা তামার কোনো জিনিস দিয়ে হত্যা করার কথা বলেছেন। সে যুগে বন্দুক এবং বোমার প্রচলন ছিল না, তাই এখানে

---

২৯. হেদায়া : ৪/৫৪৩।

এগুলোর উল্লেখ করা হয়নি। এজন্য বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল এবং হাতবোমা ইত্যাদিও লোহার অস্ত্র বা আগুনের মধ্যে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে লোহার তৈরি অস্ত্রের বিবেচনা করেছেন। আর সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামগণ আঘাতের বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ যে জিনিস অথবা যে পদ্ধতি ব্যবহার করে মানুষকে ইচ্ছা করে হত্যা করা যেতে পারে এক্ষেত্রে সেটাই বিবেচ্য হবে। উদাহরণত কেউ কারো গলা টিপে ধরল বা কাউকে ধোকা দিয়ে নিচে ফেলে দিল আর এতে তার মৃত্যু হয়ে গেল। এমনিভাবে আরো বিভিন্ন সুরতও হতে পারে। মোটকথা, হত্যাকারী নিজ ইচ্ছায় যে পদ্ধতি এবং যে জিনিস দিয়ে নিহত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করবে সেটাই ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার মধ্যে গণ্য হবে।

قتل عمد বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার হুকুম

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেওয়া হবে। যেমনটি কুরআনে পাকে রয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

অর্থাৎ তোমাদের উপর হত্যার অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস ফরয করা হয়েছে– স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলায় গোলাম এবং মহিলার বদলায় মহিলাকে হত্যা করা হবে।

অবশ্য যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবক ও ওয়ারিসরা কিসাস মাফ করে দেয় তাহলে হত্যাকারী থেকে দিয়ত নেওয়া হবে এ শর্তে যে, হত্যাকারীও দিয়ত দিতে রাজি থাকবে। মাফ করা এবং দিয়ত ওয়াজিব হওয়া ও না হওয়ার কয়েকটি সুরত রয়েছে।

হত্যাকারীর দ্বিতীয় শাস্তি এই যে, যদি সে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয়ে থাকে তাহলে সে তার মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে, আর তার তৃতীয় শাস্তি আখেরাতের হিসাবে অর্থাৎ আখেরাতে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

সম্মানিত পাঠক, আমরা ফিকহে হানাফির দশটি উদ্ধৃতি পেশ করলাম। যেগুলোর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে কিসাসের হুকুম রয়েছে। এ দশটি ছাড়া আরো

অগণিত উদ্ধৃতি পেশ করা যাবে। আপত্তি উত্থাপনকারী যে কথা লিখেছে যে, হানাফিরা কিসাস মানে না, এটা সম্পূর্ণ প্রোপাগান্ডা। প্রোপাগান্ডা ছড়ানো এবং প্রতারণার যে শাস্তির কথা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে রয়েছে তার ব্যাপারে ভয় করা চাই।

এ পর্যন্ত এ কথা তো প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হানাফিগণ কিসাসের পক্ষে মত প্রদানকারী, এবং যে কিসাসকে অস্বীকার করে সে কাফের।

আপত্তি উত্থাপনকারী ফিকহে হানাফির এমন কিছু ঘটনা এবং বিশেষ মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে উল্লিখিত অপরাধের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ফিকহে হানাফির দৃষ্টিতে কিসাস প্রযোজ্য হয় না। কিসাস ছাড়া অন্য শাস্তি প্রযোজ্য হয়, অথবা দিয়তের হুকুম দেওয়া হয়, অথবা বিচারক অপরাধ অনুযায়ী এর রাষ্ট্রীয় সাজা দিয়ে থাকেন। আমরা আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে দাবি করছি, যদি তাদের সাহস থাকে তাহলে তারা সকল মাসআলার মধ্যে কিসাস (হত্যার বদলায় হত্যা) শুধু কুরআন দিয়ে প্রমাণ করে দেখাক। কেননা তারা শিরোনাম দিয়েছে 'ফিকহে হানাফির কুরআন বিরোধী মাসআলাসমূহ'। এজন্য আমরা সুন্নতের কথা উল্লেখ করিনি। যদি মাওলানা এই সকল মাসআলার মধ্যে কিসাসের হুকুম কুরআন দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে আমরা ফিকহে হানাফি ত্যাগ করব এবং কুরআনের উপর আমল করব। তবে মাওলানা যেন উসুলে ফিকহের স্বীকৃত এই বিধানটি মনে রাখেন যে, দাবি ও দলিলের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকা জরুরি এবং আম ও খাসের মধ্যকার পার্থক্যও যেন তিনি মনে রাখেন।

এখন আমরা ধারাবাহিকভাবে ঐ সকল মাসআলা উল্লেখ করব–

মাসআলা : এক

যদি কুরআনে এ অপরাধের শাস্তি কিসাস হয় তাহলে আপত্তি উত্থাপনকারী আয়াতটি পেশ করুক, নচেৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উপর আপত্তি তোলা বন্ধ করুক। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ অপরাধের উপর দিয়ত আসে, যা আপত্তি উত্থাপনকারী উল্লেখ করেননি, এবং হিদায়ার

মাসআলাও পুরোপুরি লেখেননি। আমরা হিদায়া থেকে পুরো মাসআলা উল্লেখ করছি–

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেছেন, যদি কেউ কোনো শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নদীতে ডুবিয়ে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর কিসাস নেই। আর সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.) বলেছেন, তার থেকে কিসাস নেওয়া হবে।

এ এবারতের একটু পরে রয়েছে, 'ইমাম আবু হানিফার দলিল নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশনা যে, জেনে রাখো, قتل شبه عمد (ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তবে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় এমন হত্যা) এ নিহত ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যাকে চাবুক ও লাঠি দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। আর এধরনের হত্যা এবং সকল প্রকার ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে দিয়ত দিতে হবে।'[৩০]

আপত্তি উত্থাপনকারী হিদায়ার ৫৬২ পৃষ্ঠার ফটোকপি দিয়েছেন, কিন্তু ৫৬৩ নং পৃষ্ঠার ফটোকপি দেননি, যেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দলিল হিসাবে হাদিস লেখা আছে।[৩১]

শামসুল আইম্মাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সারাখসী হানাফি লেখেন, শিবহে আমাদ হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী গুনাহগার হবে এবং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। (কাফফারা হচ্ছে, একজন গোলাম আযাদ করা অথবা দুই মাস ধারাবাহিক রোযা রাখা) আর তার আসাবাদের উপর দিয়তে মুগাল্লাযা (একশ উট) ওয়াজিব হবে, যেগুলো তারা তিন বছরে আদায় করবে। আর হত্যাকারী যদি ওয়ারিশ হয় তাহলে এক্ষেত্রে সে নিহত ব্যক্তির মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে।[৩২]

সম্মানিত পাঠক, দেখলেন তো, ফিকহে হানাফিতে এধরনের অপরাধের শাস্তি বিদ্যমান রয়েছে। বরং হানাফি ফকিহগণ একথা লিখেছেন, এ মাসআলায় সাহেবাইনের মতের উপর ফাতওয়া। আর সাহেবাইনের মত

---

৩০. আশরাফুল হেদায়া : ১৫/৩৮,৩৯, কিতাবুল জিনায়াত।

৩১. এ হাদিস ইবনে হিব্বানে আছে এবং কানযুল উম্মাল খণ্ড নং ১৫-পৃষ্ঠা নং ৪১০ রয়েছে।

৩২. আল-মাবসুত সারাখসী : ২৬/৬৬ বৈরূত।

হিদায়ার এই ৫৬২ নং পৃষ্ঠাতেই রয়েছে, যার ফটোকপি আপত্তি উত্থাপনকারী দিয়েছেন, কিন্তু তিনি এর অনুবাদ করেননি।

মাসআলা : দুই

খোদ আপত্তি উত্থাপনকারী এ কথা স্বীকার করেছেন যে, হত্যাকারীর গোত্রের লোকদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আপত্তি উত্থাপনকারী বলছেন যে, এই ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীর মাসআলা কুরআন বিরোধী। এই মাসআলায় কিসাস হওয়া দরকার ছিল। আমরা আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে অনুরোধ করব তিনি যেন এ বিশেষ সুরতের ক্ষেত্রে কুরআন দ্বারা কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কথা প্রমাণ করেন। কেননা তিনি শিরোনাম দিয়েছেন, "ফিকহে হানাফির কুরআন বিরোধী মাসআলাসমূহ"। তিনি এক্ষেত্রে কুরআনের কোনো আয়াত তো পেশ করতে পারেননি, একটি বিরোধীপূর্ণ হাদিস নকল করেছেন আর তাও হাদিসটি আবু দাউদের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত নুসখাগুলোতে নেই, বরং তিনি একটি নতুন নুসখা থেকে এটি নকল করেছেন। এ হাদিসটি হুবহু এই শব্দে মাদরাসায় প্রচলিত ও পঠিত নুসখাগুলোতে পাওয়া যায় না। আপত্তি উত্থাপনকারীর জন্য ফরয ছিল উভয় প্রকারের হাদিস নকল করা এবং তারপর এগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষ দূর করা, এরপর একথা প্রমাণ করা যে, এ ধরনের সুরতে কিসাসের হুকুম দেওয়া হবে না দিয়তের হুকুম দেওয়া হবে। এখন আমরা ঐ সকল হাদিস নকল করছি, যেগুলোর মধ্যে দিয়তের হুকুম নেই।

প্রথম হাদিস

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষ মিশ্রিত একটি ভুনা ছাগল আনল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেয়ে ফেললেন। এরপর লোকেরা তাকে আটক করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন বিষ মিশিয়েছ? সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করার জন্য মিশিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমাকে কখনও এ কাজ করতে দিবেন না, অথবা আল্লাহ তোমাকে আমার উপর বিজয়ী করবেন না। সাহাবায়েকেরাম আরয করলেন, হুকুম দিলে আমরা তাকে মেরে ফেলব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর থেকে এ বিষের যন্ত্রণা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁতের মাড়ীতে সবসময় অনুভূত হত।

(أبو داود، باب فيمن سقى رجلا)

দ্বিতীয় হাদিস

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষ মিশ্রিত ছাগল পাঠাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি।[৩৩]

তৃতীয় হাদিস

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, খায়বারের এক ইহুদি মহিলা একটি ভুনা ছাগলে বিষ মেশাল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাদিয়া স্বরূপ পাঠাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে হাত দিয়ে এক টুকরা নিয়ে কিছু অংশ খেলেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথের কয়েকজন সাহাবিও তা থেকে খেলেন। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, থাম, তোমরা এ খাবার থেকে তোমাদের হাত উঠিয়ে নাও।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ ছাগলে বিষ মিশিয়েছিলে? সে বলল, আপনাকে কে বলেছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে আমার হাতে থাকা গোশতের টুকরাটি বলেছে। (অর্থাৎ গোশত নিজেই বলেছে যে, আমার মধ্যে বিষ রয়েছে।)

---

৩৩. باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ।

ঐ মহিলা বলল, সত্যিই আমি তাতে বিষ মিশিয়েছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মতলব কী ছিল? সে বলল, আমার মনে এ কথা এসেছে যে, যদি আপনি নবি হয়ে থাকেন তাহলে বিষ আপনার ক্ষতি করবে না, আর যদি আপনি নবি না হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার থেকে পরিত্রাণ পাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের মধ্য থেকে কয়েকজন, যারা ঐ গোশত খেয়েছিলেন, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উভয় কাঁধের মাঝে শিঙ্গা লাগালেন। এই বিষের কারণেই আবু হিন্দ গাভীর শিং ও ছুরির সাহায্যে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। এ আবু হিন্দ আনসারের একটি গোত্র বনু বায়াযার মাওলা বা আযাদকৃত গোলাম ছিলেন।[৩৪]

সম্মানিত পাঠক, আপনারা দেখেছেন, আপত্তি উত্থাপনকারী এ সকল হাদিসের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কারণ ঘটনাটি এভাবে প্রমাণিত হলে উক্ত মাসআলায় কিসাসের পরিবর্তে দিয়তই প্রযোজ্য হবে, যা ফিকহে হানাফিতে রয়েছে এবং ফাতাওয়া আলমগীরির মাসআলা সম্পূর্ণরূপে সঠিক প্রমাণিত হবে।

মাসআলা নং (৩)

এতে আপত্তি উত্থাপনকারী ভুল অনুবাদ করেছেন। আমরা ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীর গায়রে মুকাল্লিদ অনুবাদক সাইয়িদ আমির আলির অনুবাদ উদ্ধৃত করছি : "যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে শিকলবন্দি করে একটি কক্ষে আটকে রাখে, যার ফলে ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় মরে যায়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মত হল, আমি এ ব্যক্তিকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিব আর মৃত ব্যক্তির দিয়ত তার সহায়ক আত্মীয়-স্বজনের উপর ওয়াজিব হবে।"

কিন্তু ইমাম আযম রহ. বলেছেন, আটককারীর উপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। (কিছু ওয়াজিব না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাকে রাষ্ট্রীয় সাজাও

---

৩৪. أبو داود مترجم : ٣/٤١٤ باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ।

দেওয়া হবে না, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না।) এবং এর উপরই ফাতওয়া।[৩৫]

নোট : আলমগিরীতে তো আছে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের উপর ফাতওয়া। কিন্তু ফিকহে হানাফির কিছু কিছু কিতাবে "ফাতওয়া ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতের উপর" হওয়ার কথা নকল করা হয়েছে। এটা তো ফিকহে হানাফির মাসআলা।

আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে এমন সুরতে যদি কিসাস আবশ্যক হয়ে থাকে তাহলে তিনি কুরআন দ্বারা এটা প্রমাণ করে দিক। আমরা তার কথা মেনে নিব।

মাসআলা : চার

আপত্তি উত্থাপনকারী এ মাসআলাও পুরোপুরি লেখেননি। পূর্ণ মাসআলাটি এরকম :

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, ইমাম আযম রহ. বলতেন, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে হাত-পা বেঁধে হিংস্র প্রাণীর সামনে নিক্ষেপ করে এবং ঐ হিংস্র প্রাণী তাকে মেরে ফেলে তাহলে এ ব্যক্তির উপর কিসাস বা দিয়ত কোনটাই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মারপিট ও বন্দি করা যাবে। যতক্ষণ না সে তাওবা করে। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, এ কথার ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমি এটা বুঝি যে, এই ঘাতককে মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি করে রাখা হবে। মুহীতের মধ্যে মাসআলাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[৩৬]

আপত্তি উত্থাপনকারীর জন্য উচিত হল, এ মাসআলায় কুরআন দ্বারা কিসাস প্রমাণিত করা, তাহলে আমরা অবশ্যই মেনে নিব। হানাফিদের উপর অযথা আপত্তি উত্থাপন করা অনেক সহজ, কিন্তু দালিলিকভাবে কোনো কিছু প্রমাণ করা অনেক কঠিন।

---

৩৫. ফাতাওয়া আলমগিরী মুতারজাম : ৯/৩০০।
৩৬. ফাতাওয়া আলমগিরী উর্দু : ৯/৩০০।

মাসআলা নং (৫)

এ মাসআলাতেও আপত্তি করার মত বাক্য হচ্ছে ‘কিছু ওয়াজিব হবে না’। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারী এর অনুবাদ করেছে, ‘তার উপর কোনো শাস্তি প্রযোজ্য হবে না’ এ অনুবাদ ভুল। ‘কিছু ওয়াজিব হবে না’ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার উপর কিসাস বা দিয়ত ওয়াজিব হবে না। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার শাস্তিও দেওয়া হবে না। এমন জঘন্য আচরণকারীকে বিচারক নিজের মর্জি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় শাস্তি দিবে। আপত্তি উত্থাপনকারীর মতে যেহেতু এ সুরতে কিসাস ওয়াজিব, তাই তিনি পারলে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুরতে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার কথা কুরআন থেকে প্রমাণ করে দেখাক।

আপত্তি : দুই
যিনার শাস্তির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী (তালেবুর রহমান সাহেব) লেখেন,

ইসলাম ও ব্যভিচার (যিনা) এর শাস্তি

আল্লাহ্ তায়ালা যিনার শাস্তির ব্যাপারে ইরশাদ করেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

যিনাকার পুরুষ এবং যিনাকারিণী নারী উভয়কে একশ বেত্রাঘাত কর।[৩৭] উল্লেখ্য, এ শাস্তি হচ্ছে অবিবাহিতদের জন্য আর বিবাহিতদের শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

ফিকহে হানাফি ও ব্যভিচারের শাস্তি

কিন্তু হানাফিরা যিনার ব্যাপারে এভাবে ছাড় দিচ্ছে যে, হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

وإذا زنى الصبي أو المجنون بإمرأة طاوعته فلا حد عليه ولاعليها.[৩৮]

---

৩৭. সুরা নুর, আয়াত ২।

৩৮. هدايه أولين : ص ٤٩٨ ।

যদি কোনো মহিলার সাথে শিশু অথবা পাগল যিনা করে আর ঐ মহিলা এ ব্যাপারে রাজি থাকে তাহলে মহিলার উপর কোনো হদ আসবে না এবং ঐ শিশু ও পাগলের উপরও হদ আসবে না।[৩৯]

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর

আপত্তিকারী এই ইবারতের মাধ্যমে একথা প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, ফিকহে হানাফির মধ্যে যিনার শাস্তিই নেই। আমরা প্রথমে এ ভুল ধারণা দূর করতে চাই যে, ফিকহে হানাফিতে যিনার শাস্তি নেই।

(১) ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ কিতাব কুদুরিতে আছে, যখন সে এই সকল কথা বলে দিবে, তখন তার উপর হদ ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং যদি যিনাকারী বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর মারা হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।[৪০]

এরপর সাহেবে কুদুরি লেখেন, আর যদি মুহসিন (বিবাহিত) না হয় এবং স্বাধীন হয় তাহলে তার হদ হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত।

২. কানযুদ দাকাইকে আছে, অতএব যদি যিনাকারী মুহসিন হয় (অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকে) তাহলে তাকে খোলা ময়দানে পাথর মারা হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।[৪১]

এরপর সাহেবে কানয লেখেন, আর যদি যিনাকারী মুহসিন না হয় তাহলে তাকে একশ বেত্রাঘাত করা হবে।

৩. শরহে বেকায়ায় আছে, নতুবা হদ লাগানো হবে। এরপর ঐ যিনাকারী যদি মুহসিন হয় অর্থাৎ স্বাধীন, মুকাল্লাফ, মুসলমান ও সহিহভাবে কৃত বিবাহের পর সহবাস করেছে এমন হয় এবং যিনা করার সময় পুরুষ ও মহিলা দুজনই মুহসিন হয় তাহলে তাদের একটি মাঠের মধ্যে পাথর মারতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয়।

---

৩৯. ফিকহে হানাফি কি কুরআন ও হাদিসের নির্যাস : ২৭।

৪০. ইশরাকে নূরী তরজমায়ে উর্দু কুদুরি : কিতাবুল হুদুদ, পৃষ্ঠা ১৯৮।

৪১. আহসানুল মাসাইল উর্দু তরজমায়ে কানযুদ দাকাইক : কিতাবুল হুদূদ, পৃষ্ঠা ১৭৮।

আর যদি যিনাকারী মুহসিন না হয় তাহলে তার হদ হচ্ছে, স্বাধীন হলে একশটি বেত্রাঘাত করা হবে আর গোলাম হলে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত করা হবে। (নুরুল হিদায়া তরজমা উর্দু ও শরহে বেকায়া দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল হুদুদ)

৪. বেদায়ায় আছে, যখন হদ ওয়াজিব হয়ে গেল আর যিনাকারী হচ্ছে মুহসিন (বিবাহিত) তাহলে শাসক (বা বিচারক) তাকে পাথর মারার হুকুম দিবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়ে যায়।[৪২]

এরপর হিদায়াগ্রন্থকার আরো লেখেন, আর যদি ঐ যিনাকারী মুহসিন না হয় এবং স্বাধীন হয় তাহলে তার হদ হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত।[৪৩]

৫. দুররে মুখতারে আছে, আর মুহসিন যিনাকারীকে ময়দানে পাথর নিক্ষেপ করা হবে, যতক্ষণ না সে মরে যায়।[৪৪]

৬. আল ফিকহুল হানাফি ওয়া আদিল্লাতুহূ উর্দু এর মধ্যে আছে, যিনাকারী যদি মুহসিন হয় তাহলে তার শাস্তি এই যে, তাকে পাথর মারা হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। এর দলিল হচ্ছে মা'ইযে আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস।[৪৫]

৭. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে, যখন হদ ওয়াজিব হয়ে গেল আর যিনাকারী পুরুষ মুহসিন, তাহলে তাকে পাথর মারা হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।[৪৬]

আর যে মুহসিন নয় অর্থাৎ অবিবাহিত তার ব্যাপারে লিখেছেন, তার হদ হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত[৪৭]

---

৪২. هداية كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد وإقامته ।

৪৩. هداية كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد وإقامته ।

৪৪. দুররে মুখতার : ২/৪৬৫, কিতাবুল হুদূদ।

৪৫. আল ফিকহুল হানাফি ওয়া আদিল্লাতুহূ : ২/২৯০, ২৯১, ইদারায়ে ইসলামিয়াত, আনারকলি, লাহোর।

৪৬. ফাতওয়া আলমগীরিয়্যাহ অনুবাদ : ৩/২৫৮, কিতাবুল হুদূদ।

৪৭. ফাতাওয়া আলমগীরিয়্যাহ অনুবাদ : ৩/২৬০, কিতাবুল হুদূদ।

আমাদের হানাফি ওলামায়েকেরাম তো হদ, তাযির এবং বিশেষ করে হদ্দে রজম এর উপর অনেকগুলো স্বতন্ত্র কিতাবই লিখেছেন। আর ফিকহে হানাফির সে সকল কিতাব ও ফাতাওয়া সংকলন, যেগুলোর মধ্যে সব ধরনের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিতাবুল হুদুদ (শরয়ি দণ্ডবিধি অধ্যায়) নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। আপত্তি উত্থাপনকারী বেশি নয়, শুধু মাওলানা মুহাম্মদ মতিন হাশেমীর ইসলামি হুদুদ, ইসলামি হুদুদ আওর উন কা ফালসাফা, ইসলাম কা কানুনে শাহাদাত প্রথম খণ্ডের ফৌজদারী অংশ ইত্যাদি দেখে নিন। এতে এ বিষয়ে আপনার অনেক প্রশান্তি লাভ হবে।

আমরা এখানে সাতটি কিতাবের উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছি, যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফিকহে হানাফিতে যিনার শাস্তি বিদ্যমান রয়েছে আর এটাই সেই শাস্তি, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

বাকি রইল হিদায়ার মাসআলা, যা আপত্তি উত্থাপনকারী নকল করেছেন। তো এর জবাব হচ্ছে, নাবালেগ ও পাগলের উপর হদ্দ না আসার বিষয়টি তো স্পষ্ট। কারণ এরা উভয়ে মুকাল্লাফ নয়। এরপর বাকি রইল মহিলার কথা, তো তার উপর হদ না আসার কারণ এই যে, যিনা হচ্ছে পুরুষের কাজ আর মহিলা হচ্ছে এ কাজের ক্ষেত্র। এ কারণেই পুরুষকে সহবাসকারী ও যিনাকারী বলা হয় আর মহিলাকে সহবাসকৃত ও যিনাকৃত বলা হয়। অবশ্য রূপক অর্থে মহিলাকেও যিনাকারীনি বলা হয়ে থাকে।

যিনা ঐ ব্যক্তির কাজকে বলে, যাকে একাজ থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে এবং এ কাজ করলে গুনাহগার হয় থাকে। আর এ ব্যক্তি কেবল বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই হতে পারে, পাগল ও অপ্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে না। কারণ পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ককে শরিয়ত কোনো কিছুর আদেশও করেনি, নিষেধও করেনি। মহিলা যদিও যিনার কাজের ক্ষেত্র, কিন্তু তার উপর হদ তখনই আসবে যখন সে যিনা করার জন্য এমন ব্যক্তিকে সুযোগ দিবে, যাকে একাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং করলে সে গুনাহগার হবে। উল্লিখিত সুরতে মহিলা যে ছেলে বা পাগলকে যিনা করার সুযোগ দিয়েছে, সে বোধসম্পন্নও নয় এবং প্রাপ্তবয়স্কও নয়। এজন্য মহিলার উপর হদ আসবে না।

হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه وإنما هي محل الفعل ولهذا يمسى هو واطأ وزانيا والمرأة موطوءة ومزنيا بها إلا أنها سميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل كالراضية في معنى المرضية أو لكونها مسببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنا وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه ومؤثم على مباشرته وفعل الصبي ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد.[৪৮]

যদি এ বিশেষ সুরতে কুরআন কারিম পাথর নিক্ষেপে হত্যা বা একশ বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারিত করে থাকে তাহলে আপত্তি উত্থাপনকারী কুরআনের সে আয়াতটি পেশ করুক।

৪৮. الهداية : ١٠٤/٢ ।

আপত্তি : তিন

চুরির শাস্তির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলাম ও চুরির শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা চুরির শাস্তির ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

চোর পুরুষ ও নারী উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।[৪৯]

ফিকহে হানাফি ও চুরির শাস্তি

আর হানাফিরা চোরদের চুরি করার পদ্ধতি এভাবে বোঝাচ্ছে–

١. وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما.[৫০]

যদি চোর গর্ত খুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করে মাল চুরি করে, আর ঘরের বাইরে অবস্থিত তার সঙ্গী এ মালগুলো নেয় তাহলে তাদের উভয়ের হাত কাটা হবে না।

---

৪৯. সুরা মায়েদা, আয়াত ৩৮।

৫০. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৫২৬।

এমনিভাবে হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

٢. وكذلك إن حمله على حمار فساقه و أخرجه[৫১]

এমনিভাবে যদি চোর মালগুলো সব গুছিয়ে গাধায় উঠিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তার হাত কাটা যাবে না।

হিদায়াগ্রন্থকার আরো বলেন,

٣. ومن نقب البيت وأدخل يده فيه وأخذ شيئا لم يقطع.[৫২]

যে ব্যক্তি গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢুকবে বা বাইরে থেকে হাত দিয়ে কোনো জিনিস চুরি করবে, তার হাত কাটা যাবে না।[৫৩]

তৃতীয় আপত্তির জবাব

আমরা প্রথমে ফিকহে হানাফি থেকে চুরির শাস্তি নকল করব এবং এরপর এই বিশেষ সুরতগুলোর বিশ্লেষণ করব।

ফিকহে হানাফিতে চুরির শাস্তি

১. কুদুরিতে আছে, যদি কোনো বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো সংরক্ষিত স্থান থেকে দশ দেরহাম চুরি করে, চাই তা সরকারি মোহ অযুক্ত হোক বা না হোক, অথবা তা দশ দিরহাম মূল্যের কোনো জিনিস হোক, তাহলে তার হাত কাটা ওয়াজিব হবে।[৫৪]

২. কানযুদ দাকাইকে আছে, শরিয়তে চুরি বলা হয়, কোনো বোধসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দশ দিরহাম পরিমাণ (চাই তা দশ দিরহামই হোক বা এর চেয়ে বেশি দামের মাল হোক) জিনিস কোনো সংরক্ষিত জায়গা থেকে অথবা পাহারার মধ্যে থেকে গোপনে নিয়ে নেওয়া। অতএব যদি সে এভাবে নেওয়ার ব্যাপারে একবারও স্বীকারোক্তি দেয় অথবা দুইজন মানুষ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে।[৫৫]

---

৫১. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৫২৬।

৫২. হেদায়া আওয়ালাইনঃ পৃষ্ঠা ৫৬২।

৫৩. কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ২৭,২৮।

৫৪. ইশরাকে নূরী তরজমায়ে কুদূরী, كتاب السرقة، باب قطع الطريق : পৃষ্ঠা, ৩২০।

৫৫. আহসানুল মাসাইল উর্দু তরজমা কানযুদদাকাইক : কিতাবুস সারাকা, পৃষ্ঠা ১৮৬।

৩. শরহে বেকায়ায় আছে, চুরি বলা হয়, কোনো বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কারো মালিকানাধীন মাল, যা সরকারি মোহ্ অযুক্ত দশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশি মূল্যের হয়, এবং চুরির সংশয়মুক্ত সংরক্ষিত জায়গায় রাখা থাকে, গোপনে নিয়ে নেওয়া। অতএব যদি মুকাল্লাফ অর্থাৎ বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, যদিও সে গোলাম হয়, দশ দিরহাম বা এর বেশি মূল্যের মাল কোনো সংরক্ষিত স্থান যেমন– ঘর বা বাকস ইত্যাদি থেকে চুরি করে অথবা রাস্তায় পাহারায় থাকা কোনো স্থান থেকে চুরি করে অথবা মসজিদে কোনো ব্যক্তির নিজের আশে পাশে রাখা এ পরিমাণ সম্পদ চুরি করে, তাহলে ইমাম আযম ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে তার হাত কাটা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে, এব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি লাগবে (ইমাম আযম ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সে একবার স্বীকার করতে হবে আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সে দুইবার স্বীকার করতে হবে), অথবা দুই ব্যক্তি তার চুরির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে হবে এবং শাসক বা বিচারক সাক্ষ্যদাতাদের জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে, চুরি কাকে বলে, কখন চুরি করেছে, কোথায় করেছে, কী পরিমাণ মাল চুরি করেছে এবং কার মাল চুরি করেছে। সাক্ষীরা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।[৫৬]

৪. হিদায়ায় আছে, সাহেবে কুদুরি বলেছেন, যদি বোধসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দশ দিরহাম অথবা সরকারি মোহঅযুক্ত কোনো জিনিস, যা এর (দশ দেরহামের) সমমূল্যের হয়, সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে আর তার (চুরিকৃত জিনিসের) মধ্যে সংশয় না থাকে তাহলে তার (চোরের) হাত কাটা ওয়াজিব হবে। এতে আসল দলিল হল আল্লাহ তায়ালার বাণী, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ আর চোর পুরুষ ও চোর নারীর হাত কেটে দাও।[৫৭]

৫. আত-তাসহীলুয জরুরি লি মাসাইলিল কুদুরিতে আছে–

প্রশ্ন : পবিত্র শরিয়তে চোরের জন্য কী শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে?

জবাব : যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বোধসম্পন্ন ব্যক্তি, চাই সে স্বাধীন হোক বা গোলাম হোক, পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, দশ দেরহাম বা দশ দেরহামের

---

৫৬. শরহে বেকায়া উর্দু, কিতাবুস সারাকা।

৫৭. আশরাফুল হেদায়া উর্দূ তরজমা হেদায়া : ৬/৭৫৪, কিতাবুস সারাকা।

সমমূল্যের জিনিস এমন সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি করে, যেখানে চুরির সংশয় থাকে না তাহলে তার হাত কাটা হবে। ঐ সকল দিরহাম মোহ অযুক্ত হোক বা না হোক। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ (আর চোর পুরুষ ও চোর নারীর হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের কারণে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ)[৫৮]

৬. মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. লেখেন, চতুর্থ আয়াতে আবারও অপরাধের শাস্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসা হয়েছে এবং চুরির শরয়ি শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। শরয়ি শাস্তি তিন প্রকার, যা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে, চুরির শাস্তিও এ প্রকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কেননা কুরআন কারিম খোদ এ শাস্তি নির্ধারণ করেছে, শাসকদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়নি এবং একে আল্লাহর হক হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে। এজন্য একে চুরির হদ বলা হয়। আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ চোর পুরুষ ও চোর নারীর হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

দ্বিতীয় কথা হল, এখানে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, চুরি শব্দের আভিধানিক ও শরয়ি সংজ্ঞা কী?

কামুসে আছে, কোনো ব্যক্তি অন্যের মাল কোনো সংরক্ষিত জায়গা থেকে অনুমতি ছাড়া গোপনে নিয়ে নেওয়াকে চুরি বলে। এটাই চুরির শরয়ি সংজ্ঞা।[৫৯]

৭. মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদবী হানাফি লেখেন, এই সকল সকল শর্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে চুরিকারীকে سارق (চোর) এবং তার মালকে مسروق

---

৫৮. আল ফালাহুয যরুরী উর্দু তরজমা আত-তাসহীলুজ জরুরী : পৃষ্ঠা ৪০৭, চুরির বর্ণনা।

৫৯. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/১২৯,১৩০, সুরা মাইদা, আয়াত ৩৮।

(চুরিকৃত) বলে। কুরআনের হুকুম অনুযায়ী তার হাত কাটার হুকুম দেওয়া হবে। وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ অর্থাৎ চোর পুরুষ এবং চোর মহিলার (ডান) হাত কেটে দাও, এটা ঐ অপরাধের প্রতিদান যা তারা করেছে, এ শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৬০]

৮. মুফতি মুয়াবিয়া হানাফি লেখেন, চুরির হদের কথা কুরআন মাজিদে রয়েছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا.[٦١]

৯. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে আছে, এমনিভাবে যদি চোর আসে এবং সে এ পরিমাণ মাল চুরি করে, যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয় তাহলে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। (সে যুগে ঢালের মূল্য দশ দিরহাম ছিল) এর কম মূল্যের জিনিস চুরি করার ক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি নেই। (বরং তাকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া যেতে পারে)। এটাই ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. ও আমাদের ওলামায়েকেরামের মত।[৬২]

১০. ডাক্তার মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মুখতার হানাফি, সাবেক মুহতামিম জামেয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন করাচি, কিতাবুল আসার ইমাম মুহাম্মদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, যদি কোনো বোধসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির দশ দিরহাম বা এর সমমূল্যের মাল কোনো সংরক্ষিত জায়গা থেকে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়া ওঠায় তাহলে এর কারণে তার হাত কেটে দেওয়া হবে। চাই সে স্বাধীন মানুষ হোক অথবা গোলাম হোক। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ আর চোর পুরুষ ও চোর নারী উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের বদলায় আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ।[৬৩]

---

৬০. ইসলামী ফিকহ : ৩/৭৮, باب حد السرقة।

৬১. খুলাসায়ে মুসনাদে ইমাম আযম : পৃষ্ঠা ২২০।

৬২. موطا إمام محمد، كتاب الحدود والسرقة।

৬৩. كتاب الآثار، باب حد من قطع الطريق وسرق : ص ٤٦٦।

সম্মানিত পাঠক, আমরা হানাফি ফকিহগণের থেকে শুধু দশটি উদ্ধৃতি পেশ করেছি। এ বিষয়ে অগণিত উদ্ধৃতি পেশ করা যেতে পারে। আমাদের মতে তো যে ব্যক্তি কুরআনে চুরির শাস্তি থাকার স্বীকার করে না, সে মুসলমানই নয়।

এ পর্যন্ত তো এব্যাপারে কথা হয়েছে যে, ফিকহে হানাফিতে চুরির শাস্তি বিদ্যমান রয়েছে এবং ফিকহে হানাফিতে সে কথাই রয়েছে যা কুরআনে কারিমে রয়েছে। আপত্তি উত্থাপনকারী কুরআনের সাথে ফিকহে হানাফির বিরোধিতা প্রমাণ করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তা সফল হয়নি এবং আপত্তি উত্থাপনকারীর কথা শতভাগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তিনি বলেছেন, কুরআনে চুরির শাস্তির কথা আছে, কিন্তু ফিকহে হানাফিতে তা নেই।

হানাফিদের উপর আরেকটি অপবাদ

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, 'হানাফিরা চোরদের চুরি করার পদ্ধতি শেখায়।' এর উত্তরে আমরা এতটুকুই বলব যে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ[٦٤]

কোন হানাফি আলেম এমন কথা বলেননি। এখন রইল ঐ তিনটি বিশেষ সুরতের প্রসঙ্গ, যা আপত্তি উত্থাপনকারী হিদায়া থেকে নকল করেছেন, আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করার পূর্বে একটি উসুলী ও মৌলিক কথা আরয করছি, যাতে এ মাসআলাগুলো বুঝতে সহজ হয়।

একটি মৌলিক কথা

যে কেউ কারো মাল অবৈধভাবে নিয়ে নিলে শরিয়ত মতে এটা জরুরি নয় যে, তাকে সারেক (চোর) বলা হবে। উদাহরণত যে ব্যক্তি আমানতের খেয়ানত করেছে সেও অন্যের মাল অবৈধ পন্থায় নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু তাকে না চোর বলা হয় এবং না তার হাত কাটা হয়। অথচ তার এ কাজটা হারাম।

---

৬৪. মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আলে ইমরান : ৬১।

উদাহরণ দুই : যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে অন্যের মাল হস্তগত করেছে সেও অবৈধ পন্থায় অন্যের মাল হস্তগত করেছে, কিন্তু তার হাত কাটা হয় না, অথচ সুদ অকাট্য হারাম। এ ধরনেরই অনেক সুরত শরীয়তে রয়েছে যেগুলোর মধ্যে হাত কাটা হয় না, কিন্তু অন্য শাস্তি অবশ্যই দেওয়া হয়। এ ধরনের কিছু সুরত আমরা এখানে নকল করছি–

হাদিস নং ১ : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع.[৬৫]

অর্থাৎ, খেয়ানতকারী, লুটেরা এবং ছিনতাইকারীর উপর হাত কাটার বিধান নেই।

হাদিস নং ২ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গাছে থাকা ফল এবং পাহাড়ে চরে বেড়ায়, এমন প্রাণী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পাহাড়ী প্রাণীকে প্রাণীদের বাঁধার জায়গায় এনে বেঁধে রাখে অথবা ফল (শুকানোর পর) শস্য রাখার জায়গায় জমা করে তাহলে এগুলোর চুরির উপর হাত কাটা যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে, চুরিকৃত জিনিসের মূল্য ঢালের মূল্য পরিমাণ হতে হবে।[৬৬]

হাদিস নং ৩ : হযরত বুস্‌র ইবনে আরতাত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا تقطع الأيدي فى السفر সফরে হাত কাটা যাবে না।[৬৭]

হাদিস নং ৪ : জুনাদা ইবনে আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত, আমরা বুস্‌র ইবনে আরতাতের সাথে সামুদ্রিক সফরে ছিলাম। তার কাছে একজন চোর আসল, যার নাম ছিল মিসদার। সে একটি উট চুরি করেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

৬৫. مشكوة، باب قطع السرقة. ترمذي، كتاب الحدود : ص ١٨٧. ابو داود، كتاب السرقة : ٢٤٧/٢. ابن حبان، العلل : ٤٥٠/١ نسائي، سرقة : ٢٦١/٢. ابن ماجة : ٦٧/٢ ।

৬৬. مشكوة، باب قطع السرقة، فصل دوم. موطا امام محمد، كتاب الحدود في السرقة ।

৬৭. نسائي، باب القطع فى السفر ।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, সফরে হাত কাটা যাবে না। এ কারণে আমি তার হাত কাটছি না, নচেৎ অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।[৬৮]

হাদিস নং ৫ : বুস্‌র ইবনে আরতাত রা. বলেন, আমি নবি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে একথা শুনেছি যে, জিহাদে হাত কাটা যাবে না (অর্থাৎ চোরের)।[৬৯]

হাদিস নং ৬ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا قطع على المختفي অর্থাৎ, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না।[৭০]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার আসার

হযরত ইবনে রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ليس على النباش قطع (কাফন চোরের উপর হাত কাটার বিধান নেই)[৭১]

এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এ অপরাধের কোনো শাস্তিই নেই, বরং উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, এ অপরাধে তার হাত কাটা হবে না, অন্য যেকোনো শাস্তি তাকে দেওয়া যেতে পারে।

হাদিস নং ৭ : হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় নিম্নমানের জিনিস চুরি করার ক্ষেত্রে হাত কাটা হত না।[৭২]

হাদিস নং ৮ : আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার বলেন, হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে মুরগি চুরি করেছিল। হযরত উমর ইবনে আজিজ রহ. তার হাত কাটার ইচ্ছা করলেন। তখন সালামা ইবনে আবদুর রহমান তাঁকে বললেন, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, পাখি চুরি করার ক্ষেত্রে হাত কাটার বিধান নেই।[৭৩]

---

৬৮. أبو داود، باب السارق يسرق في الغزة أيقطع।

৬৯. ترمذي، باب ما جاء أن لايقطع الأيدي على المختفي।

৭০. নাসবুর রায়াহ : ৩/৩৬৭।

৭১. ফাতহুল কাদির শরহে হেদায়া : ৫/১৩৭।

৭২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা।

৭৩. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা।

হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর একথাটি মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকেও বর্ণিত আছে।

হাদিস নং ৯ : ইবনে আবু শায়বা আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদের একথা বর্ণনা করেছেন যে, আমি এমন কাউকে দেখিনি, পাখি চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছে।

হাদিস নং ১০ : ইমাম বায়হাকি আবুদ দারদার কথা বর্ণনা করে বলেছেন, কবুতর চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটার বিধান নেই।

একথা বর্ণনা করার পর ইমাম বায়হাকি নিজেই বলেছেন, আবুদ দারদার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ কবুতর, যা কারো কাছে সংরক্ষিত নয়।[৭৪]

এসকল আসার থেকে বুঝা যায়, পাখি চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটা যাবে না। আর সাহাবিগণের কেউ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ মতের বিরোধিতা করেননি।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখা চাই যে, এ অপরাধ অবশ্যই শাস্তি ও ভর্ৎসনার উপযুক্ত। এজন্য শাসক বা বিচারক তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো শাস্তি দিতে পারে।

হাদিস নং ১১ : আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফল ও খেজুরের খোসা চুরির কারণে হাত কাটা যাবে না।[৭৫]

হাদিস নং ১২ : হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একজন গোলাম যে নিজেই খুমুসের মালের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে খুমুসের মাল থেকে চুরি করল। এ ঘটনা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করা হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গোলামও আল্লাহর এবং সে চুরিও করেছে আল্লাহর মাল থেকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটলেন না।[৭৬]

---

৭৪. সুনানে কুবরা বাইহাকি : কিতাবুল হুদূদ, নাসবুর রায়াহ : কিতাবুল হুদূদ : ৩/৩৬০।

৭৫. ابن ماجة، باب يقطع في ثمر ولا كثر।

৭৬. ইবনে মাজাহ, باب العبد يسرق ।

হাদিস নং ১৩ : হাসান বসরি থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি খাবার চুরির অপরাধে হাত কাটব না।[৭৭]

হাদিস নং ১৪ : হাসান বসরি থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হল, যে খাবার চুরি করেছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটলেন না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা ও মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে এ শব্দগুলোও রয়েছে যে, সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, এর দ্বারা ঐ খাবার উদ্দেশ্য, যা সেদিনই নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– সারিদ ও গোশত ইত্যাদি।

যেহেতু গন্দম চুরি করলে হাত কাটার বিষয়ে সকলের ইজমা রয়েছে, তাই এ সকল হাদিসে বর্ণিত খাবারের দ্বারা ঐ সকল খাবার উদ্দেশ্য নেওয়া হবে, যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আর এ ব্যাখ্যা খোদ হাদিসের মধ্যেই সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস নং ১৫ : মারুফ ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত আছে, আফ্রিকায় লোকেরা অন্যদের গোলাম চুরি করত। তখন আলি ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাদের হাত কাটা হবে না। এটা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ ছিল এবং তিনি তাদের হাত কাটার পক্ষে ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন, এরা হচ্ছে খাল্লাব (অর্থাৎ নরম ও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে প্রতারণাকারী)।[৭৮]

ব্যাখ্যা

অর্থাৎ বড় ও বুদ্ধিমান গোলামকে চুরি করা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে চুরি নয়, বরং এটা হচ্ছে প্রতারণা এবং ছিনতাই। আর এর কারণ খোদ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে দিয়েছেন। এজন্য যখন শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে চুরি পাওয়া যায়নি তখন চুরির হদও প্রযোজ্য হবে না।

অবশ্য ছোট গোলাম, যে এখনো নিজেকে নিজে বুঝতে পারেনি, তাকে চুরি করলে এটা সারাকা বা শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে চুরি হবে। কারণ এতে

---

৭৭. মারাসীলে আবু দাউদ।

৭৮. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা।

শরীয়তের সংজ্ঞায়িত চুরি পাওয়া যাবে। আর মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বার অন্য হাদিসটি, যাতে রয়েছে যে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এমন এক চোরকে আনা হল, যে গোলাম চুরি করেছিল, তখন তিনি এ চোরের হাত কাটার হুকুম দিয়েছিলেন।

হাদিস নং ১৬ : কাসেম থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বাইতুল মাল থেকে চুরি করল। তখন এ ব্যাপারে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখে পাঠালেন যে, এক ব্যক্তি বাইতুল মাল থেকে চুরি করেছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু (জবাব) লিখলেন, তার হাত কাটা যাবে না, কারণ বাইতুল মালে প্রত্যেক ব্যক্তিরই হক রয়েছে।[৭৯]

হাদিস নং ১৭ : শাবি থেকে বর্ণিত, হযরত আলি রা. বলতেন, বাইতুল মাল থেকে যে চুরি করে তার উপর হাত কাটার বিধান নেই।[৮০]

হাদিস নং ১৮ : সাইব ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাযরামী তার গোলামকে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, আমার এ গোলামের হাত কাটার হুকুম দিন। কেননা সে চুরি করেছে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, সে কী চুরি করেছে? তিনি বললেন, আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে, যার মূল্য ষাট দিরহাম। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার হাত কাটা যাবে না। কারণ তোমার খাদেম তোমারই মাল চুরি করেছে।[৮১]

হাদিস নং ১৯ : জুবাইর ইবনে নুফাইর থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গোসলখানা থেকে কোনো কিছু চুরিকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বললেন, তার হাত কাটা যাবে না।[৮২]

---

৭৯. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা।

৮০. তালখীসুল হাবীর : ২/৩৫৭।

৮১. موطا امام مالك باب ما لا قطع يد، موطا امام محمد كتاب الحدود في السرقة ।

৮২. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা।

হাদিস নং ২০ : আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, দুর্ভিক্ষের সময় চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।[৮৩]

হাদিস নং ২১ : হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক দিনার অথবা দশ দিরহাম চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না।[৮৪]

সম্মানিত পাঠক, আমরা এখানে শুধু একুশটি হাদিস ও আসার নকল করেছি, যেগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ বিশেষ সুরতে শাস্তি দেওয়া হয়নি। তবে এ কাজ নিশ্চিত অপরাধ, তাই তাদের হাত কাটা ছাড়া অন্য কোনো শাস্তি অবশ্যই দেওয়া হবে। মুনকিরিনে হাদিস তথা হাদিস অস্বীকারকারী দল এ সকল রেওয়ায়েতের প্রতি লক্ষ করে বলে, হাদিস হচ্ছে কুরআনের বিরোধিতাকারী। ঠিক তেমনিভাবে আপত্তি উত্থাপনকারী ফিকহে হানাফির বিশেষ একটি সুরত উল্লেখ করে বলে দিল যে, ফিকহে হানাফি কুরআন বিরোধী।

আপনারা দেখেছেন, ফিকহে হানাফিতে কুরআন মোতাবেক চোরের শাস্তির কথা রয়েছে এবং কিছু বিশেষ সুরহে হাদিস ও আসারে হাত কাটার হুকুম দেওয়া হয়নি। এ দলিলগুলোর ভিত্তিতেই ফিকহে হানাফিতেও বিশেষ কিছু সুরতে হাত কাটার হুকুম দেওয়া হয় না। আপত্তি উত্থাপনকারী হিদায়া থেকে যে তিনটি সুরত নকল করেছেন, এগুলোর কোনোটিতে তিনি কাটছাট করেছেন এবং কোনোটিতে তিনি ভুল অনুবাদ করেছেন। লক্ষ করুন–

মাসআলা নং ১ : এটি তিনি পরিপূর্ণভাবে নকল করেননি। পরিপূর্ণ এবারতের অনুবাদ এরকম : যদি চোর কোনো ঘরের সিঁদ কাটে এবং এরপর ভিতরে ঢুকে মাল হাতে নেয়, এরপর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য (চোর) ব্যক্তির হাতে মাল দিয়ে দেয় তাহলে এদের কারো হাত কাটা যাবে না।

এ ইবারতের পরের ইবারত ছিল এই, এই সুরতে প্রথম চোর কর্তৃক মাল ঘর থেকে বের করে আনা পাওয়া যায়নি। কারণ মাল ঘরের বাইরে বের করার পূর্ব পর্যন্ত এটা মূল মালিকের কবজায় আছে বলে গণ্য হয়। আর

৮৩. তারীখে বাগদাদ জামে সগীরের সূত্রে : ২/১৭৬।

৮৪. মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৯/৪৭৪, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১০/২৩৩।

বাইরে যে ছিল, সে মালিকের সংরক্ষণের জায়গায় প্রবেশ করে মালিকের সংরক্ষণকে নষ্ট করেনি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এদের কারো থেকেই পূর্ণাঙ্গ চুরি পাওয়া যায়নি।

আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি ভিতরে প্রবেশকারী নিজের হাত বের করে বাইরের ব্যক্তিকে দেয় তাহলে ভিতরে প্রবেশকারীর হাত কাটা হবে।[৮৫]

মাসআলা নং ২ : তিনি এর অনুবাদ ভুল করেছেন। বিশুদ্ধ অনুবাদ হল, সাহেবে কুদুরি বলেছেন, এবং এভাবে সে ঐ মালকে গাধায় উঠিয়ে গাধাকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল আর ঐ মালকে বাইরে নিয়ে আসল তাহলে হাত কাটা ওয়াজিব। কেননা গাধা চলার দায় ঐ চোরের উপরই বর্তায়। এটাই চুরির কারণ।[৮৬]

সাইয়েদ আমির আলি গায়রে মুকাল্লিদ সাহেবে আইনুল হিদায়া এভাবে অনুবাদ করেছেন, এবং এভাবে যদি মালপত্র একটি গাধায় উঠিয়ে এটিকে হাঁকিয়ে নেয় এবং বাইরে নিয়ে আসে তাহলে হাত কাটা ওয়াজিব হবে। কেননা গাধার চলাটা তার উপরই বর্তাবে, কারণ সেই গাধাকে হাঁকিয়েছে।[৮৭]

সম্মানিত পাঠক, আপনারা দেখেছেন যে, হিদায়ায় লেখা আছে, হাত কাটা ওয়াজিব। অথচ আপত্তি উত্থাপনকারী ভুল অনুবাদ করে লিখছেন যে, হাত কাটবে না।

এখানে দুটি বিষয় হতে পারে, হয়তো তিনি জেনে বুঝে ভুল অনুবাদ করেছেন অথবা তার অনুবাদের যোগ্যতা নেই। যদি প্রথম বিষয় হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছে এ কাজের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। আর যদি দ্বিতীয় বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে এবার চিন্তা করুন, যে লোকের হিদায়ার ইবারত বুঝার যোগ্যতা নেই, সে আসে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উপর আপত্তি তুলতে যে, তিনি কুরআনের খেলাফ করতেন।

---

৮৫. هداية كتاب السرقة، فصل فى الحرز والأخذ منه ।

৮৬. আশরাফুল হেদায়া, তরজমায়ে হেদায়া, কিতাবুস সারাকা, كتاب السرقة، فصل فى الحرز والأخذ منه ٨٦٦/٦ ।

৮৭. আইনুল হেদায়া :২/৫৯৯, কিতাবুস সারাকা।

خدا کی قدرت دیکھئے کلچڑی گنجی

حضور بلبل نوا کرے ہے نغمہ سنجی

মাসআলা নং ৩ : এ মাসআলাও তিনি পরিপূর্ণভাবে নকল করেননি। হিদায়ার পূর্ণ ইবারত লক্ষ করুন–

‘আর যে ব্যক্তি ঘর ছিদ্র করল এবং এতে হাত ঢুকিয়ে কোনো জিনিস নিয়ে নিল তাহলে তার হাত কাটা হবে না। আর ইমলা (আমালী আবু ইউসুফ উদ্দেশ্য) এর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তার হাত কাটা হবে।’[৮৮]

সাইয়িদ আমির আলি গায়রে মুকাল্লিদ এভাবে অনুবাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কক্ষ ছিদ্র করে হাত ঢুকিয়ে মাল নিল তার হাত কাটা যাবে না। আর আবু ইউসুফ রহ. থেকে ইমলার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে যে, তার হাত কাটা হবে।[৮৯]

আমরা তিনটি মাসআলাই স্পষ্ট করে দিয়েছি। এখন আপত্তি উত্থাপনকারী এ বিশেষ সুরতগুলোর হুকুম কুরআন দ্বারা প্রমাণ করুক যে, তাদের হাত অবশ্যই কাটতে হবে।

---

৮৮. আশরাফুল হেদায়া : ৬/৮৭০।

৮৯. আইনুল হেদায়া, দ্বিতীয় খণ্ড, কিতাবুস সারাকাহ।

আপত্তি : চার

মদ পানের শাস্তির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

আল্লাহ তায়ালা এভাবে মদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ.... فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানি কাজের থেকে এবং অপবিত্র। এরপর বলেছেন, তোমরা কী মদপান থেকে বিরত থাকবে?[৯০]

নবি আলাইহিস সালাম বলেছেন, শেষ যামানায় লোকেরা মদ পান করবে, কিন্তু এর নাম রাখবে ভিন্ন।

ফিকহে হানাফি ও মদ পানের শাস্তি

এখন হানাফিরা এভাবে মদ পানের অনুমতি দেয়–

১. أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والذرة حلال عند أبي حنيفة ولا يحد شاربه عندة وإن سكر منه.

---

৯০. সুরা মায়েদা, আয়াত ৯০, ৯১।

যে মদ গন্দম, জব, মধু এবং ভুট্টা থেকে বানানো হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা হালাল। এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এর পানকারীকে হদ লাগানো যাবে না, চাই এতে পানকারীর নেশা এসে যাক।[৯১]

২. হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد

এমনিভাবে খেজুর ও কিশমিশের নাবিযকে পাকানোর পরে যদি এগুলোর মধ্যে নেশাও সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলেও ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে তা হালাল।[৯২]

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবে প্রচলিত মদের উল্লেখ করত মদের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন,

قَامَ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ "

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি নাযিল হল আর এটা পাঁচ জিনিস দ্বারা বানানো হয়; আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গন্দম এবং জব। আর মদ হচ্ছে তা, যা বুদ্ধি লোপ করে দেয়।[৯৩]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ، كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'বিত'-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, (যা মধু থেকে তৈরি মদ) তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক ঐ পানীয়, যাতে নেশা সৃষ্টি হয়, হারাম।[৯৪]

---

৯১. হেদায়া আখেরাইন : পৃষ্ঠা ৪৯৩।

৯২. হেদায়া আখেরাইন : পৃষ্ঠা৪৯৩।

৯৩. বুখারী : হাদিস নং ৫৫৮১।

৯৪. বুখারী, হাদিস নং ৫৫৮৫, কিয়া ফিকহে হানাফিয়াহ কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ২৮/২৯।

চতুর্থ আপত্তির জবাব

আমরা প্রথমে ফিকহে হানাফির মদের বিধান নকল করব, এরপর হিদায়ার ইবারতের বিশ্লেষণ করব।

ফিকহে হানাফিতে খামার (মদ) এর হুকুম

১. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানি হানাফি লেখেন, أَشْرِبَة شَرَاب -এর বহুবচন। شَرَاب প্রত্যেক প্রবাহিত জিনিসকে বলে, যা পান করা যেতে পারে, চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় شَرَاب ঐ সকল পানীয়কে বলা হয়, যা নেশা সৃষ্টি করে।

والشراب لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ما يسكر.[৯৫]

যে সকল পানীয় শরয়িভাবে হারাম তা চার ধরনের–

১. **মদ :** মদের দ্বারা উদ্দেশ্য আঙ্গুরের কাঁচা রস, যাতে তেজ এসে যায় এবং ফেনা উঠতে থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে সকল পানীয় হারাম হওয়ার জন্য কেবল তেজ সৃষ্টি হওয়াই যথেষ্ট, ফেনা ওঠা জরুরি নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ফেনা ওঠাও জরুরি। মদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে আহনাফের কেউ কেউ সতর্কতামূলক সাহেবাইনের মতের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন।

وقيل يؤخذ في حرمة الشراب بمجرد الاشتداد احتياطا.[৯৬]

এটা ছাড়া যে সকল পানীয়ের ক্ষেত্রে মদ শব্দ ব্যবহার করা হয় তা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৯৭]

মদের বিধান

মদের সাথে নিম্নোক্ত বিধানগুলোর সম্পর্ক রয়েছে–

১. হারাম পানীয়সমূহের মধ্যে এটাকেই (উপরে যেটার বিবরণ দেওয়া হয়েছে) 'মদ' বলা হবে। এরপর যেহেতু মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি

---

৯৫. দুররে মুখতার : ৫/২৮৮।

৯৬. হেদায়া : ৪/৪৭৭।

৯৭. রদ্দুল মুহতার : ৫/২৮৮।

কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে এসেছে, তাই যদি কোনো ব্যক্তি এর হারাম হওয়াকে অস্বীকার করে এবং একে হালাল মনে করে তাহলে তাকে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطعي

২. মদ তার সত্তাগতভাবেই হারাম, চাই এর কারণে নেশা সৃষ্টি হোক বা না হোক। এজন্য এর বেশি ও কম পরিমাণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না।

إن عينها حرام غير معلول بالسكر و لا موقوف عليه.

৩. মদ পেশাবের মতই নাজাসাতে গালিযা।

إنها نجسة نجاسة غليظة كالبول.

৪. মুসলমানের অধিকারে এটি মূল্যহীন থাকবে, এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি একে নষ্ট করে দেয় বা ছিনতাই করে তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها.

৫. এর দ্বারা যেকোনোভাবে উপকৃত হওয়া উদাহরণত প্রাণীকে পান করানো, এর দ্বারা জমিন ভেজানো, শরীরের উপরিভাগে ব্যবহার করা এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ওষুধ ও চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যও ব্যবহার করা নাজায়েয।

وحرم الانتفاع بها ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي، أو دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك

৬. এটা পান করলে সর্বাবস্থায় হদ আবশ্যক হবে, চাই নেশার অবস্থা সৃষ্টি হোক বা না হোক। يحد شاربها وإن لم يسكر منها

৭. মদ হয়ে যাওয়ার পর যদি একে পাকায়, যার ফলে এর নেশা দূর হয়ে যায়, তবু এটা হারাম থেকে যাবে। অবশ্য এ অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত এটা নেশা সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এর পানকারীর উপর হদ আবশ্যক হবে না।

৮. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এর সিরকা বানানো জায়েয হবে।[৯৮]

২. মুনাসসাফ ও বাযেক : আঙ্গুরের রসকে এ পরিমাণ পাকানো যে, এর অর্ধেক বা অর্ধেকের চেয়ে বেশি এবং দুই তৃতীয়াংশের কম জ্বলে যায় আর অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি রয়ে যায়, তাহলে এটাও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তেজ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া এবং ফেনা ওঠার সুরতে আর সাহেবাইনের নিকট শুধু তেজ সৃষ্টি হওয়ার সুরতে হারাম হয়ে যায়। যদি পাকানোর পরে অর্ধেক পরিমাণ বাকি থাকে তাহলে একে 'মুনাসসাফ' আর এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি বাকি থাকলে একে 'বাযেক' বলে। ইমাম আওযায়ী রহ. এর মতে এ উভয় প্রকার পানীয় হালাল।

৩. সাকার : খেজুর থেকে আহরিত কাঁচা পানীয়কে 'সাকার' এবং 'নাকিউত তামার' বলে। এটাও হারাম। فهو حرام مكروه

তবে শরিক ইবনে আবদুল্লাহর মতে এটা হালাল।

৪. নাকিয়ে যাবিব : কিশমিশ থেকে আহরিত কাঁচা পানীয়, যার মধ্যে তেজ এবং ফেনা সৃষ্টি হয়ে যায়। ইমাম আওযায়ী রহ. একে হালাল বলেছেন।

হুকুম : এ তিন ধরনের পানীয় এবং মদের বিধানের ক্ষেত্রে ফুকাহায়েকেরাম পার্থক্য করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, হানাফিগণের মতে এগুলো মদের চেয়ে কম পর্যায়ের হারাম। যে সকল বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ–

১. এ সকল পানীয় হারাম হওয়াকে কেউ অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা যাবে না। এর কারণ হচ্ছে, যেমনটি উল্লিখিত হয়েছে যে, এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত নন। যার ফলে এগুলো আর অকাট্য হারাম থাকেনি, বরং এগুলোর মাসআলা একটা ইজতিহাদি মাসআলার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية.

২. এ সকল পানীয় নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে আহনাফের ঐক্যমত রয়েছে। তবে কোনো কোন হযরতের মতে এগুলোও নাজাসাতে গালিযাহ,

---

৯৮. হেদায়া : ৪/৪৭৮, শামি : ৪/২৮৮,২৮৯।

আর কারো কারো মতে নাজাসাতে খাফিফাহ। সারাখসী এবং সাহেবে নাহর এগুলোর নাজাসাতে খাফিফাহ হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩. ইমাম আবু হানিফা ও কাযি আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এগুলো ঐ পরিমাণ হলে হারাম হবে, যতটুকুতে নেশা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাই যদি এতটুকু পান করে, যতটুকুতে নেশা সৃষ্টি হয় না তাহলে মদ পানের হদ আবশ্যক হবে না।

لا يجب الحد بشربها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر.

৪. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ সকল পানীয় মূল্যবান হবে। তাই এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় করা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে সহিহ হবে এবং এগুলোকে নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য এই জরিমানা ঐ পানীয়গুলোর আকৃতিতে আদায় করা যাবে না, বরং এগুলোর মূল্য আদায় করতে হবে। কাযি আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে এ সকল পানীয়ও মূল্যহীন।

৫. এগুলো দিয়ে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া জায়েয হবে না।[৯৯]

হালাল পানীয়

এমনিভাবে যে সকল পানীয় হালাল, তা চার ধরনের, চাই এগুলোর মধ্যে তেজ সৃষ্টি হয়ে যাক না কেন–

১. খেজুর ও কিশমিশের নাবিয, যা সামান্য পাক করা হবে। إن طبخ أدنى طبخة

২. খেজুর ও কিশমিশের মিশ্রিত নাবিয, যা সামান্য পাক করা হবে।

৩. মধু, গম ইত্যাদির নাবিয, চাই পাকানো হোক বা না হোক।

৪. মুসাল্লাসে ইনাবী অর্থাৎ আঙ্গুরের রসকে এ পরিমাণ পাক করা যে, এর দুই তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু এসব পানীয় হালাল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে–

---

৯৯. আল হেদায়া : ৪/৪৭৭, ৪৭৮, শামি : ৫/২৮৮,২৮৯।

প্রথম শর্ত হচ্ছে, এ পানীয়গুলো পান করার উদ্দেশ্য আমোদ-ফুর্তি না হতে হবে, বরং শক্তি অর্জন করা উদ্দেশ্য হতে হবে, যাতে নামায, রোযা এবং জিহাদে স্বচ্ছন্দ্যবোধ হয় অথবা কোনো অসুস্থতার ক্ষেত্রে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

التقوى فى الليالى فى القيام فى الأيام على الصيام والقتال لأعداء الإسلام أو التداوي لدفع الآلام.

যদি আমোদ-ফুর্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এগুলো পান করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, এ পানীয় এ পরিমাণে পান করতে পারবে না যে, এর দ্বারা নেশা সৃষ্টি হয়ে যায়। ما لم يسكر। যদি প্রবল ধারণা হয় যে, তা পান করলে নেশা ধরে যাবে, তাহলে পান করা জায়েয হবে না।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ মাসআলায় শাইখাইনের সাথে ইখতেলাফ করেছেন। তার মতে এ সকল পানীয়ের মধ্যে যদি তেজ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এগুলোও হারাম হয়ে যাবে; চাই পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায় এগুলো হারাম হবে। এ অবস্থায় কেউ এগুলো পান করলে তার উপর হদ কার্যকর করা হবে। পান করে যদি কেউ নেশা অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এছাড়া এ অবস্থায় এ সকল পানীয় নাপাক বলে গণ্য হবে। এই একই মত আইম্মায়ে সালাসাও দিয়েছেন এবং এর উপরই পরবর্তীকালের হানাফি ফকিহগণ ফাতওয়া দিয়েছেন।[১০০]

আমরা এ পর্যন্ত মদ সম্পর্কে হানাফি মাযহাবের বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছি। যার দ্বারা এটা জানা হয়ে যায় যে, হানাফি মাযহাবে মদ হারাম। এখন হিদায়ার এবারতের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

হিদায়ার প্রথম এবারতের বিশ্লেষণ

আল্লামা আবুল হাসান মারগিনানী হিদায়াগ্রন্থকার এ জায়গায় ইমাম মুহাম্মদের জামে সগিরের ইবারতের ব্যাপারে সংশয়ে পতিত হয়েছেন।

---

১০০. রদ্দুল মুহতার : ৫/২৯২,২৯৩, কামূসুল ফিকহ থেকে সংগৃহীত : ৩৩৯-৩৪৩।

আপত্তি উত্থাপনকারী হিদায়ার পূর্ণ ইবারত বর্ণনা করেননি। যদি পূর্ণ ইবারত বর্ণনা করতেন তাহলে বুঝে এসে যেত যে, মূল কথা হচ্ছে জামে' সাগিরের। হিদায়ার পর অধিকাংশ মুসান্নিফ হিদায়াগ্রন্থকারের উপর নির্ভর করত নিজ নিজ কিতাবে এ মাসআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। হিদায়ার পূর্ণ ইবারত লক্ষ্য করুন– আল্লামা আবুল হাসান মারগিনানী রহ. লেখেন,

وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به" قالوا: هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره، وهو نص على أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة، ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه، ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم."[১০১]

ইমাম মুহাম্মদ রহ. জামে সগীরে বলেছেন, এই চার ধরনের পানীয় ব্যতীত আর সকল নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় পান করাতে কোনো সমস্যা নেই। (এ কথার বিশ্লেষণ করত) ফুকাহায়েকেরাম বলেছেন, এ কিতাবে যেমন ঢালাওভাবে হুকুম দিয়ে দেওয়া হয়েছে, (ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর) আর কোনো কিতাবে এমন ঢালাও হুকুম দেওয়া হয়নি। আর এ ইবারতের মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, যে পানীয় গন্দম, জব, মধু এবং ভুট্টা থেকে বানানো হয় তা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে হালাল এবং এর পানকারীর উপর হদ আবশ্যক হবে না, চাই তার নেশা ধরে যাক, এবং এ নেশায় তালাকও পতিত হবে না, যেমনিভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হয় না।

আমাদের তাহকিক হচ্ছে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. জামে সগিরে যে এ কথা লিখেছেন,"وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به" অর্থাৎ এ চার ধরনের পানীয় ছাড়া..., এ কথার দ্বারা ঐ রকম ঢালাও হুকুম উদ্দেশ্য নয়, যেমনটা এ এবারতের মর্ম বর্ণনাকারীগণ ভেবেছেন যে, এগুলো ছাড়া অন্য সকল পানীয়, চাই তা নেশা সৃষ্টিকারীই হোক না কেন, হালাল হবে। বরং এ ইবারতে ما سوى অর্থাৎ 'এগুলো ছাড়া' কথাটির দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সকল

১০১. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৪৯৫, ৪৯৬।

পানীয়, যেগুলো নেশা সৃষ্টিকারী নয়। কেননা ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নাবিয এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম। এসব পান করলে হদ আবশ্যক হয় এবং যদি সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তালাক হয়ে যায়।

খোদ ইমাম মুহাম্মদ রহ. লিখেছেন যে, ইমাম আযম রহ. এর মত এটাই। যেমনটি আমরা ইনশাআল্লাহ সামনেই কিতাবুল আসারের সূত্রে নকল করব। এজন্য জামে সগিরের এ এবারতের দ্বারা ঐ ধরনের ঢালাও হুকুম উদ্দেশ্য নয়, যেমনটা এর মর্ম বর্ণনাকারী ও বিশ্লেষণকারীরা বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ব্যাপারটি থেকে দায়মুক্ত যে, তিনি এ চার ধরনের পানীয় ছাড়া অন্য সকল নেশা সৃষ্টিকারী পানীয়কে হালাল বলেছেন, এগুলো পানকারী উপর হদ আবশ্যক করেননি এবং তার তালাক পতিত না হওয়ার কথা বলেছেন। এখন আমরা প্রচুর পরিমাণ উদ্ধৃতিসহকারে এ বিষয়ে ইমাম আযম রহ. এর অবস্থান তুলে ধরব–

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফি লেখেন,

فالنبيذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه في قولهم ما دام حلوا وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد، عن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل شربه للتداوي والتقوي إلا المعدي السكر.[১০২]

খেজুরের পানিকে যদি হালকা জোশ দেওয়া হয় তাহলে এটা নাবিয হবে। ফুকাহায়ে আহনাফের মত অনুযায়ী এটা পান করা জায়েয হবে, যতক্ষণ এটা মিষ্টি থাকবে। আর যখন এটা গাঢ় হয়ে যাবে এবং ফেনা ছেড়ে দিবে তখন ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ. এর মতে এটা ওষুধ হিসাবে এবং শক্তির জন্য পান করা জায়েয হবে। তবে যদি এটা নেশা সৃষ্টি করার পর্যায়ে চলে যায় তাহলে এটা আর পান করা জায়েয হবে না।

নাবিয এ চার ধরনের পানীয়র বাইরে এবং এই ইবারতের মধ্যে এটা স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, যখন তা নেশাসৃষ্টিকারী হবে তখন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর নিকট তা পান করা জায়েয হবে না।

---

১০২. বেনায়া শরহে হেদায়া : ২/৭০৪,৭০৫।

২. আল্লামা ইবনে হুমাম লেখেন,

ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سئلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته هل يقع؟ قالا: إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع [১০৩]

আবদুল আজিজ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরী রহ. এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি ভাং এর নেশায় নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে তার তালাক কী পতিত হয়ে যাবে? ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান রহ. বলেছিলেন, যদি ভাং পান করার সময় সে জেনে বুঝে পান করে তাহলে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

ভাংও এ চারটি পানীয়ের বাইরে এবং এই ইবারতের মধ্যে স্পষ্টভাবে রয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে ভাং এর নেশা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি লেখেন,

نرى الحد على السكران من نبيذ كان أو غيره ثمانين جلدة بالسوط إلى قوله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى [১০৪]

যে ব্যক্তি নাবিয বা অন্য কোনো পানীয়ের কারণে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাবে, আমাদের মতে তাকে আশিটি বেত্রাঘাতের হদ লাগানো হবে। আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত।

এই ইবারতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে পানীয় দ্বারাই নেশা হোক, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশিটি বেত্রাঘাতের হদ লাগানো হবে।

৪. শামসুল আইম্মা সারাখসী হানাফি লেখেন,

ان السكر من النبيذ موجب للحد كشرب الخمر. [১০৫]

---

১০৩. ফাতহুল কাদীর শরহে হেদায়া : ৫/৮২।

১০৪. কিতাবুল আসার : ১৩৭।

নাবিয থেকে নেশাগ্রস্ত হলে ঠিক তেমনি হদ লাগানো ওয়াজিব, যেমন হদ লাগানো ওয়াজিব মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হলে।

৫. আল্লামা আবুল হাসান মারগিনানী হানাফি লেখেন,

ومن سكر من النبيذ حد.[١٠٦]

যে ব্যক্তি নাবিয খেয়ে নেশাগ্রস্ত হবে তাকে হদ লাগানো হবে।

৬. আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি হানাফি লেখেন,

أي شراب كان غير الخمر إذا شربه لا يحد إلا إذا سكر به.[١٠٧]

মদ ব্যতীত যে পানীয়ই পান করুক, হদ আবশ্যক হবে না। তবে যদি এর কারণে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে হদ আবশ্যক হবে।

৭. আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী লেখেন,

أو سكر من نبيذ حد

নাবিযের কারণে নেশা হয়ে গেলে হদ লাগানো হবে।[১০৮]

৮. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে,

من سكر من النبيذ حد

যে ব্যক্তি নাবিয খেয়ে নেশাগ্রস্ত হবে তাকে হদ লাগানো হবে।

মাবসুতে সারাখসী, হিদায়া, দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার এবং আলমগিরী থেকে আমরা এ ব্যাপারে উদ্ধৃতি পেশ করলাম যে, কোনো ব্যক্তি যদি নাবিয বা মদ ছাড়া অন্য কোনো পানীয়ের কারণেও নেশাগ্রস্ত হয়, তাহলে তার উপর হদ আবশ্যক হবে। এ সকল উদ্ধৃতির মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হল যে, ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর মতে প্রত্যেক ঐ পানীয় হারাম, যাতে নেশা সৃষ্টি হয় এবং এমন পানীয় পান করলে হদ আবশ্যক হবে।

---

১০৫. আল মাবসুত সারাখসী : ২৪/২৯, বৈরূত থেকে মুদ্রিত।

১০৬. হেদায়া আওয়ালাইন : ৫০৬।

১০৭. রদ্দুল মুহতার : ৩/২২৫।

১০৮. দুররে মুখতার : ৩/২২৫।

এবং যদি এ নেশা অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাব এবং তার মতামত বর্ণনাকারী হচ্ছেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানি রহ.। তিনি কোথাও একথা লেখেননি যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এ চার ধরনের পানীয় ব্যতীত আর সকল নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হালাল এবং সেগুলো পান করলে হদ আবশ্যক হবে না, বরং তিনি এ কথা লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি নাবিয বা অন্য কোনো জিনিস পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তার উপর হদ আবশ্যক হবে আর এটাই ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত। এর বিপরীতে জামে' সগীরের এবারতের যে মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা সহিহ নয়। এবং এ মর্মের উপর ভিত্তি করে হিদায়া, তাবয়ীনুল হাকাইক অথবা অন্যান্য কিতাবগুলোতে শুধু চার ধরনের পানীয় হারাম হওয়ার আর অন্যসব নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হালাল হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, অথবা এগুলো পানকারীদের উপর হদ আবশ্যক না হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, এগুলোর কোনটাই সহিহ নয়।

৮. মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলি সিদ্দিকি কান্দলবী হানাফি লেখেন, হানাফিগণ মদের বিষয়ে দীর্ঘ সব আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার কাছে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর ফায়সালা পছন্দ– ما أسكر كثيره فقليله حرام অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ পানীয়, যা বেশি পান করলে নেশা ধরে, এর অল্প পান করাও হারাম। এ ব্যাপারে সাহেবে দুররে মুখতারের বক্তব্য হচ্ছে, به يفتى অর্থাৎ হানাফি মাযহাবে এর উপরই ফাতওয়া। এবং শুধু এটাই নয় যে, শরাব, যাকে কুরআন মদ বলেছে, তা-ই হারাম, বরং হানাফিগণ এ ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে কিছুটা কঠোরতার নীতি অবলম্বন করেছেন। তারা একে শুধু হারামই বলেননি, বরং নাপাক ও নাজিসুল আইন তথা সত্তাগতভাবেই নাপাক বলেছেন। হানাফিগণ একে হালাল মনেকারীদের ইসলামের সীমানাভুক্ত মনে করেন না। তারা একে মুসলমানদের সম্পদ হওয়ার যোগ্য বলে মানেন না। তারা এর থেকে উপকৃত হওয়ার সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এমনকি তারা ওষুধের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহারকে নাজায়েয বলে দিয়েছেন। স্মরণ রাখা চাই, ফিকহে হানাফিতে আইন

হিসাবে গণ্য সেটা, যেটার উপর ফাতওয়া। বিক্ষিপ্ত কিছু মতামতের নাম হানাফি মাযহাব নয়। বরং যারা লেখার, তারা লিখেছেন, মদ পানকারীর ঘামও নাপাক এবং ঘাম বের হলে তার অযু ভেঙ্গে যায়।

যাইহোক, আমাদের কাছে আহনাফের বিস্তারিত আইনী আলোচনাগুলোকে এক পাশে রেখে শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. এর এ সিদ্ধান্তই ভাল মনে হয় যে, "নেশা সৃষ্টিকারী সকল পানীয় আইম্মায়ে সালাসা এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হারাম। তারা এই সবগুলোকে মদই বলে থাকেন এবং কোনো প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়া সবগুলোকে হারাম আখ্যা দেন। আর আইম্মায়ে সালাসা ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রহ. শরাবের সকল প্রকারকেই হারাম বলেছেন এবং নিঃসন্দেহে এ যুগের অবস্থা অনুযায়ী এ মতকে গ্রহণ করাটাই সতর্কতার দাবি।[১০৯]

ফিকহে হানাফিতে মদ (শরাব) এর একটা ফোটাও হারাম।

ক. আল্লামা ইবনে হুমাম হানাফি লেখেন, মদ ছাড়া অন্য নাবিযগুলোতে নেশা হলে হদ আবশ্যক হয় আর মদের এক ফোঁটা পান করলেও হদ আবশ্যক হয়, চাই নেশা হোক বা না হোক।[১১০]

খ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. লেখেন,

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم قال: الخمر قليلها وكثيرها حرام.

ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, মদ সর্বাবস্থায় হারাম, চাই কম হোক বা বেশি হোক।[১১১]

---

১০৯. আওজাযুল মাসালিক শরহে মুআত্তা মালেক।

১১০. ফাতহুল কাদীর শরহে হেদায়া : ৫/৭৯,৮০।

১১১. কিতাবুল আসার : পৃষ্ঠা ১৫৪।

ফিকহে হানাফিতে মদ পান করার শাস্তি

১. আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি হানাফি লেখেন,

أي شراب كان غير الخمر إذا شربه لا يحد إلا إذا سكر به

মদ ব্যতীত অন্য যে পানীয়ই পান করা হোক, হদ আবশ্যক হবে না। অবশ্য যদি এর কারণে নেশা হয়ে যায় তাহলে হদ আবশ্যক হবে।[১১২]

২. কুদুরি মুতারজাম পৃষ্ঠা ৩১৮, এইচ এম সায়িদ কোম্পানি করাচি কর্তৃক মুদ্রিত, এতে রয়েছে, স্বাধীন ব্যক্তির জন্য মদ ও নেশার হদ হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত।

৩. আহসানুল মাসাইল তরজমায়ে কানযুদ দাকাইক, এইচ এম সায়িদ কোম্পানি করাচি কর্তৃক মুদ্রিত, এর ১৮২ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে–

আর নেশার শাস্তি (যে কোনো পানীয়ের কারণেই নেশা হোক না কেন) এবং আঙ্গুরের মদ পান করার হদ, যদিও এক ফোঁটাই পান করুক না কেন, (আমাদের মতে) আশিটি বেত্রাঘাত।

৪. আশরাফুল বেকায়া তরজমায়ে শরহে বেকায়া : ২/৩৩১, মাতবূয়ায়ে মীর মুহাম্মদ করাচীতে রয়েছে, মদ পান করার হদ মিথ্যা অপবাদের হদের মত। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশিটি বেত্রাঘাত আর গোলামের ক্ষেত্রে এর অর্ধেক।

৫. হিদায়ায় আছে, 'আর স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ পান করার শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। এ সংখ্যা সাহাবায়েকেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।'

৬. ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া তরজমায়ে ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ৩/২৮৫ গায়রে মুকাল্লিদ সাইয়েদ আমির আলি অনূদিত ও হামেদ এন্ড কোম্পানি লাহোর থেকে মুদ্রিত, এর মধ্যে আছে, নেশা ও মদের হদ, যদিও তা এক ফোঁটাই পান করা হোক না কেন, আশিটি বেত্রাঘাত।

সম্মানিত পাঠক, এখন অন্য ইবারতের বিশ্লেষণ পৃথকভাবে করার আর প্রয়োজন নেই, এর উত্তরও এ আলোচনার মধ্যে এসে গেছে। আমরা অধিকাংশ ইবারত উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ থেকে নকল করেছি, যাতে আপত্তি উত্থাপনকারীর জন্য বুঝতে সহজ হয়।

---

১১২. রদ্দুল মুহতার : ৩/২২৫, মাতবুয়ায়ে উমানিয়া ইসতামবুল।

আপত্তি : পাঁচ

মুশরিকদের হারাম শরিফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের নাপাক হওয়ার এবং মসজিদে হারামে তাদের প্রবেশ করার ব্যাপারে এভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

হে মুমিনগণ, নিঃসন্দেহে মুশরিকরা নাপাক। অতএব এ বছরের পর তারা যেন মসজিদে হারামের কাছে না আসতে পারে।[১১৩]

ফিকহে হানাফিতে মুশরিকদের হারামে প্রবেশের অনুমতি

আর হানাফিরা যিম্মিদের (কাফেরদের) মসজিদে হারামে প্রবেশ করার এভাবে অনুমতি দিচ্ছে যে,

و لا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام.[١١٤]

যিম্মি কাফের মসজিদে হারামে প্রবেশ করাতে কোনো সমস্যা নেই।[১১৫]

---

১১৩. সুরা নূর।

১১৪. হেদোয়া আখেরাইন:৪৭২।

১১৫. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা২৯, ৩০।

পঞ্চম আপত্তির উত্তর

আপত্তি উত্থাপনকারীর কথা অনুযায়ী সুরা নুরে রয়েছে যে, মুশরিকরা যেন পবিত্র হারামের কাছেও না ভিড়তে পারে, আর হিদায়ার মধ্যে আছে যিম্মিরা হারামে প্রবেশে কোনো সমস্য নেই।

আমরা বলব, আপত্তি উত্থাপনকারীর না কুরআনের জ্ঞান আছে, না ফিকহের জ্ঞান আছে। তিনি যে আয়াতটি নকল করেছেন তা হচ্ছে সুরা তাওবার, অথচ তিনি সূত্র হিসাবে নাম দিয়েছেন সুরা নূরের। কুরআনে পাকে দু'টি আয়াত আছে–

প্রথম আয়াত

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

তাদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মসজিদসমূহে প্রবেশ করবে, কিন্তু ভীত অবস্থায়। তাদের জন্য রয়েছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা (জিযিয়া প্রদান করার) এবং আখেরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

আল্লামা আলুসী রুহুল মাআনীতে বলেন, ইমাম সাহেব এ আয়াতের মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন যে, যিম্মিদের মসজিদসমূহে প্রবেশে কোনো সমস্যা নেই, যখন তারা পরাজিত ও পদানত থাকবে।

দ্বিতীয় আয়াত

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ম হিজরিসনে হযরত আবুবকর ও হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে দিয়ে একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ .

হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা (বিশ্বাসগতভাবে) নাপাক। (আর যেহেতু বিশ্বাসগতভাবে নাপাকদের কোনো ইবাদত কবুল হয় না, তাই তারা যেন হজের জন্য) মসজিদে হারামের কাছেও না ভিড়ে, এই বছরের পর। (বছরের কথা এজন্য বলা হয়েছে, কারণ হজের জন্য বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই আসা হয়)। আর হে মুসলমানরা, যদি তোমরা অভাবের আশংকা কর, (কারণ হজের সময় কাফের ব্যবসায়ীরাও পণ্যদ্রব্য নিত এবং এই ব্যবসা থেকে রুটি-রুজির ব্যবস্থা হত। তো মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তোমরা এসবের পরওয়া করো না যে, যদি তারা হজের সময় না আসে তাহলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, যা অর্থনীতির মূল ভিত্তি) তবে আল্লাহ তোমাদের অভাবমুক্ত করে দিবেন। যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত শোনালেন তখন তিনি হজের বিশাল সমাবেশে এ ঘোষণা দিলেন–

ألا لا يحج بعد عامنا مشرك.

অর্থাৎ এ বছরের পর যেন কোনো মুশরিক হজের জন্য না আসে।[১১৬]

বুঝা গেল, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ ও উমরা থেকে মুশরিকদের বাধা দেওয়া। আয়াতের এ উদ্দেশ্যই সুস্পষ্টভাবে হিদায়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

والآية محمولة على الحضور استيلاء واستعلاء أو طائفتين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية.[১১৭]

সুরা তাওবার এ আয়াতের উদ্দেশ্য হল, তারা যাতে বড়ত্ব ও অহমিকার ভাব নিয়ে হারাম শরিফে প্রবেশ না করে, অথবা হজের জন্য উলঙ্গ তাওয়াফ করতে প্রবেশ না করে। যেমনটা জাহেলিয়াতে তাদের মধ্যে এ প্রচলন ছিল।

দেখুন, হানাফিগণ এ আয়াতকে অস্বীকার করেননি, বরং এর ঐ উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন, যা আয়াতের পূর্বের ও পরের অংশ দেখলে স্পষ্টভাবে বুঝে

---

১১৬. রুহুল মাআনী : ১০/৭৭।

১১৭. হেদায়া : ৪/৪৭২।

আসে এবং যে কথার ঘোষণা হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়াত নাযিল হওয়ার সময় হজের সমাবেশে দিয়েছিলেন।

এব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি

হাদিস নং (১) সুরা তাওবার এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাকিফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মসজিদে রেখেছিলেন।[১১৮]

হাদিস নং (২) তাবরানিতে আছে, فضرب لهم قبة في المسجد তাদের জন্য মসজিদে গম্বুজ সদৃশ তাবু টানানো হল।[১১৯]

হাদিস নং (৩) এবং মারাসীলে আবু দাউদে ইমাম হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, যখন ঐ প্রতিনিধি দলকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে রাখলেন তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, আপনি তাদের মসজিদে রাখছেন অথচ তারা মুশরিক, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জমিন নাপাক হয় না, নিঃসন্দেহে আদমসন্তান নাপাক হয়।[১২০]

এ হাদিস দ্বারাও বোঝা গেল যে, শিরকের নাপাকি মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ বছরের পর কোনো মুশরিক যেন মসজিদে হারামের কাছেও না যায়, তবে কোনো গোলাম বা বাঁদী কোনো প্রয়োজনে গেলে ভিন্ন কথা।[১২১]

---

১১৮. আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ, ৭২/২باب خبر الطائف।

১১৯. নাসবুর রায়াহ : ৪/২৭০।

১২০. নাসবুর রায়াহ : ৪/২৭০।

১২১. আহকামুল কুরআন : ৩/৮৯।

সাহাবি থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নিঃসন্দেহে মুশরিকরা নাপাক, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের কাছেও না যায়, কিন্তু কোনো গোলাম বা যিম্মি হলে ভিন্ন কথা।[১২২]

তাবেয়ি থেকে উক্ত আয়াতের তাফসির

বিশিষ্ট তাবেয়ি হযরত কাতাদা এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, এ বছরের পর কোনো মুশরিক যেন মসজিদে হারামের কাছেও না যায়, কিন্তু কোনো মুশরিক যদি মুসলমানের গোলাম হয় অথবা জিযিয়া প্রদানকারী যিম্মি হয় তাহলে তার কথা ভিন্ন।[১২৩]

ফারুকি শাসনামলে হারাম শরিফে এক খ্রিস্টানের প্রবেশের অনুমতি

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে এক খ্রিস্টান ব্যবসা করার জন্য আসল। তখন তার থেকে উশর নেওয়া হল। সে দ্বিতীয়বার আসল, তখনও তার থেকে উশর চাওয়া হল। সে উশর দিতে অস্বীকৃতি জানাল এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেল। তিনি সে সময় মক্কা মুকাররমা পবিত্র হারামে ছিলেন এবং খুতবায় বলছিলেন, إن الله جعل البيت مثابة للناس তখন এ খৃস্টান বলে উঠল, আমিরুল মুমিনিন, যিয়াদ ইবনে হুদায়র আমার কাছে বারবার উশর চায়। হযরত উমর বললেন, তোমাকে বছরে একবারই তোমার মালের উশর দিতে হবে।[১২৪]

এখন যদি ইমাম আযম রহ. একথা বলে থাকেন,

لا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام[١٢٥]

---

১২২. তাফসীরে ইবনে জারির : ১০/৭৬।

১২৩. তাফসীরে ইবনে জারির : ১০/৭৬।

১২৪. কিতাবুল খারাজ-ইমাম আবু ইউসুফ : পৃষ্ঠা ১৬২।

১২৫. হেদায়া : ৪/৪৭২।

তাহলে তার একথা বরং কুরআনের আয়াত أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ প্রবেশের অনুমতি সুরা তাওবার আয়াতের পরিপন্থী নয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় জনসমাবেশ চলাকালে একজন খ্রিস্টান পবিত্র হারামে প্রবেশ করেছে, তখন কোনো এক ব্যক্তিও দাঁড়িয়ে إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ আয়াতটি শোনায়নি। বুঝা গেল, ঐ সকল সাহাবি ও তাবেয়িগণের নিকটও কোনো যিম্মির সাময়িকভাবে মসজিদে হারামে প্রবেশ করাটা কোনো আয়াত বা হাদিসের পরিপন্থী বিষয় ছিল না।

যে মাসআলা সাহাবা ও তাবেয়িনেরও বুঝে আসেনি জানি না, আপত্তি উত্থাপনকারী কোনো উস্তাদের কাছে এটা শিখে নিয়েছেন?

আপত্তি : ছয়

কিসাস শুধু তরবারি দিয়ে নেওয়ার মাসআলা

ইসলাম ও সীমালঙ্ঘনের শাস্তি

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, আল্লাহ তায়ালা যার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে, তাকে সমপরিমাণ সীমালঙ্ঘনের অধিকার দিয়ে বলেন,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

যে কেউ তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করবে, তোমরাও তার উপর সমপরিমাণ সীমালঙ্ঘন কর।[১২৬]

ফিকহে হানাফি ও সীমালঙ্ঘনের শাস্তি

আর হানাফিরা শাস্তির প্রকারকে এভাবে নির্দিষ্ট করে দেয় যে,

ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف[١٢٧]

কিসাস শুধু তরবারি দিয়েই নেওয়া হবে। অথচ আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদিরা হত্যার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তাদের থেকে কিসাস নেওয়ার সময় সে পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। যেমনটি হাদিসে আছে—

---

১২৬. আল-বাকারাহ : ১৯৪।

১২৭. হেদায়া আখেরাইন : পৃষ্ঠা ৫৬০।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ، حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ بِهِ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ»[১২৮]

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ইহুদি একটি মেয়ের মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে দেয়। ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ কাজ কে করেছে, অমুকে করেছে? অমুকে করেছে? এক পর্যায়ে উক্ত ইহুদির নাম নেওয়া হয় (তখন মেয়েটি সে করেছে বলে সায় দেয়) এরপর ইহুদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসা হয় এবং সে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। অতঃপর তার মাথাকেও পাথর দিয়ে থেতলে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে কিসাসের আরও একটি পদ্ধতি নিম্নোক্ত হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلَا يُسْقَوْنَ" [১২৯]

---

১২৮. বুখারী, হাদিস নং ৮৬৭৬।

১২৯. আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৬৪।

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উকল –অথবা তিনি বলেছেন– উরাইনা অঞ্চলের লোকেরা মদিনায় আসল। মদিনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মদিনার বাইরে থাকার হুকুম দিলেন এবং তাদের বললেন, তারা যেন উটের দুধ ও পেশাব পান করে। তারা সেখানে থাকতে লাগল। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে বিষয়টা জানতে পারলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের পিছনে সাহাবায়েকেরামকে পাঠালেন। বেলা তখনো খুব বেশি হয়নি, এরই মধ্যে তাদের ধরে আনা হল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে আদেশ জারি করলেন, ফলে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হল, চোখে পেরেক মেরে দেওয়া হল এবং তাদের মরুপ্রান্তরে নিক্ষেপ করা হল, তারা পানি চাইত কিন্তু তাদের পানি দেওয়া হত না।[১৩০]

ষষ্ঠ আপত্তির উত্তর

ফিকহে হানাফির এ মাসআলাটি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। লক্ষ্য করুন–

হাদিস নং (১)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»[١٣١]

হযরত আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তরবারি ব্যতীত আর কোনো জিনিস দিয়ে কিসাস নেওয়া যাবে না।

---

১৩০. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : ৩০,৩১।

১৩১. সুনানে ইবনে মাজাহ بَابُ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ, সুনানে দারাকুতনী : ৩/১০৬।

হাদিস নং (২)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ، إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَإٍ أَرْشٌ»[١٣٢]

হযরত নোমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তরবারি ছাড়া আর সকল জিনিসের মধ্যে ভুল রয়েছে, আর সকল ভুলের ক্ষেত্রে দিয়ত আসবে।

হাদিস নং (৩)

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ, وَلَا قَوَدَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ».[١٣٣]

হাদিস নং (৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».[١٣٤]

হাদিস নং (৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِسِلَاحٍ»[١٣٥]

হাদিস নং (৬)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَوَدَ فِي شَلَلٍ وَلَا عَرَجٍ»[١٣٦]

---

১৩২. মুসনাদে আহমদ : ৪/২৭২, মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ৯/৩৪২, তহাবি মুতারজাম : ৩/২৬৩, ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ৪৪৩, باب لا قود إلا بالسيف , সুনানে দারাকুতনী : ৩/১০৭, সুনানে কুবরা বাইহাকি : ৮/৪২, নাসবুর রায়াহ : ৪/৩৩৩।

১৩৩. সুনানে দারাকুতনী : ৩/৮৮।

১৩৪. সুনানে দারাকুতনী : ৩/৮৭,৮৮।

১৩৫. সুনানে দারাকুতনী : ৩/৮৮।

আমরা এখানে কিছু রেওয়ায়েত নকল করেছি। এগুলো ছাড়াও আরো রেওয়ায়েত ও আসার রয়েছে, যেগুলোতে হানাফি মাযহাবের মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

বাকি কথা হচ্ছে, আপত্তি উত্থাপনকারী যে আয়াত দ্বারা তার আপত্তিকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এর সাথে এ মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই।

গায়রে মুকাল্লিদদের মুফাসসির সালাহুদ্দীন ইউসুফ এ আয়াতের তাফসিরে লেখেন,

উদ্দেশ্য হচ্ছে, এবারও যদি মক্কার কাফেররা এ মাসের সম্মান নষ্ট করে (বিগত বছরের মত) তোমাদের মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়, তাহলে তোমরাও এর সম্মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের কঠোরভাবে মোকাবেলা কর। সম্মান বজায় রাখলে এর বিনিময় রয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি সম্মান বজায় রাখে তাহলে তোমরাও সম্মান বজায় রাখ। কিন্তু তারা যদি এর বিপরীত করে তাহলে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও।[১৩৭]

বাকি রইল ঐ দুটি রেওয়ায়েত প্রসঙ্গ, যা আপত্তি উত্থাপনকারী আপত্তির মধ্যে পেশ করেছেন, তো সেগুলোর বিশ্লেষণ এখন করা হচ্ছে–

প্রথম রেওয়ায়েতের জবাব

জবাব নং (১) ঐ ইহুদির অভ্যাস ছিল, সে রাস্তায় ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরে মেরে ফেলত। সে হিসাবে সে সন্ত্রাসী ও পেশাদার খুনি ছিল। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় এভাবে হত্যা করেছেন।

জবাব নং (২) এটা মুসলা (অঙ্গ বিকৃত করে হত্যা) হারাম হওয়ার পূর্বেকার কাজ। যখন মুসলা হারাম করে দেওয়া হল তখন থেকে শরিয়তে কিসাস নেওয়ার জন্য শুধু তরবারি ব্যবহারের অনুমতিই বহাল রয়েছে।[১৩৮]

---

১৩৬. সুনানে দারাকুতনী : ৩/৯১।

১৩৭. ইবনে কাসির, তাফসিরে আহসানুল বায়ান : ৭৮, সৌদি থেকে মুদ্রিত।

১৩৮. খুলাসায়ে উমদাতুল কারী শরহে সহিহুল বুখারী : ১২/২৫৪,২৫৫।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের জবাব

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে এভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন, এর কারণ হচ্ছে, তারা মূলত পাঁচটি অপরাধ করেছিল–

১. তারা ইসলামের পর পুনরায় কাফের হয়ে গিয়েছিল এবং মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।

২. তারা ডাকাতি করেছিল।

৩. তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়োগকৃত রক্ষীদের হত্যা করেছিল।

৪. তাদের হাত-পা কেটে দিয়েছিল।

৫. তাদের চোখে কাঁটা গেঁথে দিয়েছিল।

এজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সকল মুসলমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং তাদের উপর এধরনের শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। এ শাস্তি তাদের এ পাঁচটি অপরাধের সামষ্টিক শাস্তি ছিল। আরেক কথা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন, আর রাষ্ট্রপ্রধান যেভাবে ইচ্ছা হত্যা করার অধিকার রাখেন।

জবাব নং (২)

এটা তখনকার ঘটনা, যখন মুসলা জায়েয ছিল। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফলে এ ঘটনার বিধান রহিত হয়ে গেছে।[১৩৯]

---

১৩৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, উমদাতুল কারী : ১২/২৫৪,২৫৫, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম শরহে সহীহ মুসলিম।

আপত্তি : সাত
দিরহাম পরিমাণ নাপাকের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলাম ও পবিত্রতা

আল্লাহ তায়ালা কাপড় পবিত্র রাখার হুকুম দিয়েছেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

হে নবি, নিজের কাপড়কে পবিত্র রাখুন।

হানাফিরাও এ আয়াতের ভিত্তিতে নামাযে কাপড় পবিত্র হওয়াকে ওয়াজিব বলেছে। আর ইমাম বুখারিও এক হাদিসের উপর এভাবে অনুচ্ছেদ লিখেছেন, بَابٌ: لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।[১৪০]

ফিকহে হানাফি ও পবিত্রতা

এখন হানাফিদের কথা শুনুন, হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز"

---

১৪০. বুখারি, হাদিস নং ১৩৫।

এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাতে গালিযা যেমন– রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগির বিষ্ঠা অথবা গাধার পেশাব যদি লেগে থাকে, তাহলে এগুলোর সাথেও নামায পড়া জায়েয। তবে এক দিরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে জায়েয হবে না।[১৪১]

এরপর এ মাসআলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء

আমরা এক দিরহাম পরিমাণ (নাপাকি মাফ হওয়াকে) এজন্য নির্ধারণ করেছি যে, পায়খানা করার জায়গা এ পরিমাণই হয়ে থাকে।[১৪২]

অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকি ধোয়ার হুকুম দিচ্ছেন,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ»[١٤٣]

আসমা বিনতে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, যদি আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায় তাহলে আমরা কী করব? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমাদের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায় তাহলে তাতে ঘষা দাও, এরপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেল, এরপর তাতে নামায পড়।

---

১৪১. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৫৮।

১৪২. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃ: ৫৮।

১৪৩. বুখারী : ৩০৭।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো উচিত ছিল একথা বলা যে, যদি এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত লেগে থাকে তাহলে তাতে নামায পড়ে নাও। আর যদি এর বেশি লেগে থাকে তাহলে তখন ধৌত কর।[১৪৪]

সপ্তম আপত্তির উত্তর

নিঃসন্দেহে ফুকাহা আলাইহিমুর রাহমাহ এরকম লিখেছেন, কিন্তু এ মাফ হওয়াটা হচ্ছে নামায সহিহ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, গোনাহ না হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এমন যে করবে তার গুনাহও হবে না। ফুকাহায়েকেরাম একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, এমন করা মাকরুহে তাহরিমি।

দুররে মুখতারে আছে,

(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريما، فيجب غسله[١٤٥]

শরিয়ত প্রবক্তা দিরহাম পরিমাণ নাপাকিকে মাফ করেছেন, যদিও তা মাকরুহে তাহরিমি। তাই এটা ধুয়ে ফেলাটা ওয়াজিব।

বুঝা গেল, যে কাপড়ে দিরহাম পরিমাণ নাপাকি লেগে আছে, তাতে নামায পড়া আমাদের মতে মাকরুহে তাহরিমি, তা ধৌত করা এবং নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

যেমনটা শায়েখ আবদুল হাই লাখনবি রহ. বলেছেন,

إشارة إلي أن العفو عنه بالنسبه إلى صحة الصلوة به فلا ينافى الإثم.

এ মাফ হওয়াটা নামায সহিহ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে নয় যে, এতে কোনো গুনাহ হবে না।[১৪৬]

আর এ অনুমতিও ঐ সুরতে, যখন ধৌত করার জন্য পানি না থাকে অথবা অন্য কোনো পবিত্র কাপড় না থাকে। যদি পানির ব্যবস্থা থাকে এবং সময়ও থাকে, তাহলে তা ধুয়ে ফেলাটাই হচ্ছে জরুরি।

---

১৪৪. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩০,৩১।

১৪৫. দুররে মুখতার : ১/৩১৬।

১৪৬. উমদাতুর রিআয়াহ : ১/১৫০।

ফাতাওয়া গিয়াসিয়ার ১৩ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে–

دخل فى الصلوة فرأى به ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وكان فى الوقت سعة فالأفضل أن يقع أو يغسل الثوب ويستقبلها فى جماعة أخرى وإن فاتته هذه ليكون موريا فرضه على الجوار بيقين فإن كان عالما للماء أو لم يكن فى الوقت سعة أو لا يرجوا جماعة أخرى مضى عليها وهو الصحيح.

অর্থাৎ, কেউ নামায শুরু করার পর দেখল, কাপড়ে দিরহাম পরিমাণের চেয়ে কম নাপাকি লেগে আছে, এদিকে নামাযের সময়ও অনেক বাকি আছে, তাহলে উত্তম এটাই যে, নামায ছেড়ে কাপড় ধুয়ে ফেলবে এবং আরেক জামাতে একেবারে নতুন করে নামায শুরু করবে। যদিও এ জামাত তার ছুটে যায়, যাতে তার ফরযটা নিশ্চিতভাবে আদায় হয়ে যায়। তবে যদি পানি না থাকে অথবা নামাযের সময় কম থাকে অথবা আরেক জামাত পাওয়ার আশা না থাকে তাহলে এ নাপাকি সহই নামায পড়ে নিবে।

তাহতাওয়ী রহ. বলেছেন,

المراد عفا عن الفساد به وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم وتنزيها إن لم تبلغ.[١٤٧]

অর্থাৎ মাফ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামায নষ্ট হবে না, নচেৎ মাকরুহে তাহরিমি হওয়াটা ইজমায়ী বিষয়। এটা হচ্ছে যদি নাপাকি এক দিরহাম পরিমাণ হয়। আর যদি নাপাকি এক দিরহামের চেয়ে কম হয় তাহলে মাকরুহে তানযিহি হবে।

বুঝা গেল, যদি দিরহাম পরিমাণ নাপাকি নিয়ে নামায পড়ে তাহলে ঐ নামায মাকরুহে তাহরিমি হবে। যা পুনরায় পড়া এবং কাপড় ধুয়ে নেওয়া ওয়াজিব হবে। একারণে দীনদারীর দাবি তো ছিল আপত্তি উত্থাপনকারী এই সকল বিষয়গুলোকে লেখা এবং তারপর আপত্তি উত্থাপন করা, যাতে পাঠকগণ মূল মাসআলা বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু এখানে তো সাধারণ

---

১৪৭. তাহতাওয়ী আলা মারাকিল ফালাহ : পৃষ্ঠা ৯০।

মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে হানাফি মাযহাব থেকে তাদের দূরে সরানো উদ্দেশ্য ছিল, এখানে দীনদারীর প্রশ্ন আনাটাই তো অবান্তর?

সম্মানিত পাঠক, যখন আমরা মূল মাসআলা জেনে নিয়েছি, এখন আমাদের একথাও জানা উচিত, এ মাফ হওয়ার বিষয়টি কোনো সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। এ মাফ হওয়ার বিষয়টি ফুকাহায়েকেরাম পাথর দিয়ে ইসতেনজা করার মাসআলা থেকে বের করেছেন। কেননা স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, পাথর, ঢিলা নাপাকিকে দূর করে না, বরং একে কিছুটা কমিয়ে দেয়। বুঝা যাচ্ছে, পায়খানার জায়গা নাপাক হওয়াকে শরিয়ত নামাযের জন্য মাফ করেছে, আর ঐ জায়গার আয়তন হচ্ছে এক দিরহাম পরিমাণ। এজন্য ফুকাহায়েকেরাম নামাযের জন্য দিরহাম পরিমাণ নাপাকি মাফ লিখেছেন।

ইমাম নববি মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাদিস إذا استيقظ أحدكم من منامه এর অধীনে কয়েকটা মাসআলার মধ্যে এটাও লেখেন,

منها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلوة.[১৪৮]

অর্থাৎ একটা মাসআলা হচ্ছে, ইসতেনজার জায়গা পাথরের মাধ্যমে পবিত্র হয় না, বরং অপবিত্র থেকে যায়, যা নামাযের জন্য মাফ করা হয়েছে।

এমনিভাবে হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী ১ নং পারায় লেখেন, হিদায়া কিতাবে আছে, وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء অর্থাৎ অল্প নাপাকি, যা মাফ, আমরা এর পরিমাণ এক দিরহাম অনুমান করেছি এবং এটা আমরা পায়খানার জায়গা (এর মাফ হওয়া) থেকে নিয়েছি।[১৪৯]

আল্লামা শামি রহ. বলেন,

قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعا، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع.

---

১৪৮. শরহে নববী : পৃষ্ঠা ১৩।

১৪৯. পৃষ্ঠা ৫৮।

وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا وظفره كان قريبا من كفنا.

শরহে মুনয়ায় রয়েছে, অল্প নাপাকি ইজমায়িভাবে মাফ। কেননা এর উপর ইজমা যে, পাথর দিয়ে ইসতেনজা করে নেওয়া যথেষ্ট, অথচ তা নাপাকি সম্পূর্ণরূপে দূর করে না। আর দিরহামের পরিমাণ হযরত উমর, আলি ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে। যেহেতু এক্ষেত্রে কিয়াস করার কোনো সুযোগ নেই, তাই এতে হাদিস বা আসারের উপরই নির্ভর করতে হবে।

আর হিলইয়ায় রয়েছে, দিরহাম পরিমাণের বিষয়টা পায়খানার জায়গার দিকে ইঙ্গিতের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। যেমনটা ইবরাহিম নাখয়ি রহ. বলেন, লোকেরা নিজেদের মজলিসসমূহে পায়খানার জায়গার উল্লেখকে খারাপ মনে করল, তাই ইঙ্গিতসূচকভাবে এটাকে দিরহাম বলে প্রকাশ করল। এর সমর্থন ওলামায়েকেরামের একথা থেকে পাওয়া যায় যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন অল্প নাপাকির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, যখন আমার নখ বরাবর হবে তখন তা আমার নামাযের জায়েয হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না। বর্ণিত আছে, তার নখ আমাদের হাতের তালুর সমান ছিল।[১৫০]

এ বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হল, এ দিরহাম পরিমাণের বিষয়টি খোদ সাহাবায়েকেরাম থেকেও বর্ণিত আছে। ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

মুরগি ইত্যাদির বিষ্ঠার মাসআলা

এ পর্যন্ত দিরহাম পরিমাণের আলোচনা ছিল। এখন আমরা মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদির যে মাসআলা রয়েছে এর সামান্য বিশ্লেষণ করছি।

---

১৫০. শামি : ১/২৩১।

হারাম প্রাণীর বিষ্ঠা ইমাম সাহেবের নিকট নাজাসাতে খাফিফাহ। এজন্য দিরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশি লাগলেও নামায হয়ে যাবে। যদি আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে এ বিষ্ঠা নাজাসাতে গালিযা হওয়ার উপর এবং তা লাগলে নামায না হওয়ার উপর কোনো দলিল থেকে থাকে, তাহলে তিনি তা পেশ করুক। যদি না থাকে এবং নিশ্চিতভাবেই নেই; তাহলে আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার জন্য তার তাওবা করা আবশ্যক।

শুনুন, ফুকাহায়েকেরাম একটা মূলনীতি লিখেছেন, যা তারা কুরআন-হাদিস থেকে বের করেছেন, আর তা হচ্ছে, المشقة تجلب التيسير। কষ্ট সহজতাকে টানে। অর্থাৎ কষ্টের সময় শরিয়ত ছাড় দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সহজতার ইচ্ছা করেন, কাঠিন্যের নয়।[১৫১] অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থাৎ আল্লাহ দীনের মধ্যে তোমাদের জন্য কোনো কষ্ট রাখেননি।[১৫২]

হাদিসে পাকে আছে,

أحب الدين إلى الله الحنفية المسحة.[১৫৩]

আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম হল সহজতার উপর প্রতিষ্ঠিত দীনে হানিফ।

বুখারি শরীফে মারফু সূত্রে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الدين يسر দীন সহজ।

---

১৫১. সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৫।

১৫২. সুরা হজ, আয়াত ৭৮।

১৫৩. ইমাম বুখারী তা'লীকীভাবে এ হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারির ১নং পারায় লেখেন,

وقد يستفاد من هذه الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية

এ হাদিস থেকে এ বিষয়ে ইশারা মিলে যে, শরিয়তপ্রদত্ত ছাড়ের উপর আমল করা দুরস্ত আছে।

আল আশবাহ ওয়ান নাযাইরের ৯৬ পৃষ্ঠায় আছে, ইবাদতের ক্ষেত্রে সাতটি কারণে ছাড় দেওয়া হয়; সফর, অসুস্থতা, খবর, ভুলে যাওয়া, অজ্ঞতা, কাঠিণ্য ও ব্যাপক আগ্রাসী বিপদ।

বুঝা গেল, ব্যাপক আগ্রাসী বিপদ ও কাঠিন্যও ছাড়ের কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর উদাহরণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল আশবাহ ওয়ান নাযাইরের মুসান্নিফ লেখেন,

كالصلوة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع الثوب من مخففة وقدر الدرهم من المغلظة.

যেমন ঐ নাপাকির সাথে নামায পড়া যা মাফ, অর্থাৎ নাজাসাতে খাফিফার থেকে কাপড়ের এক চতুর্থাংশ থেকে কম এবং নাজাসাতে গালিযা থেকে এক দিরহাম পরিমাণ।

আমরা হানাফি মাযহাবের মত সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি। যদি আপত্তি উত্থাপনকারীর কাছে হুবহু এই মাসআলার দলিল কুরআন থেকে, থাকে তাহলে তিনি তা পেশ করুক।

আপত্তি : আট

নাপাকি চেটে পবিত্র করার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী (তালেবুর রহমান) লেখেন,

ইসলামে নাপাকি ধৌত করার বিধান

আল্লাহ তায়ালা নাপাক দূর করার জন্য দুটি জিনিসের কথা বলেছেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, যাতে তিনি তোমাদের এর দ্বারা পবিত্র করতে পারেন।[১৫৪]

এক জায়গায় এমন বলেছেন,

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

(যদি) পানি না পাও তাহলে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও।[১৫৫]

ফিকহে হানাফিতে নাপাকি চাটা

কিন্তু হানাফিরা নতুন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। লক্ষ্য করুন, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী (১/৪৫) এ আছে,

---

১৫৪. সুরা আনফাল, আয়াত ১১।

১৫৫. সুরা নিসা, আয়াত ৪৩।

إذا أصابت النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب أثرها يطهر وكذا السكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه. هكذا في فتاوى قاضي خان. ولو لحس الثوب بلسانه حتى ذهب الأثر فقد طهر. كذا في المحيط.

যদি শরীরের কোনো অঙ্গে নাপাকি লেগে যায় তাহলে যদি জিহ্বা দিয়ে তা এমনভাবে চেটে নেয় যে, এর চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে।

পবিত্রতার নতুন এ পদ্ধতিতে শরীর পবিত্র করতে গিয়ে জিহ্বা অপবিত্র হয়ে গেলেও কোনো সমস্যা নেই।[১৫৬]

অষ্টম আপত্তির উত্তর

আপত্তি উত্থাপনকারী নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে ফাতাওয়ায়ে আলমগিরির বিশ্বমানের কথা বুঝতে পারেননি। এ ফাতাওয়া গ্রন্থ আল্লাহর ফযলে একটি বিশ্বমানের ফাতাওয়া। এতে ঐ সকল মাসআলা সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা ইসলামি বিশ্বে ব্যাপকভাবে বা বিশেষভাবে সামনে আসতে থাকে অথবা আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারকগণ এ কিতাবের সাহায্যে দুর্লভ থেকে দুর্লভতর সমস্যা ও মামলার সমাধান পেশ করতে পারেন। দুনিয়ার এ জগতে যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধসম্পন্ন মানুষের বসবাস রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এখানে পাগল ও বাচ্চাদেরও বসবাস রয়েছে। এদের কারণেও কিছু কিছু মাসআলার সৃষ্টি হতে থাকে। উল্লিখিত মাসআলাটিও এ ধরনেরই একটি মাসআলা।

হাতের কোনো আঙ্গুলের উপর যদি পেশাব, মদ বা রক্ত লেগে যায়, তাহলে ঐ আঙ্গুলকে নাপাকি থেকে পবিত্র করার জন্য সাধারণত পানিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিশু ও পাগলদের কাছে এ আশা করা যায় না যে, তারা ঐ নাপাকিকে পানি দ্বারাই পবিত্র করবে। বরং এদের ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা অমূলক নয় যে, তারা পানি দ্বারা ধৌত করার পরিবর্তে একে চেটে

---

১৫৬. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪।

নিবে এবং আল্লাহর পানাহ! চেটে নেওয়ার পর ঐ আঙ্গুলটিই কোনো ব্যক্তির পানি বা দুধ বা শরবত বা এধরনেরই অন্য কোনো জিনিসের মধ্যে ডুবিয়ে দিবে, আর ঐ ব্যক্তি ইসলামি আদালতে এমন একটা মোকদ্দমা দায়ের করে দিবে যে, আমি পঞ্চাশ টাকার পানি কিনে মটকায় রেখেছিলাম, তখন অমুক পাগল প্রথমে তার নাপাকি লেগে থাকা আঙ্গুলকে ভালভাবে চাটল, এরপর সে নিজের আঙ্গুলকে আমার পানিতে ডুবিয়ে দিল, যার কারণে আমার পানি এখন অপবিত্র ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এজন্য আমাকে পাগলের মাল থেকে আমার পানির মূল্য দেওয়া হোক। তো এ অবস্থায় যে বিচারকের ফাতওয়া আলামগিরির এ মাসআলা পড়া আছে, তিনি একথা বলে মামলা খারিজ করে দিবেন যে, যখন বাদী নিজেই স্বীকার করছে যে, পাগল প্রথমে আঙ্গুল চেটে এর থেকে নাপাকি দূর করে ফেলেছে, তারপর পানিতে আঙ্গুল ডুবিয়েছে, তখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাগলের আঙ্গুলের কারণে পানি অপবিত্র হয়নি। কেননা যখন আঙ্গুল থেকে নাপাকি দূর করে দেওয়া হয়েছে তখন আঙ্গুলও আর অপবিত্র থাকেনি এবং এর কারণে পানিও অপবিত্র হয়নি।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরির ইবারতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহর পানাহ! নাপাকি চাটা জায়েয, অথবা এই নয় যে, ফিকহে হানাফিতে আঙ্গুল পবিত্র করার পদ্ধতি এটাই। এ নাপাক খেয়াল আপত্তি উত্থাপনকারীর নাপাক চিন্তাধারার ফসল। বরং ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে তো এপরিমাণ পবিত্রতাকে পছন্দ করা হয়েছে যে, যে সকল হালাল প্রাণী নাপাক খায় সেগুলোকে ধরে সাথে সাথে জবাই না করে, বরং কয়েক দিন আবদ্ধ রেখে পবিত্র খাবার খাইয়ে এরপর জবাই করে খেতে বলা হয়েছে, যাতে প্রাণী এ কয়েক দিন কোনো নাপাক না খাওয়ার কারণে তার গোশত নাপাকের রেশ থেকেও পবিত্র হয়ে যায়। এক্ষেত্রে উট হলে চল্লিশ দিন, গরু হলে বিশ দিন, মুরগি হলে তিন দিন এবং চড়ুই হলে এক দিন আটকে রাখবে।[১৫৭]

আর আপত্তি উত্থাপনকারী যে দুই আয়াত নকল করেছেন, হানাফিগণ এর উপর আমল করেন। এগুলো হানাফিগণের মতের বিপরীত নয়।

---

১৫৭. ফাতাওয়া আলমগিরী : ৫/২৯৮।

আপত্তি : নয়

মাতৃদুগ্ধ পানের সময়ের মাসআলা

ইসলাম ও মাতৃদুগ্ধ পানের সময়

আল্লাহ তায়ালা মাতৃদুগ্ধ পানের সময় দুই বছর নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

এবং মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে, যারা পরিপূর্ণভাবে দুধ পান করানোর ইচ্ছা করবে।[১৫৮]

ফিকহে হানাফি ও মাতৃদুগ্ধ পানের সময়

কিন্তু এক্ষেত্রেও হানাফিদের আল্লাহর হুকুম পছন্দ হয়নি। হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة.[১৫৯]

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে মাতৃদুগ্ধ পানের সময় হচ্ছে আড়াই বছর।[১৬০]

---

১৫৮. আল বাকারা : ২৩৩।

১৫৯. হেদায়া আওয়ালাইন : ৩৩০।

নবম আপত্তির জবাব

হানাফিগণের সহিহ মাযহাব, যার উপর আমাদের ফাতওয়া ও আমল, তা দুই বছরই।

১. ফিকহে হানাফির প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত কিতাব বেহেশতী জেওর, যা উর্দু ভাষায় লিখিত, তাতে আছে, দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ সময় দুই বছর, দুই বছরের পর দুধ পান করানো হারাম, কোনোভাবেই জায়েয নেই।[১৬১]

২. মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা মুহাম্মদ আলি সিদ্দিকি কান্ধলবী লেখেন, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, দুধ পানের পূর্ণ সময় হচ্ছে দুই বছর। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সমস্যা দেখা না দিবে, বাচ্চার হক হল এ সময়টা পূর্ণ করা। এর দ্বারাও জানা গেল যে, দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ হচ্ছে দুই বছর।[১৬২]

৩. ফাতওয়া দারুল উলুম দেওবন্দের সংকলক মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ যফিরুদ্দীন মিফতাহী লেখেন,

সন্তান প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ রয়েছে–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ

আর মায়েরা পূর্ণ দুই বছর নিজ নিজ বাচ্চাদের দুধ পান করাবে। এ সময় তাদের জন্য, যারা দুধ পানের বিষয়টিকে পূর্ণ করতে চায়। আর তার বাবার দায়িত্ব হচ্ছে এ মায়েদের নিয়ম মাফিক খাবার ও কাপড়ের ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সাধ্যের বাইরে হুকুম দেওয়া হয় না। কোনো মা যেন তার বাচ্চার কারণে কষ্ট না পায় এবং কোনো বাবাও যেন তার বাচ্চার কারণে কষ্ট না পায়। আর বাবা জীবিত না থাকার সুরতে এভাবেই তার প্রতিপালন করা তার মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব।[১৬৩]

---

১৬০. কিয়া ফিকহে হানাফিয়াহ কুরআন ও হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৪।

১৬১. বেহেশতি জেওর, চতুর্থ খণ্ড, দুধ পান করা বা করানো অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ২৯৫।

১৬২. তাফসিরে মাআলিমুল কুরআন : ২য় খণ্ড, ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৬৭৬।

১৬৩. আল বাকারা : ২৩৩।

মুফতি সাহেব এরপর হযরত থানবি রহ. থেকে এর তাফসির নকল করেছেন। তাতেও দুই বছরের কথাই উল্লেখ আছে।[১৬৪]

মুফতি সাহেবের এ উদ্ধৃতি থেকে জানা গেল, আমাদের হানাফিদের মত ও আমল কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ীই। যে আয়াতটি আপত্তি উত্থাপনকারী তার আপত্তিতে পেশ করেছেন, মুফতি সাহেব খোদ সেটিকে নিজের দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। এ কিতাবটি উর্দুতে লেখা এবং এটি বাচ্চাদের হকসমূহের ব্যাপারে লেখা হয়েছে।

(৪) মাওলানা মুজিবুল্লাহ নদবি হানাফি লেখেন,

মাতৃদুগ্ধ পানের সময় হচ্ছে দুই বছর। যেমনটি কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

মায়েরা তাদের বাচ্চাদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে। এ হুকুম তার জন্য, যে এটা পূর্ণ করতে চায়।[১৬৫]

মাওলানা মিনহাজুদ্দীন মিনাঈ লেখেন, দুধ পান করানোর বয়স দুই বছর। দুই বছরের বেশি দুধ পান করানো জায়েয নেই।[১৬৬]

৬. মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. বলেন, দুধ পান করানোর সময় হল দুই বছর, অধিক সহিহ ও ফাতওয়াপ্রদত্ত মতানুযায়ী।[১৬৭]

সম্মানিত পাঠক, এমন উদ্ধৃতি তো অনেক আছে, যা দ্বারা আমাদের মাযহাব দুই বছর হওয়াটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যারা মানে, তাদর জন্য এ উদ্ধৃতিগুলোই যথেষ্ট।

আপত্তি উত্থাপনকারী হিদায়ার যে ইবারত নকল করেছেন, এর বিশ্লষণ আমাদের দেওবন্দি আলেমগণ করে গেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল মুবিন (মির মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচি) ১৯৬-২০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

---

১৬৪. ইসলাম কা নিযামে তারবিয়াত : পৃষ্ঠা ৯০, প্রকাশনায় : মাকতাবায়ে রশীদিয়া।

১৬৫. ইসলামী ফিকহ : ২/১৪১।

১৬৬. ইসলামী ফিকহ মুকাম্মাল : ৩১৭।

১৬৭. তাযকিরাতুর রশীদ : ১/১৮৫।

আপত্তি দশ

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী (তালেবুর রহমান) লেখেন,

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ঈমানের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا

ফলে মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।[১৬৮]

এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা এমন বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

আর মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ পড়া হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।[১৬৯]

কিন্তু হানাফিরা আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টিকে সমর্থন করে না।

দেখুন, তাদের কিতাবে আছে, 'আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের ঈমান না বৃদ্ধি পায় এবং না হ্রাস পায়।'[১৭০]

---

১৬৮. তাওবা : ১২৪।

১৬৯. আল আনফাল : ২।

কুরআন মাজীদ থেকে নমুনা হিসাবে দশটি মাসআলা উল্লেখ করলাম, যেগুলোর মধ্যে হানাফিরা সুস্পষ্ট আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেদের ফিকহের উপর আমল করে।[১৭১]

দশম আপত্তির জবাব

এ আপত্তির দুটি উত্তর রয়েছে। একটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত, আরেকটা হচ্ছে বিস্তারিত। প্রথমে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হচ্ছে, এরপর বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হবে।

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলা ও হানাফিগণের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম সংক্ষিপ্ত জবাব

মূল মতবিরোধ হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে যে, ঈমান কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম না ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সামষ্টিক নাম? উল্লেখ্য, ঈমানের সংজ্ঞা কুরআন কারিমের কোনো আয়াত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নেই। এজন্য ফুকাহায়েকেরাম ও মুহাদ্দিসিনে এযাম নিজ নিজ ইজতেহাদের ভিত্তিতে ঈমানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন আর তারপর দলিলের আলোকে প্রত্যেকেই নিজের মতকে অগ্রগণ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও শাফিয়ি আলেমগণের মধ্য থেকে ইমাম গাযালি রহ. এর উস্তায আবুল মাআলী আবদুল মালিক আল জুওয়ানি রহ., যাকে ইমামুল হারামাইন বলা হয়, বলেন, ঈমান হচ্ছে শুধুই অন্তরের বিশ্বাসের নাম, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল ঈমানের মৌলিক অংশ নয়, (বরং ঈমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী অংশ)। এ জন্য ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধির যে কথা বলা হয়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের সৌন্দর্যে হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নয়। আর নেক আমলকারী হচ্ছে সৌন্দর্যের দিক থেকে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

---

১৭০. ফিকহুল আকবার উর্দু : পৃষ্ঠা ১৬।

১৭১. কিয়া ফিকহে হানাফি কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫।

কিন্তু ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারি রহ. এর মতে ঈমান অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এ সবের সামষ্টিক নাম এবং আমলের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আর এ তিনটাই হচ্ছে ঈমানের মৌলিক অংশ।

তাদের এ মতের উপর আপত্তি আসে যে, যদি অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এ তিনটার সামষ্টিক নাম ঈমান হয়ে থাকে তাহলে বুঝা যায়, এ তিন জিনিসের সবগুলো কারো মধ্যে পাওয়া গেলেই কেবল তাকে মুমিন বলা যাবে, অথচ সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কথা হচ্ছে, কোনো আমল করেনি, কিন্তু শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে, এমন ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, এবং এমন লোকদেরও, যারা কালেমা পড়ার পর কোনো আমলের সুযোগই পায়নি আর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তো এ আপত্তির উত্তরে এ হযরতগণ বাধ্য হয়ে একথা বলতে হয়েছে, যেমনটি আহলে হাদিস নেতা মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী এ মত পোষণকারীদের পক্ষ থেকে লিখেছেন, এমন ক্ষেত্রে আমল ছাড়াও জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।[১৭২]

এর থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূল ঈমান অন্তরের বিশ্বাসই।

এরপর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর পক্ষ থেকে দলিল হিসাবে কুরআন কারিমের ঐ সকল আয়াত ও সহিহ হাদিস পেশ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে ঈমানের জায়গা হিসাবে অন্তরের কথা বলা হয়েছে–

১. কুরআনে রয়েছে,

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ[১৭৩]

অর্থাৎ নিরুপায় ব্যক্তির অন্তর যখন ঈমানের উপর সুস্থির থাকে তখন সে বাহ্যিকভাবে কুফরের শব্দ উচ্চারণ করলেও ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না।

---

১৭২. ফাতওয়া সানাইয়া : ১/৩৮৯।

১৭৩. আন নাহল : ১০৬।

২. অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

(আর এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি)[১৭৪]

৩. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

ঐ সকল লোকেরা, যারা নিজেদের মুখে آمَنَّا 'আমরা ঈমান এনেছি' বলে, অথচ তাদের অন্তর মুমিন নয়।[১৭৫]

হাদিস নং (১) আর হাদিসের দলিলসমূহের মধ্যে জিবরাইল আ. এর হাদিসও রয়েছে। যার মধ্যে এসেছে যে, জিবরাঈল আ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঈমান কী? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث

(ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার সাথে সাক্ষাত এবং তার রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনবে)।[১৭৬]

এ হাদিসের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পরিচয় বলার সময় আমলের কোনো কথা উল্লেখ করেননি, বরং তিনি আমলের কথা ইসলামের ব্যাপারে কৃত প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করেছেন।

হাদিস নং (২) এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَه. তুমি কেন তার অন্তর চিরে দেখলে না যে, সে ঈমান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিল না মিথ্যাবাদী ছিল? এ সকল দলিল থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমানের স্থান হচ্ছে অন্তর।

---

১৭৪. সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৪।

১৭৫. সুরা মায়েদা, আয়াত ৪১।

১৭৬. বুখারী : ১/১২।

এরপর কুরআন কারিমের জায়গায় জায়গায় آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ বলা হয়েছে, ঈমান ও আমলের মাঝে حرف عطف আনা হয়েছে। আর عطف বিপরীত বুঝানোর জন্য আসে, এর থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান এক জিনিস আর আমল আরেক জিনিস।

যখন ঈমানের স্থান হল অন্তর আর অন্তরের মধ্যে বিশ্বাসের কাজটি হয়ে থাকে, স্বীকার করার কাজটি হয় না, তখন এ সকল আয়াত ও হাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঈমান মূলত অন্তরের বিশ্বাসেরই নাম এবং তা ঐ বিশ্বাসের নাম, যা দৃঢ়তা ও আস্থার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, আর তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না। এজন্য ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, যদি ঈমান বলে বিশ্বাস উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির স্তর বের করার প্রশ্নই আসে না।

আপত্তি উত্থাপনকারীর মিথ্যা দাবি

আপত্তি উত্থাপনকারী যে এ কথা বলেছেন, কুরআনের ফয়সালা হচ্ছে মানুষের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তার এ দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কুরআনে শুধু ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে, ঈমান হ্রাসের কথা কুরআনের কোথাও আসেনি। এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. কুরআনের বাহ্যিক বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করে শুধু ঈমান বৃদ্ধির পক্ষে মত দেন এবং ইমাম বুখারি রহ.ও ঈমান বৃদ্ধির ব্যাপারে শুধু ঐ সকল আয়াতের উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ঈমান বৃদ্ধির কথা রয়েছে, কিন্তু তিনি ঈমান হ্রাসের ব্যাপারে কোনো আয়াত উল্লেখ করেননি।

ঈমানের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার পক্ষে তো হানাফিগণও। এজন্য তাদের মতে ঈমানের সাথে যার আমলের অনু পরিমাণও ওযন হবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে, তাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার কাছে দরখাস্ত করবেন যে, পরওয়াদেগার! যারা শুধু কালেমায়ে তাওহিদ পড়েছে, আপনি জাহান্নাম থেকে তাদেরও বের করে আনার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন,

وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكِبْرِيَائِي وعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِله إلا الله[১৭৭]

আমার মর্যাদা, গৌরব, বড়ত্ব ও মহত্বের কসম, অবশ্যই আমি তাদের এ জাহান্নাম থেকে বের করব, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।

আর বুখারি শরিফের টীকায় রয়েছে যে, এক আল্লাহ্য় বিশ্বাসী হলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, যদিও তার কোনো নেকআমল না থাকে।[১৭৮]

এছাড়া মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৪/২৩৭ এর রেওয়ায়েত আছে,

فيقال ليس ذلك

যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালেমা পাঠকারীদের জাহান্নাম থেকে বের করার অনুমতি চাইবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এটা আপনার কাজ নয়, বরং এমন লোকদের আমি নিজে জাহান্নাম থেকে বের করব।

যখন মূল ঈমানের সাথে আমল যুক্ত হওয়ার কারণে আমল হিসাবে ঈমানের সৌন্দর্য ও কদর্যতা এবং শক্তি ও দুর্বলতার পক্ষে হানাফিগণের মত রয়েছে, তখন হানাফিগণের মতকে কুরআন-হাদিসের বিপরীত বলা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।

এই সম্পূর্ণ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, মূল ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধির মাসআলার ভিত্তি হল ঈমানের সংজ্ঞার উপর। যদি আপত্তি উত্থাপনকারী ও তার মতাদর্শী লোকেরা ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর মতকে কুরআন ও সুন্নাহ বিরেধী মনে করেন, তাহলে তাদের প্রথম কাজ তো হচ্ছে ঈমানের সংজ্ঞাকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ করা যে, কুরআন-সুন্নাহ্য় ঈমানের এ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আর ইমাম সাহেব এর বিপরীত সংজ্ঞা দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা করেছেন।

যদি আপত্তি উত্থাপনকারী কুরআন-সুন্নাহ থেকে ঈমানের সংজ্ঞাকে নিজের মতানুযায়ী প্রমাণ না করতে পারেন আর আমাদের দাবি হচ্ছে, তারা এটা

---

১৭৭. বুখারী : ২/১১১৮, ১১১৯, নির্বাচিত।

১৭৮. বুখারী : ২/১১১৯।

কখনও পারবে না, তাহলে নিজেদের মতের বিরোধীকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আখ্যা দেওয়াকে স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়া কী বলা যেতে পারে?

শরহে ফিকহে আকবরের এবারতের বিশ্লেষণ

শরহে ফিকহে আকবরে আছে, জমিন ও আসমানবাসীদের ঈমান সমান, এতে কম-বেশি হয় না। যদি আপত্তি উত্থাপনকারী এ এবারতের মর্ম কোনো একজন আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিতেন তাহলে নিজের অজ্ঞতা ধরা পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতেন। এতটুকু কথা তো যে কেউ জানে যে, প্রতিটি জিনিসের একটা সংজ্ঞা থাকে এবং এ সংজ্ঞা যতজনের মধ্যে যায় তাদের মধ্যে একসমানভাবে পাওয়া যায়। যেমন মাখলুক প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলা হয় যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জগতের সকল জিনিসই মাখলুক এবং জগতের সকল জিনিস মাখলুক হওয়ার দিক থেকে এক সমান (এটা হচ্ছে ব্যাপক কথা)। আর জগতের সকল জিনিস মাখলুক হওয়ার দিক থেকে সমান হলেও এগুলোর প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা স্তর রয়েছে। যেমন নবি তাঁকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিধানপ্রাপ্ত মাখলুকের পথনির্দেশের জন্য প্রেরীত হয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবুওয়াতী গুণের বিচারে সকল নবি এক সমান, তবে তাদের মধ্যে স্তরগত ভিন্নতা রয়েছে।

এমনিভাবে সকল মানুষ মানুষ হিসাবে এক সমান যে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই 'কথা বলতে সক্ষম, এমন প্রাণী' সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য, কিন্তু তাদের স্তর ভিন্ন ভিন্ন। এমনিভাবে ঈমানের সংজ্ঞা যখন এটা করা হয়েছে যে, ঈমান বলা হবে ঈমানের ঐ স্তরকে, যা দৃঢ়তা ও অবিচল আস্থার পর্যায়ে হয় এবং যাতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ ও সংশয়ও নেই, তখন যত মুমিন রয়েছে, চাই তারা আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম হোন বা ফেরেশতাগণ অথবা সাধারণ মুমিনগণ হোন তাদের সকলের মধ্যে ঈমানের এ সংজ্ঞাটি পাওয়া যাবে। তাই মূল ঈমানের মধ্যে এরা সবাই এক সমান। তবে তাদের স্তর ও মর্তবা ভিন্ন। এবং এরই বিশ্লেষণ মোল্লা আলি কারি রহ. করেছেন যে, যদি বিশ্বাস দৃঢ়তা ও অবিচল আস্থার পর্যায়ে না হয় তাহলে তা নিছক অনুমান ও সন্দেহর পর্যায়ে হয়, একে ঈমান বলা যায় না। এজন্য মূল

ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কুরআন ও হাদিসে হ্রাস-বৃদ্ধির যে সকল কথা এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমান শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়া। মূল ঈমানের মধ্যে এক সমান হওয়া সত্ত্বেও ঈমান শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার বিচারে সকলে সমান নয়, এজন্যই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে,

أَنَّ إِيْمَانَ أَحَادِ الْأُمَّةِ لَيْسَ كَإِيْمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا كَإِيْمَانِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْق رضي الله عنه.

নিঃসন্দেহে উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির ঈমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত হতে পারে না এবং আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানের মতও হতে পারে না।[১৭৯]

যদি আপত্তি উত্থাপনকারী এবং তার মতাদর্শীদের এ মতের সাথে বিরোধিতা থাকে, তাহলে তাদের কাছে প্রশ্ন, যে বিশ্বাস দৃঢ়তাসম্পন্ন ও অবিচল আস্থার পর্যায়ে না হয়, বরং তাতে কিছু সন্দেহ ও সংশয় থাকে, ঐ বিশ্বাসকে কি ঈমান বলা যাবে? আর মুমিনদের ঈমানের সে সকল স্তরের কথা বলা হয়, এগুলো কি বিশ্বাসের কম-বেশির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়? আমলের মধ্যে কম-বেশির উপর ভিত্তি করে কি মুমিনদের উপর হুকুম জারি করার ক্ষেত্রে ব্যবধান করা যেতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আপনারা আপনাদের বড়দের কিছু লেখাও দেখে নিন যে, তারা এ ব্যাপারে কী বলেন–

গায়রে মুকাল্লিদ হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ীর ফাতওয়া

ফাতাওয়া আহলে হাদিসে রয়েছে, একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, ঈমানের কম-বেশির আলোচনার সম্পর্ক আখেরাত দিবস এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা ঈমানের মধ্যে কম-বেশির ভিত্তিতে স্তরগত ব্যবধান করবেন। নচেৎ দুনিয়ায় কারো ঈমানের মধ্যে স্তরগত ব্যবধান হতে পারে না।

---

১৭৯. শরহে ফিকহে আকবার : ১০৫।

যে ব্যক্তিই ঈমান আনার বিষয়গুলোকে স্বীকার করে নিবে আমরা তাকে মুমিন বলব এবং তার উপর মুমিনদের বিধান জারি হবে, যতক্ষণ না সে কোনো স্পষ্ট কুফরি কাজে লিপ্ত হবে, উদাহরণত কোনো মূর্তিকে সেজদা করবে।[১৮০]

দ্বিতীয়ত বিস্তারিত জবাব

ঈমানের মধ্যে কম-বেশি হওয়ার প্রসঙ্গটি ঈমানের ব্যাখ্যার শাখাগত বিষয়। ইমাম সাহেব ফিকহে আকবরে লেখেন, وَالْإِيمَان هُوَ الْإِقْرَار والتصديق "অর্থাৎ ঈমান জবানের স্বীকারোক্তি ও অন্তরের বিশ্বাসের নাম। কুরআনের আয়াতের দিকে নজর দিলেও বুঝা যায় যে, আমল মূল ঈমানের অংশ নয়।

প্রথম আয়াত

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আর যে সকল লোক ঈমান আনে এবং নেক কাজ করে তারা জান্নাতী। তারা সর্বদাই জান্নাতে থাকবে।[১৮১]

এ আয়াতের অধীনে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি লেখেন,

وههنا مسائل (المسئلة الأولى) العمل الصالح خارج من مسمى الإيمان لأنه تعالى قال والذين آمنوا وعملوا الصلحات فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإيمان تكرار.

এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে, প্রথম মাসআলা এই যে, নেক আমল ঈমান নামের বাইরে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, والذين آمنوا وعملوا الصلحات (আর যারা ঈমান এনেছে ও নেকআমল করেছে) সুতরাং যদি ঈমান শব্দ নেক আমলকেও বুঝায় তাহলে ঈমানের পর নেক আমলের উল্লেখ তাকরার হবে।

---

১৮০. ফাতাওয়া আহলে হাদিস : ৯/৮৭, কিতাবুল ঈমান।

১৮১. সুরা বাকারা, আয়াত ৮২।

দ্বিতীয় আয়াত

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

যদি মুমিনদের দুটি দল পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও।[১৮২]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা লড়াই করা সত্ত্বেও উভয় দলকে মুমিন বলেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, নেক আমল ছেড়ে দিলে মুমিন ঈমান থেকে বেরিয়ে যায় না।

আল্লামা আইনি লেখেন,

ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشيئ بضد جزءه.

অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি এ আয়াত থেকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো একটা জিনিস তার বিপরীত জিনিসের সাথে একত্র হয় না।[১৮৩]

তৃতীয় আয়াত

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

যে সকল লোকেরা ঈমান রাখে এবং তাদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, এমন লোকদের জন্যই নিরাপত্তা এবং এরাই হেদায়েতের পথে চলছে।[১৮৪]

আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

قَوْله تَعَالَى {الَّذين آمنُوا وَلم يلبسوا إِيمَانهم بظُلْم} أَي لم يخلطوه بارتكاب الْمُحرمَات وَلَو كَانَت الطَّاعَة دَاخِلَة فِي الْإِيمَان لَكَانَ الظُّلم منفيا عَن الْإِيمَان لِأَن ضد جُزْء الشَّيْء يكون منفيا عَنهُ وَإِلَّا يلْزم اجْتِمَاع الضدين فَيكون عطف الاجتناب مِنْهَا عَلَيْهِ تكْرَارا بِلَا فَائِدَة

---

১৮২. সুরা হুজুরাত, আয়াত ৯।

১৮৩. উমদাতুল কারী, প্রথম খণ্ড : পৃষ্ঠা ১২৫।

১৮৪. সুরা আনআম, আয়াত ৮২।

অর্থাৎ তারা ঈমানকে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার সাথে মেশায়নি। যদি নেক কাজ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে জুলুম ঈমান থেকে ভিন্ন জিনিস হবে, কেননা কোনো জিনিসের অংশের বিপরীত জিনিস ঐ জিনিস থেকে ভিন্ন হয়, নচেৎ দুটি বিপরীত জিনিস মিলিত হওয়া আবশ্যক হবে। এক্ষত্রে হারাম থেকে বেঁচে থাকার عطف ঈমানের উপর অনর্থক তাকরার হবে।

চতুর্থ আয়াত

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অতঃপর মুমিন অবস্থায় যারাই নেক আমল করবে, তাদের প্রচেষ্টার অবমূল্যায়ন করা হবে না। আমরা তো একে লিপিবদ্ধকারী।[১৮৫]

এ আয়াতে আমল সহিহ হওয়ার জন্য ঈমানকে শর্ত করা হয়েছে। আর কোনো জিনিসের শর্ত ঐ জিনিসের মূল সত্তার বাইরে থাকে। তাই এর দ্বারা নেক আমলও মূল ঈমান থেকে বাইরে থাকা প্রমাণিত হয়।

পঞ্চম আয়াত

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।[১৮৬]

ষষ্ঠ আয়াত

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন নামায কায়েম রাখে এবং আমি তাদের যা কিছু দিয়ে রেখেছি, তার মধ্য থেকে কিছু না কিছু গোপনে

---

১৮৫ সুরা আমবিয়া, আয়াত ৯৪।

১৮৬. সুরা বাকারা, আয়াত ১৮৩।

ও প্রকাশ্যে খরচ করতে থাকে ঐ দিন আসার পূর্বে, যেদিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে এবং না বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা চলবে।[১৮৭]

সপ্তম আয়াত

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন নিজেদের হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, নিজেদের মাথাগুলোকে মাসেহ কর এবং নিজেদের পাগুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।[১৮৮]

এই তিনটি আয়াতের মধ্যেই আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের প্রথমে ঈমানের কথা বলে সম্বোধন করেছেন। এরপর আমলের হুকুম দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, আমলের ঈমানের বাইরের জিনিস, নচেৎ মেনে নেওয়া বিধানকে মানার আদেশ করা আবশ্যক হবে। আল্লামা আইনি এমনটা বলেছেন।

অষ্টম আয়াত

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সামনে সত্যিকার খাঁটি তাওবা কর।[১৮৯]

নবম আয়াত

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুসলমানগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে তাওবা কর, যাতে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাও।[১৯০]

---

১৮৭. সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩১।

১৮৮. সুরা মায়েদা, আয়াত ৬।

১৮৯. সুরা তাহরিম, আয়াত ৮।

১৯০. সুরা নূর, আয়াত ৩১।

আল্লামা আইনি লেখেন,

وَهَذَا يدل على صِحَة اجْتِمَاع الْإِيمَان مَعَ الْمعْصِيَة لِأَن التَّوْبَة لَا تكون إِلَّا من الْمعْصِيَة وَالشَّيْء لَا يجْتَمع مَعَ ضد جزئه.

অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান ও গুনাহ একত্র হতে পারে। কেননা তাওবা গুনাহের থেকেই হয়ে থাকে। আর কোনো জিনিস তার অংশের বিপরীত জিনিসের সাথে একত্র হয় না।

দশম আয়াত

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوۡلُ لَا يَحۡزُنۡكَ الَّذِيۡنَ يُسَارِعُوۡنَ فِى الۡكُفۡرِ مِنَ الَّذِيۡنَ قَالُوۡۤا اٰمَنَّا بِاَفۡوَاهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِنۡ قُلُوۡبُهُمۡ

হে রাসুল! আপনাকে যেন ঐ সকল লোকেরা দুঃখিত না করে, যারা কুফরীর দিকে ধাবিত হচ্ছে, চাই তারা ঐ মুনাফেকদের থেকে হোক, যারা মুখে তো ঈমানের দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে তাদের অন্তর ঈমানদার নয়।[১৯১]

এ আয়াতে ঈমানকে অন্তরের কাজ বলা হয়েছে।

একাদশ আয়াত

مَنۡ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِهٖۤ اِلَّا مَنۡ اُكۡرِهَ وَقَلۡبُهٗ مُطۡمَئِنٌّۢ بِالۡاِيۡمَانِ

যে ব্যক্তি ঈমানের পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তবে তার কথা ভিন্ন যাকে জবরদস্তি করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানের উপর সুস্থির রয়েছে।[১৯২]

দ্বাদশ আয়াত

قَالَتِ الۡاَعۡرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا وَلٰـكِنۡ قُوۡلُوۡۤا اَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ الۡاِيۡمَانُ فِىۡ قُلُوۡبِكُمۡ

---

১৯১. সুরা মায়েদা, আয়াত ৪১।

১৯২. সুরা নাহল, আয়াত ১০৬।

গ্রাম্য লোকেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলে দাও, বাস্তবে তোমরা ঈমান আননি। তবে তোমরা এমন বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি (বিরোধিতা ছেড়ে অনুগত হয়ে গেছি)। তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি।[১৯৩]

ত্রয়োদশ আয়াত

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

এরাই সে সকল লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান রেখে দিয়েছেন এবং যাদের তিনি নিজের রুহের মাধ্যমে শক্তি যুগিয়েছেন।[১৯৪]

এ সকল আয়াতের মধ্যে ঈমানের স্থান অন্তরকে বলা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঈমান অন্তরের বিশ্বাসের নাম। এই অন্তরের বিশ্বাসের ব্যাপারেই ইমাম সাহেব বলেন যে, পরিমাণগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই। তিনি কিতাবুল ওসিয়্যতের মধ্যে বলেন,

ثم الإيمان لا يزيد و لا ينقص لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر و لا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر فكيف يجوز أن يكون الشخص مؤمنا وكافرا

(শরহে ফিকহে আকবার লি আলী আল কারী, লাহোর থেকে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৯৯)

ঈমান না বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস পায়। কারণ ঈমান তখনই বৃদ্ধি পাবে, যখন কুফর হ্রাস পাবে। আর ঈমান তখন হ্রাস পাবে যখন কুফর বৃদ্ধি পাবে। তাহলে এটা কেমন করে হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি একই সময়ে মুসলমানও হবে আবার কাফেরও হবে।

---

১৯৩. সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৪।

১৯৪. সুরা মুজাদালাহ, আয়াত ২২।

এখন আমরা ঐ সকল আয়াত উল্লেখ করব, যেগুলোর মধ্যে ঈমান বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে–

প্রথম আয়াত

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ

তিনিই সেই সত্তা, যিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়।[১৯৫]

এ আয়াতের অধীনে তাফসিরে রুহুল বয়ানে রয়েছে–

ای يقينا متضما الى يقينهم الذي هم عليه بر سوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها ومن ثمه قال عليه السلام لو وزن ايمان ابى بكر مع الثقلين لرجح وكلمة مع فى ايمانهم ليست على حقيقتها لان الواقع فى الحقيقة ليس انضمام يقين الى يقين لامتناع اجتماع المثلين بل حصول نوع يقين أقوى من الاول فان له مراتب لا تحصى من اجلى البديهيات الى أخفى النظريات ثم لا ينفى الاول ما قلنا وذلك كما فى مراتب البياض ما حقق فى مقامه ففيها استعارة او المعنى أنزل فيها السكون الى ما جاء به النبي عليه السلام من الشرائع ليزدادوا ايمانا بها مقرونا مع ايمانهم بالوحدانية واليوم الآخر فكلمة القرآن على حقيقتها والقرآن فى الحقيقة لتعلق الايمان بزيادة متعلقه فلا يلزم اجتماع المثلين وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان أول ما أتاهم به النبي عليه السلام التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم الحج والجهاد حتى أكمل لهم دينهم كما قال اليوم أكملت لكم دينكم فازدادوا ايمانا مع ايمانهم فكان الايمان يزيد فى ذلك الزمان بزيادة الشرائع والاحكام واما

---

১৯৫. সুরা ফাতহ, আয়াত ৪।

الآن فلا يزيد ولا ينقص بل يزيد نوره ويقوى بكثرة الأعمال وقوة الأحوال فهو كالجوهر الفرد فكما لا يتصور الزيادة والنقصان فى الجوهر الفرد من حيث هو فكذا فى الايمان

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের অন্তরে দৃঢ়তা ও প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে আকিদাগত দৃঢ়তা ও আত্মিক প্রশান্তির কারণে তাদের পূর্বের বিশ্বাসের সাথে আরও বিশ্বাস অর্জিত হয়। এ কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমানকে জিন ও মানুষের ঈমানের সাথে ওজন করা করা হয় তাহলে তার ঈমানই ভারি হয়ে যাবে। আর مَعَ إِيمَانِهِمْ এর মধ্যে مَعَ শব্দটি এর প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা বিশ্বাসের সাথে আরেকটি বিশ্বাস একাত্ম হতে পারে না। কারণ হুবহু দুই জিনিস এক হতে পারে না। বরং এখানে বিশ্বাসের এক প্রকারের পরিবর্তে আরেকটি প্রকার হাসিল হচ্ছে, যা পূর্বেরটার চেয়ে শক্তিশালী। কেননা বিশ্বাসের স্তর أجلى البديهيات থেকে নিয়ে أخفى النظريات পর্যন্ত অগণিত পরিমাণে রয়েছে। এরপর আমাদের একথা প্রথম কথার বিপরীত নয়, আর এটা তেমনি, যেমন بياض এর স্তরসমূহ, যার বিশ্লেষণ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কিতাবাদিতে আছে। তাই আয়াতের এ কথার মধ্যে استعارة রয়েছে। অথবা এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা শরিয়ত ও বিধানসমূহের সাথে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করে দিয়েছেন, যাতে তারা একাত্ববাদ ও আখেরাত দিবসের ঈমানের উপর এ শরিয়তগুলোকে বৃদ্ধি করে নেয়। এ অবস্থায় কুরআনের শব্দ তার প্রকৃত অর্থে বহাল থাকবে এবং কুরআন তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা এ সুরতে ঈমানের সম্পর্ক তার সম্পৃক্ত জিনিসের অতিরিক্ত অংশের সাথে হবে, ফলে হুবহু দুটি জিনিসের একাত্ম হওয়া আবশ্যক হবে না।

আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে যা নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল তাওহিদ, এরপর তিনি নিয়ে এসেছেন নামায ও রোযা, এরপর হজ ও জিহাদ, এভাবে পর্যায়ক্রমে তিনি দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। যেমনটি

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ। তাই তিনি ঈমানের সাথে ঈমানকে বৃদ্ধি করেছেন। এজন্য সে যুগে শরিয়ত ও বিধানসমূহের বৃদ্ধির সাথে সাথে ঈমানও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এখন না বৃদ্ধি পায় এবং না হ্রাস পায়। বরং এর নুর বৃদ্ধি পায় আর তা অধিক পরিমাণে আমল এবং অবস্থাগত শক্তির সাহায্যে শক্তিশালী হয়। সুতরাং এটা جوہر فرد এর মত। جوہر فرد এর মধ্যে যেমন তার সত্তা হিসাবে হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে ঈমানের মধ্যেও তার মূল সত্তা হিসাবে হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয় আয়াত

وَ مَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۪ وَّ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا

আমরা দোযখের দারোগা কেবল ফেরেশতাদেরই রেখেছি এবং আমরা তাদের সংখ্যা কেবল কাফেরদের পরীক্ষার জন্যই নির্ধারণ করেছি, যাতে আহলে কিতাবরা বিশ্বাস করে নেয় এবং ঈমানদারদের ঈমানে বৃদ্ধি ঘটে।[১৯৬]

ইমাম ইসমাইলী হাক্কী এ আয়াতের তাফসিরে লেখেন,

ای یزداد إیمانهم کیفیة بما رأوا من تسلیم اهل الكتاب وتصديقهم انه كذلك او كمية بانضمام ايمانهم بذلك الى ايمانهم بسائر ما انزل[১৯৭]

অর্থাৎ মুমিনদের ঈমান আহলে কিতাবের স্বীকৃতি ও সত্যায়ন দেখে অবস্থাগত দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পায়, অথবা পরিমাণের দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যায় এভাবে যে, ফেরেশতাদের এ সংখ্যার সাথে সাথে অবশিষ্ট বিধান ও শরিয়তের উপরও ঈমান এনে ফেলে।

---

১৯৬. সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৩১।

১৯৭. তাফসীরে রুহুল বয়ান।

তৃতীয় আয়াত

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

ঐ সকল লোক, যাদের লোকেরা যখন বলল, কাফেররা তোমাদের মোকাবেলায় সৈন্যদের সমবেত করে ফেলেছে, তোমরা তাদের ভয় কর, তখন এ কথা তাদের ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটায় এবং তারা বলতে থাকে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর কার্যনির্বাহী হিসাবে তিনি অতি উত্তম।[১৯৮]

এ আয়াতেও ঈমানের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন রুহুল বয়ানে আছে–

والمعنى لم يلتفتوا الى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله وازداد اطمئنانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية

উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা কাফেরদের এসকল অপতৎপরতা সম্পর্কে মানুষের কথার কোনো পরোয়া করেনি, বরং এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে এবং তাদের প্রশান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে আর তারা ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছে এবং নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে।[১৯৯]

চতুর্থ আয়াত

وَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

আর যখন কোনো সুরা নাযিল করা হয় তখন মুনাফেকদের কেউ কেউ বলে যে, এ সুরা তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং যারা ঈমানদার, এ সুরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে।[২০০]

---

১৯৮. সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩।

১৯৯. খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৪।

২০০. সুরা তাওবা, আয়াত ১২৪।

রুহুল বয়ানে فَزَادَتْهُمْ إِيماناً এর অধীনে আলোচনা করা হয়েছে–

هذا بحسب المتعلق وهو مخصوص بزمان النبي عليه السلام واما الآن فالمذهب على الايمان لا يزيد ولا ينقص وانما تتفاوت درجاته قوة وضعفا فانه ليس من يعرف الشيء اجمالا كمن يعرفه تفصيلا كما ان من رأى الشيء من بعيد ليس كمن يراه من قريب

অর্থাৎ এ বৃদ্ধি ঈমানের সাথে যুক্ত ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আর এটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানার সাথে নির্দিষ্ট একটি বিষয়। কিন্তু এখনকার মাযহাব হচ্ছে, ঈমান না বৃদ্ধি পায় এবং না হ্রাস পায়। হ্যাঁ, তবে ঈমানের স্তর শক্তি ও দুর্বলতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন হয়। কেননা কেউ যদি কোনো বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে জানে, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির সমান নয়, যে ঐ জিনিসটিকে সবিস্তারে জানে। যেমন– যে ব্যক্তি একটা জিনিসকে দূর থেকে দেখেছে, সে ঐ ব্যক্তির সমান নয়, যে কাছে থেকে দেখেছে।[২০১]

পঞ্চম আয়াত

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

এ আয়াতেও ঈমান বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য অবস্থাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া।[২০২]

ষষ্ঠ আয়াত

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

---

২০১. খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৭।
২০২. সুরা আহযাব, আয়াত ২২।

ঈমানদাররা তো এমন হয় যে, যখন আল্লাহর স্মরণ করা হয় তখন তাদের অন্তরগুলো ভীত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয় তখন ঐ সকল আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দেয় এবং এ সকল লোকেরা আল্লাহর উপর ভরসা করে।[২০৩]

আল্লামা আলি কারি রহ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا এর সম্পর্কে লেখেন,

فمعناه إيقانا أو مؤول بأن المراد زيادة الإيمان بزيادة نزول المؤمن به أي القرآن.

অর্থাৎ ঈমান বৃদ্ধির অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া। অথবা এর ব্যাখ্যা এভাবে করা হবে যে, এর দ্বারা مؤمن به অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া উদ্দেশ্য।[২০৪]

ইমাম ফখর রাযী রহ. লেখেন,

وَقَوْلُهُ: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيماناً مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كُلَّمَا سَمِعُوا آيَةً جَدِيدَةً أَتَوْا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِي الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ[٢٠٥]

অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হল, যখন তারা কোনো নতুন আয়াত শুনল তখন একটি নতুন স্বীকারোক্তি দিল। ফলে এতে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে বৃদ্ধি ঘটল।

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে যদি ঈমান বৃদ্ধি পাওয়াকে এর প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এ বৃদ্ধি পাওয়া ঈমান যেসব জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর বৃদ্ধি পাওয়া হিসাবে হবে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সাথে নির্দিষ্ট হবে। আর যদি একে রূপক অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে এ বৃদ্ধি পাওয়া অবস্থাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলে সাব্যস্ত হবে। ইমাম সাহেব কোথাও এ ধরনের বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি। তার উদ্দেশ্য তো এটাই যে, আমাদের সত্তাগত ও পরিমাণগত

---

২০৩. সুরা আনফাল, আয়াত ২।

২০৪. শরহে ফিকহে আকবর : পৃষ্ঠা ১০০।

২০৫. তাফসীরে কাবীর : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১২।

(সংখ্যাগত) দিক থেকে আমাদের ঈমান না বৃদ্ধি পায় এবং না হ্রাস পায়। আর তার এ কথা কুরআনের কোনো আয়াত বিরোধী নয়।

শরহে মাওয়াকেফে এর মাতেন (মূল পাঠ রচয়িতা) এর কথা الأول القوة الضعف এর উপর একজন টীকাকার কত সুন্দর কথা লিখেছেন–

قيل هذا مسلم لكن لا طائل تحته إذ النزاع إنما هو في تفاوت الإيمان بحسب الكمية أعني القلة والكثرة فإن الزيادة أكثر ما يستعمل فى الإعداد وأما التفاوت فى الكيفية أعني القوة والضعف فخارج عن محل النزاع.[206]

বলা হয়েছে যে, এ বিষয়টি (অর্থাৎ বিশ্বাসের হ্রাস-বৃদ্ধি শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে) স্বীকৃত। কিন্তু এতে কোনো ফায়দা নেই। কারণ বিতর্ক তো হচ্ছে এ ব্যাপারে যে, ঈমান কি এর সত্তাগত ও পরিমাণগত (সংখ্যাগত) দিক থেকে ব্যবধানপূর্ণ হয়? কেননা زيادة (বৃদ্ধি পাওয়া) শব্দটি বেশিরভাগ সংখ্যাগত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর অবস্থাগত দিক থেকে ঈমানের মধ্যে ব্যবধান হওয়া, অর্থাৎ দুর্বল ও শক্তিশালী হওয়া, তো এটা কোনো বিতর্কের বিষয়ই নয়।

আল্লামা আলি আল কারি শরহে ফিকহে আকবর পৃষ্ঠা ৯৫ এ লেখেন,

فالتحقيق أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة اليقين فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين كما أشار إليه سبحانه بقوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فإن مرتبة عن اليقين فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس الخبر كالمعاينة.

অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক কথা এটাই যে, ঈমান যেমনটা ইমাম রাযি বলেছেন মূল বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধিকে কবুল করে না, তবে দৃঢ়তার দিক থেকে কবুল করে। কেননা দৃঢ়তার অধিকারীদের স্তর পূর্ণাঙ্গ দীনের

---

২০৬. শরহে মাওয়াকিফ, ইসতামবুল থেকে মুদ্রিত, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৫২।

ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আর যখন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম বললেন, হে আমার পরওয়ার দেগার, আপনি আমাকে দেখান, কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করেন। আল্লাহ ইরশাদ করলেন, তুমি কি ঈমান আননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই। কিন্তু এজন্য, যাতে আমার অন্তর প্রশান্ত হয়। কারণ চাক্ষুসভাবে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস ইলমের মাধ্যমে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্ন হয়। এজন্য বলা হয়, শ্রবণকৃত বিষয় চোখে দেখা বিষয়ের মত নয়।

মুহাদ্দিসগণ ঈমানের তাফসিরে যে এমন কথা লিখেছেন, وهو قول وفعل ويزيد وينقص (ঈমান হচ্ছে কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে) এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমান, যার মধ্যে নেকআমলও রয়েছে।

আল্লামা আইনি রহ. লেখেন,

وَقَالَ الإِمَام هَذَا الْبَحْث لَفْظِي لِأَن المُرَاد بِالْإِيمَان إِن كَانَ هُوَ التَّصْدِيق فَلَا يقبلهما وَإِن كَانَ الطَّاعَات فيقبلهما ثمَّ قَالَ الطَّاعَات مكملة للتصديق فَكل مَا قَامَ من الدَّلِيل على أَن الْإِيمَان لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان كَانَ مصروفا إِلَى أصل الْإِيمَان الَّذِي هُوَ التَّصْدِيق وكل مَا دلّ على كَون الْإِيمَان يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى الْكَامِل وَهُوَ مقرون بِالْعَمَلِ

অর্থাৎ ইমাম রহ. বলেছেন, এ বিতর্ক বাহ্যিক। কেননা যদি ঈমান দ্বারা বিশ্বাস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা তো হ্রাস-বৃদ্ধিকে কবুল করে না। আর যদি ঈমান দ্বারা নেকআমল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা হ্রাস-বৃদ্ধিকে কবুল করবে। এরপর ইমাম রহ. বলেছেন, নেকআমল বিশ্বাসকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে। সুতরাং এ সংক্রান্ত প্রতিটি দলিল, যা একথা প্রমাণ করে যে, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধিকে কবুল করে না, আসল ঈমান অর্থাৎ মূল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং প্রতিটি দলিল, যা একথা প্রমাণ করে যে, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধিকে কবুল করে, তা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর পূর্ণাঙ্গ ঈমান তাই, যাতে আমল যুক্ত থাকে।[২০৭]

---

২০৭. উমদাতুল কারী : ১/১২৭।

নোট : আপত্তি উত্থাপনকারী তার কিতাব (কিয়া ফিকহে হানাফিয়াহ কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায়) এর ২৩ পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে ৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ঐ দশটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যা তার মতে কুরআনে পাকের সুস্পষ্ট বিরোধী। আমরা সেগুলোর জবাব দিয়ে দিয়েছি। এরপর ৩৫ পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে ৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি ঐ দশটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, যা তার মতে বুখারি শরিফের বিরোধী। সম্মানিত পাঠক, ধারাবাহিকভাবে এবার এ সকল আপত্তিরও বাস্তবতা জেনে নিন। আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন, আসুন, এবার বুখারি শরিফের ঐ সকল হাদিসের দিকে নজর দেই, যেগুলোর উপর আমল করা হানাফিদের পছন্দ নয়। বরং তারা এগুলোর বিপরীতে তাদের ইমামদের মতকে প্রাধান্য দেয়।

আপত্তি : এগারো

ফজর ও আসরের মধ্যখানে সূর্যের উদয় ও অস্তের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

হাদিসের অর্ধেক অংশ গ্রহণ ও অর্ধেক বর্জন

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত পড়ে নিতে পারে, তাহলে সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। এমনিভাবে যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পড়ে নিতে পারে, তাহলে সে যেন তার নামায পূর্ণ করে নেয়।[২০৮]

---

২০৮. বুখারী, হাদিস নং ৫৫৬।

এখন হানাফিরা বুখারির এ হাদিসের একাংশের উপর আমল করে আর অন্য অংশকে প্রত্যাখ্যান করে। যেমনটা ইমাম যায়লায়ী হানাফি রহ. নাসবুর রায়াহ এর মধ্যে লেখেন,

وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عن مذهبنا فى القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس.

সহিহ হাদিসসমূহ আমাদের মাযহাবের মতটির ক্ষেত্রে আপত্তি সৃষ্টি করছে যে, যদি ফজরের নামাযের মধ্যখানে সূর্য উদিত হয়ে যায় তাহলে এমন সুরতে আদায়রত নামায বাতিল হয়ে যায়।[২০৯]

নামাযের মধ্যখানে সূর্য উদিত হওয়ার কারণে ফজরের বাতিল হওয়ার ফাতওয়া আহসানুল ফাতাওয়া ২/১৩১, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ : ৪/৪৭, ইরশাদুল কারী : ১/৪১২ এর মধ্যেও রয়েছে।[২১০]

একাদশ আপত্তির জবাব

এ আপত্তিটি আপত্তি উত্থাপনকারী শাময়ে মুহাম্মদী থেকে উদ্ধৃত করেছেন আর জুনাগড়ী এটি যফরুল মুবিন থেকে চুরি করেছেন। আমরা ফাতহুল মুবিন ফি কাশফি মাকাইদি গায়রিল মুকাল্লিদীন : পৃষ্ঠা ৬৭-৭২ থেকে আপত্তিটি এবং এর পূর্ণ জবাব উদ্ধৃত করছি–

আপত্তি : ইমাম আবু হানিফার আরেকটি মাসআলা পয়গামবর আলাইহিস সালাম-এর হাদিস বিরোধী, যা হিদায়া, শরহে বেকায়া, কানযুদ দাকাইক, রদ্দুল মুহতার শরহে দুররুল মুখতার, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী এবং ফাতাওয়া কাযি খানে আছে :

و لا صلوة جنازة لما روينا و لا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلوة إلا عصر يومه عند الغروب.

---

২০৯. নাসবুর রায়াহ : ১/২২৯।

২১০. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৫,৩৬।

অর্থাৎ সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় এবং যে সময় ঠিক দ্বিপ্রহর হবে তখন নামায, সেজদায়ে তেলাওয়াত এবং জানাযার নামায জায়েয নেই। তবে সূর্যাস্তের সময় শুধু ঐ দিনের আসরের নামায জায়েয আছে।

জবাব : এ হাদিসের ব্যাখ্যা ইমাম নববি শরহে মুসলিমে লেখেন,

إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمعمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة

অর্থাৎ যখন এমন কোনো ব্যক্তি, যার উপর নামায ওয়াজিব হয়নি, কোনো নামাযের এক রাকাত পরিমাণ সময় থাকতে তার উপর নামায ওয়াজিব হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তির জন্য ঐ নামায আদায় করা আবশ্যক হবে। আর এমনটা ঘটতে পারে শিশুর ক্ষেত্রে, যখন সে বালেগ হবে, পাগল ও অচেতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যখন তারা চেতনা ফিরে পাবে, হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে, যখন তারা এগুলো থেকে পবিত্র হবে এবং কাফেরের ক্ষেত্রে, যখন সে মুসলমান হবে। সুতরাং এদের থেকে যে কেউ কোনো নামাযের সময় শেষ হওয়ার পূর্বে এক রাকাত পরিমাণ সময় পাবে তার উপর ঐ নামায আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

অর্থাৎ এ হুকুম কাফের ও অন্যদের ব্যাপারে যে, এমন সময় মুসলমান হল অথবা বালেগ হল যে, এক রাকাত পরিমাণ সময় বাকি আছে, তাহলে এ সুরতে তার উপর নামায ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তার জন্য পূর্ণ নামায আদায় করা আবশ্যক হবে। অথবা এ হাদিসের অর্থ এমন হবে, যেমনটি শরহে মুসলিমে আছে,

إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا فضيلة الجماعة بلا خلاف.

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি জামাতে পরে শামিল হয়ে ইমামের সাথে এক রাকাত পায়, তাহলে সে সকলের মতেই জামাতের ফযিলত পেয়ে যাবে।

উদ্দেশ্য হল, অথবা এ হাদিসকে জামাতের ফযিলত পাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে যে, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এক রাকাত নামাযও পেল সে পূর্ণ নামায জামাতের সাথে আদায় করার ফযিলত পেয়ে গেল। যদি এ হাদিসের এ অর্থই নেওয়া হয় যে, সূর্যোদয়ের সময়েও নামায পড়া চাই, তাহলে এ অর্থ অন্য একটি হাদিস, যা মুসলিম শরিফে এসেছে, এর বিপরীত হয়ে যাবে। হাদিসটি এই–

ووقت صلوة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلوة فإنها تطلع بين قرني الشيطن.

অর্থাৎ ফজরের নামাযের সময় সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার সময় তুমি নামায থেকে বিরত থাক, কারণ তা শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে উদিত হয়ে থাকে।

ইমাম মুসলিম ও অন্যদের অন্য একটি হাদিস, যা উকবা ইবনে আমেরের সূত্রে ফাতহুল কাদিরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে,

«ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» وهو إنما يفيد عدم الحل في جنس الصلاة دون عدم الصحة في بعضها بخصوصه. والمفيد لها إنما هو قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، وإذا غربت فارقها، ونهى عن الصلاة في تلك الساعات» رواه مالك في الموطأ والنسائي،

অর্থাৎ তিন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়তে ও লাশ দাফন করতে নিষেধ করতেন। প্রথম হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার সময়, যতক্ষণ না তা উপরে উঠে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিপ্রহরের

সময়, যতক্ষণ না সূর্য ঢলে যায়। তৃতীয় হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়ার জন্য হেলে পড়ার সময়, যতক্ষণ না তা পরিপূর্ণ অস্ত যায়। এ হাদিস এ কথা প্রমাণ করে যে, যে কোনো প্রকার নামাযই এ সময়গুলোতে জায়েয হবে না। এমন নয় যে, কিছু বিশেষ নামাযই কেবল এ সময়গুলোতে নিষিদ্ধ। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ইরশাদ এ কথাও প্রমাণ করে যে, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে উদিত হয়। অতঃপর যখন সূর্য উর্ধ্বাকাশে ওঠে যায়, তখন শয়তান এর থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর যখন সূর্য বরাবর মাথার উপরে চলে আসে তখন শয়তান আবার তার কাছে ঘনিয়ে আসে এবং ঢলে যাওয়ার পর আবার তার থেকে দূরে চলে যায়। এরপর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন শয়তান আবার তার কাছে চলে আসে এবং অস্ত হয়ে গেলে তার থেকে দূরে চলে যায়। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়গুলোতে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[২১১]

আর এ সকল হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ হাদিসের পরে বলেছেন। আল্লামা আইনি হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

وقال الحاوي ورود هذا الحديث أي حديث من أدرك كان قبل نهيه عليه السلام من الصلوة فى الأوقات المكروهة.

অর্থাৎ ইমাম তহাবি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি অর্থাৎ من أدرك হাদিসটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকরুহ সময়গুলোতে নামায নিষিদ্ধ করার পূর্বেকার।

এজন্য ইমাম তহাবি রহ. এ হাদিসটি রহিত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। রদ্দুল মুহতারে আছে,

إلا أن الإمام الطحاوي قال الحديث منسوخ بالنصوص الناهية وادعى أن العصر يبطل أيضا كالفجر.

২১১. মুয়াত্তা মালেক, নাসায়ি।

অর্থাৎ তবে ইমাম তহাবি রহ. বলেছেন, এ হাদিসটি নিষেধাজ্ঞামূলক নসসমূহের কারণে রহিত হয়ে গেছে। এবং তিনি দাবি করেছেন, আসর নামাযও ফজরের নামাযের মত বাতিল হয়ে যাবে।

বুরহান শরহে মাওয়াহিবুর রহমানে আছে,

وزاد الطحاوي مخالفا للإمام وصاحبيه عدم جواز عصر يومه كالفجر وسائر الواجبات مدعيا انتساخ كلها بالنصوص الناهية وإلا يلزم العمل ببعض الحديث وترك بعضه.

অর্থাৎ ইমাম তহাবি এক্ষেত্রে ইমাম আযম ও সাহেবাইনের বিরোধিতা করে আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন, ঐ দিনের ফজরের নামায ও অন্যান্য ওয়াজিব নামাযের মত আসরের নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। তিনি একথাটি তার এই দাবির উপর ভিত্তি করে বলেছেন, এ দুই সময়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রদানমূলক যত হাদিস রয়েছে, এগুলো এ দুই সময়ে নামায পড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞামূলক হাদিসমূহের কারণে রহিত হয়ে গেছে। এভাবে বিবেচনা না করলে হাদিসের কিছু অংশ গ্রহণ ও কিছু অংশ বর্জন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

ধরে নিন, রহিত হওয়ার বিষয়টিকে যদি নাও মানা হয় তাহলেও বিরোধ থেকে যায়। কারণ কিছু হাদিসে নামায পড়ে নেওয়ার কথা এসেছে আর কিছু হাদিসে নামায পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এখন এ বিরোধ অবস্থায় উভয় প্রকার হাদিসের উপর আমল করা অসম্ভব। তাই কেয়াসের আলোকে যে হাদিস প্রাধান্য পাবে তার উপরই আমল করা হবে।

শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. রচিত লামাআতুত তানকিহ শরহে মেশকাতুল মাসাবিহে আছে–

والجواب أنه قد وقع التعارض بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة فى النهي عن الصلوة فى الأوقات الثلاثة فإنها تعم الفرض والنفل وليست مخصوصة بالنفل كما زعمت الشافعية وحكم التعارض بين الحديثين الرجوع إلى القياس والقياس رجح حكم هذا الحديث فى صلوة العصر

وحكم النهي في صلوة الفجر كما ذكرنا وليست الأحاديث فى النهي عن الثلاثة مخصوصة بالنفل كالنهي عن الصلوة بعد الفجر والعصر كما زعمت الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي أوله وبه يوفقون بين هذه الأحاديث الناهية عن الفرائض والنوافل.

অর্থাৎ এ হাদিস এবং তিন সময়ে নামায নিষেধের হাদিসসমূহের মাঝে বিরোধ দেখা দেয়। কারণ এগুলো ফরয ও নফল সকল নামাযকেই শামিল করে, এগুলো শুধু বিশেষ করে নফলের কথা বলে না। যেমনটা শাফিয়িগণ ধারণা করেছেন। আর দুই হাদিসের মধ্যে যখন বিরোধ হয় তখন হুকুম হচ্ছে কেয়াসের শরণাপন্ন হওয়া। আর কেয়াস এ হাদিসের হুকুমকে আসরের নামাযের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে, আর নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদিসের হুকুমকে ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে। যেমনটা আমরা পূর্বে বলে এসেছি। উল্লেখ্য, তিন সময়ে নামাযের নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদিসগুলো নফলের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নয়, যেমন শাফিয়িগণ তা ভেবেছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমে থাকে বা নামাযের কথা ভুলে যায়, সে এই নামাযের কথা যখনই স্মরণ হবে তখনই পড়ে নিবে। কারণ স্মরণ হওয়ার সময়টাই তার জন্য এ নামায আদায়ের সময় অর্থাৎ এর শুরুর দিককার সময়। এভাবেই মুহাদ্দিস ফকিহগণ এ হাদিস এবং ঐ সকল হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য করেছেন। কারণ এ হুকুমকে কোনো বিশেষ নামাযের সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলাটা হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্যের পরিপন্থী। কেননা হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য ফরয ও নফল উভয় প্রকার নামায থেকেই নিষেধ করছে।

এমনিভাবে আল্লামা আইনি ও আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেছেন, এ বিষয়ক অন্যান্য হাদিসেও যে কারণ দেখানো হয়েছে, তা ফরয ও নফল সবগুলোকেই শামিলকারী বলে মনে হয়। ফাতহুল কাদিরের ইবারত, যা কিছু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এর পরে লামাআতে লেখা আছে–

وقال بعض أصحابنا أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث وكان وروده قبل النهي ومقتضاه أن يبطل العصر أيضا بما ذكرنا فجوزنا فى العصر هذا وقد روي عن أبي يوسف أن الفجر لا يفسد بطلوع الشمس.

অর্থাৎ, আমাদের কোনো কোন আলেম বলেছেন, নিষেধাজ্ঞার হাদিসগুলো এ হাদিসকে রহিতকারী। এ হাদিসটি নিষেধের পূর্বেকার। এ কথার দাবি হচ্ছে আছরের নামাযও বাতিল হয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা এ পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করেছি, অতঃপর আমরা এ হাদিসটিকে আসরের নামাযের ক্ষেত্রে বহাল রেখেছি। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে, নিঃসন্দেহে ফজরের নামায সূর্য উদয়ের কারণে নষ্ট হয় না।

আর ফাতহুল মান্নানে আছে, ফজরের পুরা সময়টা পূর্ণাঙ্গ (ত্রুটিমুক্ত) সময়, তাই এ সময় যখন নামায শুরু করবে তখন তা পূর্ণাঙ্গভাবেই ওয়াজিব হবে। কিন্তু নামাযের মাঝখানে সূর্য উদিত হলে নামাযের মধ্যে অসম্পূর্ণতা চলে আসবে, ফলে নামাযটা যেরকমভাবে ওয়াজিব হয়েছিল সেরকমভাবে আদায় হবে না। কিন্তু আসরের নামাযের বিষয়টি ভিন্ন। কারণ আসরের শেষ সময় হচ্ছে অসম্পূর্ণ (ত্রুটিযুক্ত) সময়, কেননা সেটা হচ্ছে মাকরুহ সময়। তাই যখন তা শুরু করবে তখন তা মাকরুহ হিসাবেই ওয়াজিব হবে। এরপর যখন অস্তের কারণে অসম্পূর্ণতা (ত্রুটি) চলে আসবে তখন তা যেরকমভাবে ওয়াজিব হয়েছিল সে রকমভাবেই আদায় হয়ে যাবে।

এরপর তিনি আরো কিছু দলিল বর্ণনা করেছেন। এরপর আলোচনার শেষদিকে লিখেছেন,

وبما ذكرنا علم أن مذهب الحنفية بني على التحقيق والتدقيق وأن قياستهم ودلائلهم العقلية ليست فى مقابلة النصوص بل لترجيح بعض الأحاديث على بعض كما أشرنا إليه في مواضع.

আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, এর দ্বারা জানা গেল, হানাফি মাযহাব গভীর গবেষণা ও সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। আর তাদের কেয়াস ও তাদের যুক্তিভিত্তিক দলিলসমূহ নসসমূহের বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নয়, বরং

বিরোধপূর্ণ হাদিসসমূহের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে, যেমনটি আমরা অনেক জায়গায় এদিকে ইশারা করেছি।

শরহে বেকায়ায় আছে,

فالقياس رجع هذا الحديث في صلوة العصر وحديث النهي في صلوة الفجر وما سائر الصلوة فلا يجوز فى الأوقات الثلث لحديث النهي إذ لا معارض لحديث النهي فيها.

অর্থাৎ সুতরাং কেয়াস আসরের নামাযের ক্ষেত্রে এ হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছে আর ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে নিষেধের হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া আর যত নামায আছে, এগুলোর কোনটিই নিষেধের হাদিসের কারণে তিন সময়ে পড়া জায়েয নেই। কারণ সেগুলোর ক্ষেত্রে নিষেধের হাদিসের বিপরীতে কোনো হাদিস নেই।

মিরকাত শরহে মিশকাতে আছে, নামাযের শেষ সময় নামায ওয়াজিব হওয়ার কারণ। আর আসরের শেষ সময় হল অসম্পূর্ণ (ত্রুটিযুক্ত) সময়, কেননা এ সময় সূর্যের পূজা করা হয়। তাই এ সময় যে নামায ওয়াজিব হয় তা অসম্পূর্ণ হিসাবে ওয়াজিব হয়। অতএব এ নামায সেভাবেই আদায় করবে যেভাবে তা ওয়াজিব হয়েছে। এ কারণে এ নামায আদায় করার সময় যখন সূর্যাস্তের কারণে এতে অসম্পূর্ণতা আসবে তখন তা নষ্ট হবে না। কিন্তু ফজরের নামাযের পুরা সময়টা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ (ত্রুটিমুক্ত) সময়। তাই এ নামায আদায় করার সময় যদি সূর্য উদিত হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে, কারণ তা যেরকম পূর্ণাঙ্গভাবে ওয়াজিব হয়েছে, সেরকম পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হবে না। সূর্য উদিত হওয়ার কারণে এতে অসম্পূর্ণতা চলে এসেছে। এখন যদি বলা হয়, এ ইল্লত বা হুকুম প্রদানের কারণটি হাদিসের পরিপন্থী, তাহলে এর জবাবে আমি বলব, যখন হাদিসসমূহে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তখন কেয়াসের মাধ্যমে এর সমাধান করতে হবে। আর কেয়াস আসরের নামাযের ক্ষেত্রে এ হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছে আর ফজরের নামাযের ক্ষেত্রে নিষেধের হাদিসকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর অন্যান্য নামাযের কোনটিই এ তিন সময়ে জায়েয নেই। কারণ নিষেধের হাদিস এ

সবগুলোকেই শামিলকারী এবং এগুলোর ক্ষেত্রে বিপরীত বক্তব্য প্রদানকারী কোনো হাদিস নেই।

সারকথা, হয়তো এ হাদিসগুলোর ঐ অর্থ নেওয়া হবে, যা শরহে মুসলিম থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে অথবা এগুলোকে রহিত বলা হবে। ইমাম তহাবি এমন মতই প্রদান করেছেন। অথবা হাদিসগুলোকে বিরোধপূর্ণ ধরে এগুলোর কোনটাকে কোনটার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। ইমাম সাহেব রহ. এমন মত প্রদান করেছেন। মোটকথা, এক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাদিসের বিরোধিতা হয়েছে বলা যায় না।[২১২]

---

২১২. ফাতহুল মুবিন : পৃষ্ঠা ৭২।

আপত্তি : বারো

জোরপূর্বক বিবাহ ও তালাকের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে জোরপূর্বক তালাক ও বিবাহ

ইসলামে জোরপূর্বক তালাক অথবা বিবাহ জায়েয নেই। এব্যাপারে একটি হাদিস রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারি রহ. একটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন এবং এর অধীনে হাদিসটি নকল করেছেন–

بَابُ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ. عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَدَّ نِكَاحَهُ»[২১৩]

অনুচ্ছেদ : কোনো ব্যক্তি তার মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ দিলে তার বিবাহ বাতিল। হযরত খানসা, যিনি বিধবা ছিলেন, তার পিতা তাকে বিবাহ দিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিবাহ বাতিল বলে দিলেন।

---

২১৩. দেখুন, হাদিস নং ৫১৩৮।

ফিকহে হানাফিতে জোরপূর্বক তালাক ও বিবাহ

এবার হানাফিদের কথা শুনুন! তারা বলেন,

رجل ادعى على امرأة نكاحا وهي تجحد، وأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي بالنكاح بينهما حل للرجل وطؤها وحل للمرأة التمكين منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف الأول.[٢١٤]

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার ব্যাপারে এ দাবি করে যে, এ আমার স্ত্রী আর ঐ মহিলা এটা অস্বীকার করে, এরপর লোকটি মিথ্যা সাক্ষী পেশ করে নিজের পক্ষে বিচারকের ফায়সালা আদায় করে নেয়, তাহলে এমন সুরতে এ ব্যক্তির জন্য ঐ মহিলার সাথে সহবাস করা জায়েয হবে এবং ঐ মহিলার জন্য নিজেকে ঐ ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করা জায়েয হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে এটা জায়েয। আর আবু ইউসুফেরও একটি মতানুযায়ী এটা জায়েয।[২১৫]

দ্বাদশ আপত্তির জবাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে আকদ (চুক্তি), চুক্তি বাতিল, তালাক ও আযাদ করার ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা কিছু শর্তের ভিত্তিতে মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতেও জাহেরি (দুনিয়াবী হিসাবে) ও বাতেনি (ধর্মীয় হিসাবে) কার্যকরী হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মাযহাবের দলিলগুলো লক্ষ্য করুন,

দলিল নং (১) : আল্লামা শামি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কিতাবুল আসলের উদ্ধৃতি দিয়ে নকল করেন,

قال محمد - رحمه الله تعالى - في الأصل: بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالمرأة فقالت

---

২১৪. ফাতাওয়া আলমগিরি : ১/৩৫০,৩৫১।

২১৫. কিয়া ফিকহে হানাফিয়াহ কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৬,৩৭।

إنه يتزوجني فأما إذا قضيت علي فجدد نكاحي فقال: لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك قال: وبهذا نأخذ

ইমাম মুহাম্মদ মাবসুত (আল আসল) এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, তার কাছে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি তার কাছে এক মহিলার বিবাহের ব্যাপারে (মিথ্যা) সাক্ষী পেশ করল। কিন্তু মহিলাটি নিজের সাথে লোকটির বিবাহ মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল। এ পরিস্থিতিতে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাকে লোকটির সাথে যেতে আদেশ করলেন। মহিলা বলল, এ লোকটি আমাকে বিবাহ করেনি। এখন যখন আপনি এই হুকুম দিয়েই দিয়েছেন, আপনি তার সাথে আমার বিবাহ পড়িয়ে দিন। হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আমি নতুন করে তোমার বিবাহ পড়াব না, তোমার বিবাহ তো এ দুই সাক্ষীই পড়িয়ে দিয়েছে।[২১৬]

দলিল নং (২) আল্লামা আবুবকর হাসকাফি হানাফি (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি) লেখেন, হযরত আলি, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং ইমাম শাবি রহ. এর মতও ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতো। ইমাম আবু ইউসুফ আমর ইবনে মিকদাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, কোনো এক গোত্রের এক ব্যক্তি এমন একজন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল, যে মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে তার চেয়ে উপরে ছিল। তাই মহিলাটি লোকটির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তখন ঐ ব্যক্তি এমন দাবি করে বসল যে, এ মহিলার সাথে আমার বিবাহ আগেই হয়েছিল এবং সে এ বিষয়ে হযরত আলির আদালতে সাক্ষীও পেশ করে দিল। মহিলা বলল, এ ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ হয়নি। হযরত আলি বললেন, এ দুই সাক্ষী তোমার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে।

দলিল নং (৩) : ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, শু'বা ইবনে হাজ্জাজ যায়েদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। বিচারক তাদের উভয়কে পৃথক

---

২১৬. রদ্দুল মুহতার : ৪/৫১৬।

করে দিলেন। এরপর ঐ সাক্ষীদের একজন ঐ মহিলাকে বিবাহ করে নিল। শাবি বললেন, এ বিবাহ বৈধ।

দলিল নং (৪) হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা একটি গোলামকে ত্রুটিমুক্ত বলে বিক্রি করে দিলেন। ক্রেতা ঐ গোলামকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর আদালতে নিয়ে গেল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহর কসম করে একথা বলতে পারবে যে, তুমি যখন একে বিক্রি করেছিলে তখন তুমি তার অসুস্থতার কথা গোপন করনি? হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কসম খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু গোলামটি তাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং তারপর হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা গোলামটিকে আরো বেশি লাভে বিক্রি করেছিলেন।[২১৭]

এ মাসআলায় হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা গোলামের বিক্রিকে জায়েয ধরেছেন। অথচ তার জানা ছিল যে, এটা বাতেনিভাবে এরকম নয় এবং বাতেনি হুকুম জাহেরি হুকুমের বিপরীত। (কেননা তিনি দায়মুক্ত হয়ে গোলামটিকে বিক্রয় করেছিলেন। এ কারণে বাতেনিভাবে ঐ গোলামকে ফেরত দেওয়া সহিহ ছিল না।) যদি বিষয়টা হযরত ইবনে উমরের মত হযরত উসমানেরও জানা থাকত, তাহলে তিনি এ ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করতেন না। এ ঘটনা থেকে জানা গেল, হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমারও এ মাযহাব ছিল যে, যদি বিচারক কোনো আকদ ও চুক্তিকে বাতিল করে দেয় তাহলে তা বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসে। যদিও বাতেনিভাবে বাস্তবতা এর থেকে ভিন্ন হয়।

দলিল নং (৫) ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত সঠিক হওয়ার উপর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার এ রেওয়ায়েতও দলিল যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর মাঝে লিআন করালেন। এরপর বললেন, যদি এই মহিলার গর্ভে এ ধরনের বাচ্চা হয় তাহলে বাচ্চা হেলাল ইবনে উমাইয়ার। আর যদি অন্য কোনো আকৃতির হয় তাহলে শরিক ইবনে সামহার, যাকে জড়িয়ে হেলাল ইবনে উমাইয়ার

---

২১৭. মুয়াত্তা ইমাম মালেক মুতারজাম : পৃষ্ঠা ৫৩৪।

স্ত্রীকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ঐ মহিলার গর্ভ থেকে অপছন্দনীয় আকৃতি নিয়ে বাচ্চা জন্ম নিল। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তাদের মাঝে লিআন না হত তাহলে আমি এ মহিলাকে দেখে নিতাম।[২১৮]

হেলাল ইবনে উমাইয়ার সত্যতা এবং তার স্ত্রীর মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বিচ্ছেদকে বাতিল করেননি, যা লিআনের কারণে হয়েছিল। আর এটা একথার দলিল যে, বিচারক যখন কোনো চুক্তিকে বাতিল করে দেয় তখন তার এ ফয়সালা জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়।

দলিল নং (৬) ইমাম আবু হানিফার মতের উপর এর দ্বারাও দলিল পেশ করা যায় যে, যখন বিচারকের কাছে এমন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, যে বাহ্যিকভাবে সৎ, তাহলে বিচারকের উপর ওয়াজিব হচ্ছে তার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ফায়সালা দিয়ে দেওয়া। যদি তিনি সাক্ষ্য দেওয়ার পর ফায়সালা না করেন, তাহলে তিনি আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্যকারী ও গুনাহগার হবেন। কেননা তাকে বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিচার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং ঐ ইলমে বাতেন বা গোপনীয় ইলমের ভিত্তিতে বিচারের হুকুম দেওয়া হয়নি, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

দলিল নং (৭)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلاَنِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا[২১৯]

---

২১৮. মাযাহেরে হক শরহে মেশকাত : ৩/৪১৫।

২১৯. বুখারী মাআ শরহে তাইসীরিল বারী : ৫/২৫৮।

সায়িদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দেয় (তাহলে এর হুকুম কি?) তিনি বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আজলানের এক দম্পতিকে আলাদা করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। এখন তোমাদের কেউ কি তাওবা করবে? কিন্তু তারা উভয়ে (তাওবা করতে) অস্বীকৃতি জানাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন মিথ্যাবাদী। এখন তোমাদের কেউ কি তাওবা করবে? কিন্তু এবারও তারা উভয়ে (তাওবা করতে) অস্বীকৃতি জানাল। তখন শেষ পর্যন্ত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে আলাদা করে দিলেন।

এ আপত্তির জবাব মাওলানা মানসুর আলি খান মুরাদাবাদী দিয়েছিলেন। আমরা সকলের উপকারার্থে এখানে তা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করছি।

তিনি বললেন : ইমাম আযমের হাদিস বিরোধী একটি মাসআলা এই যে, সকল আকদ (চুক্তি) ও চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে যেমন বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয় এবং একালা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিচারকের রায় জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকরী।

আমি বলি : এক কথাকে অন্য কথার সাথে গুলিয়ে ফেলার কাজ আপনারা অনেক বেশি করেন এবং 'আম'কে 'খাস' করা আর 'খাস'কে 'আম' করা আপনাদেরই কাজ। ইমাম আবু হানিফার মতকে আপনারা যে হাদিসটির বিরুদ্ধে মনে করেন, এ হাদিসটি বিশেষভাবে মালের ক্ষেত্রে এসেছে। খাতামুল মুহাদ্দিসিন জনাব হাফেযুল হাদিস মাওলানা আহমদ আলী লেখেন,

واحتجوا أي الحنفية بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه فيجعل إنشاء تحرزا عن الحرام والحديث صريح فى المال وليس النزاع فيه فإن القاضي لا يملك دفع مال أحد إلى آخر ويملك إنشاء العقود والفسوخ.

হানাফিগণ এ ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন যে, বিচারক যদি শরয়ি প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ বিষয়ে রায় দেয়, যে বিষয়টি তার নতুনভাবে সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে তাহলে ঐ বিষয়টি নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থা হারাম থেকে বাঁচার জন্য। আর এ হাদিস মালের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে বলছে। আর মালের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই। কারণ কাযি একজনের মাল অন্যজনকে দেওয়ার অধিকার রাখেন না, তবে তিনি চুক্তি ও চুক্তি বাতিল করাটা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।

আর ইমাম তহাবি রহ. লেখেন,

وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما أسند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا وحملوا حديث الباب الذي قبل هذا الباب على ما ورد فيه وهو المال.

আর অন্যরা এ মত পোষণ করেছেন যে, বিচারকের রায় যদি কোনো মালের ক্ষেত্রে হয় এবং এতে বাতেনিভাবে বিষয়টা তার বিপরীত হয়, যে জাহেরের উপর ভিত্তি করে বিচারক রায় দিয়েছে তাহলে বিচারকের এ রায়, যার পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে, তার জন্য ঐ মালকে হালাল করবে না। আর যদি রায় বিবাহ অথবা তালাকের ক্ষেত্রে হয় তাহলে এ রায় জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যাবে। তারা এ অনুচ্ছেদের পূর্বের অনুচ্ছেদের হাদিসকে কেবল সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলেছেন, যেক্ষেত্রে তা এসেছে। আর তা হচ্ছে মাল।

এ ইবারত দ্বারাও বোঝা গেল যে, হাদিসটি সুনির্দিষ্টভাবে মালের ক্ষেত্রে এসেছে। من حق أخيه ও أقطع له قطعة من النار শব্দ এটাই প্রমাণ করছে। দ্বিতীয় জবাব এই যে, এ হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য একথা প্রমাণ করছে যে, এ হাদিস সুনির্দিষ্টভাবে ঐক্ষেত্রে এসেছে, যেক্ষেত্রে বিচারের জন্য শুধু বাদী-বিবাদীর কথার উপর নির্ভর করতে হয় এবং সেখানে কোনো সাক্ষী ও কসম থাকে না। তাই এমন ক্ষেত্রে বিষয়টা এ হাদিস অনুযায়ী হওয়ার ব্যাপারে

কারো কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ তো ঐ ক্ষেত্রে, যেখানে সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে ফায়সালা দিতে হয়।

কেননা হাদিসের শব্দ হচ্ছে ألحن حجته যার অর্থ অনেক বেশি বাকপটু, যে মিথ্যা কথাকেও সত্য বানিয়ে ফেলে। এতে কোথাও সাক্ষী এবং কসমের কথা উল্লেখ নেই, যে ব্যাপারটিতে মূলত মতবিরোধ রয়েছে। অবশ্য যদি শুধু তাদের যুক্তি-তর্কের উপরই নির্ভর করা হয় যেমনটা হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে তা বুঝা যাচ্ছে তাহলে তখন জাহেরিভাবে বিচার কার্যকর হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব রহ. এ ব্যাপারে দ্বিমত করেন না। অবশ্য যে ক্ষেত্রে সাক্ষী ও কসম থাকবে সেক্ষেত্রে ইমাম সাহেব রহ. বলেন, বিচারকের রায় জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর হবে। তাই হাদিসের মর্ম কখনই এমন নয়, যাতে বিরোধিতা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া যদি এ হাদিসকে আম বা ব্যাপক রাখা হয় অর্থাৎ হাদিসটি যদি মাল ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় তাহলে এক্ষেত্রে জুমহুরের এ মতের বিরোধিতা আবশ্যক হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের মধ্যে কোনো ভুল হতে পারে না আর ভুল হলেও আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে সাথে সাথে জানিয়ে দেওয়া হত।

মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম নববি রহ. এ বিষয়টিকে স্বীকার করেছেন এবং তিনি এ হাদিসকে গায়রে ইজতেহাদি তথা তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নয় এমন বিচার, যা কেবল কসম ও সাক্ষীর ভিত্তিতে হয়, এর ব্যাপারে খাস বা সুনির্দিষ্ট বলে মত দিয়েছেন। বোঝা গেল, এ হাদিস জুমহুরের মতেই খাস, আম নয়। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, মুহাদ্দিসগণ একে সাক্ষী ও কসম বিশিষ্ট গায়রে ইজতেহাদি বিচারের সাথে খাস করেন আর ইমাম আবু হানিফা রহ. একে কারো মালের বিচারের সাথে খাস করেন।

মোটকথা, তরফাইন অর্থাৎ ইমাম আযম ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এ হাদিসটিকে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মত দেন। এখন হাদিসের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে নীতিবানগণ নিজেরাই বুঝে নিন যে, হাদিস থেকে কী মালের বিচারের সাথে খাস হওয়ার বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে, না গায়রে ইজতেহাদি বিচারের সাথে খাস হওয়ার বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে। আর হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস, যাকে আপনারা মাওকুফ বলে থাকেন, একে

আপনারা দলিলযোগ্য মনে করেন না। যেমনটা খোলাসাতুল খোলাসায় আছে, وهو ليس بحجة عند الشافعي অর্থাৎ মাওকুকফ ইমাম শাফিয়ি রহ. এর নিকট দলিলযোগ্য নয়।

কিন্তু হানাফিরা একে দলিলযোগ্য মনে করেন। লামাআতে আছে, ومن مذهب أبي حنيفة وجوب تقليد الصحابي فيما قال. ইমাম আবু হানিফার মাযহাব হচ্ছে সাহাবায়েকেরামের কথার অনুসরণ করা ওয়াজিব।

আর ইতকানীতে আছে, اعلم أن تقليد الصحابي واجب অর্থাৎ জেনে রাখ, সাহাবির অনুসরণ ওয়াজিব।

আর আপনারা যে কথা লেখেন যে, মুআল্লাক হাদিস যয়িফ ও বাতিল বলে গণ্য। তো এর জবাব হল, জনাব, সকল মুআল্লাক হাদিসের হুকুমই এটা নয়। বরং মুআল্লাক হাদিসের কিছু কিছু প্রকার গ্রহণযোগ্যও রয়েছে। নুখবাতুল ফিকারে আপনাদের নকলকৃত ইবারতের পরেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যদি এমন না হত, তাহলে বুখারির সকল মুআল্লাক হাদিসগুলো ইবনে হাজার ও অন্যদের সুস্পষ্ট হুকুম লাগানোর পূর্বে অবশ্যই ঢালাওভাবে যয়িফ বলে গণ্য হত। অথচ ব্যাপরটা এমন নয়। বরং বুখারির মুআল্লাক হাদিসগুলোকে সুনজরে দেখা হয় এবং এগুলোর কোনো কোনটা সহিহ হওয়ার বিষয়টি ইবনে হাজার ও অন্যদের সুস্পষ্ট হুকুম প্রদানের উপর নির্ভরও করে না। অবশ্য কেউ কেউ এমন একটি পার্থক্য বলেছেন, এ ধরনের যে হাদিসে ইমাম বুখারি معروف এর সীগা আনবেন অর্থাৎ قال فلان বা ذكر বলবেন, তা সহিহ আর যেটির মধ্যে مجهول এর সীগা قيل বা يقال আনবেন, তার ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হাদিসটি যেহেতু এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই এর অবশ্যই কোনো না কোনো ভিত্তি আছে। সুতরাং এধরনের ব্যক্তিদের মুআল্লাক হাদিসগুলোকে যয়িফ বলে দেওয়া تعصب বা প্রতিহিংসামুক্ত নয়। কারণ মুসান্নিফদের মধ্যে প্রায়ই এ রীতি দেখা যায় যে, তারা হাদিসের সম্পূর্ণ সনদকে লোপ করে দিয়ে শুধু قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলে হাদিস উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে মেশকাতের মুকাদ্দামায় সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে মুতাকাদ্দিমিনের রীতি তো এটাই ছিল যে, তারা সনদ বর্ণনা করতেন না।

তার কারণ ছিল তখন মিথ্যার প্রচলন ছিল না, মানুষ সত্যবাদী ছিলো। যেমনটি এ বিষয়টি হাদিসে রয়েছে, خير القرون قرني إلى ثم يفشو الكذب., অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল যুগের চেয়ে উত্তম হল আমার যুগ, এরপর এর সাথে যুক্ত যারা রয়েছে আর তারপর তাদের সাথে যুক্ত যারা রয়েছে। এরপর মিথ্যার প্রসার ঘটবে।

আর স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ আর সাহাবায়েকেরামের যুগ একই যুগ ছিল, এরপর ছিল তাবেয়িনের যুগ, আর তারপর ছিল তাবে তাবেয়িনের যুগ। এরপর এমনভাবে মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে যে, লোকেরা হাদিস বানানো শুরু করে দিয়েছে। এজন্য ইমাম বুখারি রহ. হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্তের প্রয়োগ করেছেন। নচেৎ কোনো হাদিসে এসকল শর্তের কথা সুস্পষ্টভাবে আসেনি। এ শর্তগুলো সতর্কতার খাতিরেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এবং এ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল যে, এখন যে কেউ হাদিস নকল করবে তার থেকে হাদিস গ্রহণ করার সময় এ বিষয়গুলো দেখে নিতে হবে। এসব শর্তের অর্থ এই নয় যে, ইমাম বুখারির উস্তাযগণের উস্তাযগণ যে সকল হাদিস বর্ণনা করে গিয়েছেন সেগুলোর মধ্যেও মুত্তাসিল সনদ জরুরি, এটা কখনই নয়। এটা তো শুধুই জাহেরি ফেরকার একটি মনগড়া মতবাদ। নিঃসন্দেহে ইমাম মুহাম্মদের মুআল্লাক হাদিসগুলো ইমাম বুখারির মুআল্লাক হাদিসের মতই ইত্তেসালের হুকুমে। এ ব্যাপারে জুমহুর হানাফি ওলামায়েকেরাম এবং শাফিয়ি মুসান্নিফগণের ঐক্যমত্য এর সুস্পষ্ট দলিল। তানকিহুল উসুলে রাবির শর্তসমূহের আলোচনায় ইমাম মুহাম্মদের মুরসাল হাদিসগুলোকে হুজ্জত বলা হয়েছে। আর যে মূলনীতিগুলো পরবর্তীদের সময়ে কোনো প্রয়োজনে প্রণয়ন করা হয়েছে, এগুলো কী করে পূর্ববর্তীদের উপর হুজ্জত হতে পারে অথবা পরবর্তীকালে লোকেরা এগুলোর ভিত্তিতে কী করে পূর্ববর্তীদের তাহকিকসমূহকে ত্যাগ করতে পারে। অবশ্য এতটুকু কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে যে, কোথাও বিরোধ দেখলে আমরা তাতে সামঞ্জস্য বিধান করে দিব। আর বিরোধ হতেই পারে, কারণ সাহাবায়েকেরামের থেকেই যখন এমন কিছু কাজ দেখা গেছে, যা বাহ্যত হাদিসের সাথে

বিরোধপূর্ণ বলে মনে হয় তখন অন্যদের থেকে এমন কিছু পাওয়া যেতেই পারে।

তাই জরুরি হচ্ছে, সাহাবায়েকেরামের কাজ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করা। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিনের কথা ও কাজের ক্ষেত্রে, যাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين অর্থাৎ তোমরা আমার ও আমার খোলাফায়ে রাশেদিনের তরিকা আঁকড়ে ধর। কারণ তাদের কথা তো অবশ্যই দলিলযোগ্য। বিশেষ হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে তো أقضاهم علي কথাটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে সাহাবায়েকেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ফয়সালা প্রদানকারী হচ্ছেন আলি। তাই আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর এমন উক্তি যে, তোমার সাক্ষীরা তোমার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এমন সব ক্ষেত্রে, যা আকদ বা চুক্তি সংশ্লিষ্ট হয় বিচারকের ফায়সালা জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়। আর সহিহাইনের হাদিস যার মর্ম একথা বুঝাচ্ছে যে, হাদিসটি মালের ক্ষেত্রে এসেছে এবং যার সনদও আমরা বর্ণনা করেছি, আমাদের উক্ত মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপরও এত বাস্তবধর্মী সামঞ্জস্য বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা জাহেরি ফেরকার মত হাদিসকে এত বেশি বুঝার নামান্তর যে, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষেও তা বুঝা সম্ভব হয়নি। আল্লাহ এ ধরনের ভ্রান্ত আকিদা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

এ সকল লোক এমন মনে করে যে, পয়গমবরের কথার উদ্দেশ্য তাই, যা আমরা বলব। তারা নিজেদের বুঝকেই সর্বোচ্চ মনে করে। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, সাহাবায়েকেরাম মারফু হাদিসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এজন্য তারা সাহাবায়েকেরামের কথা মানে না। আল্লাহ তায়ালা কথা نؤمن ببعض ونكفر ببعض অর্থাৎ 'আমরা কিছু অংশ বিশ্বাস করি আর কিছু বিশ্বাস করি না' তাদের অবস্থার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। যেহেতু তারা পরিষ্কার ভাষায় সাহাবায়েকেরামকে গালি গালাজ করতে ভয় পায়, তাই হাদিসে মারফুর ছদ্মাবরণে সাহাবায়েকেরামের শানে বেয়াদবি করার প্রয়াস পায়। বাস্তবিকভাবে ঐ ব্যক্তিদের অন্তরে সাহাবায়েকেরামের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে,

যারা সাহাবাদের বিপরীত পন্থায় কুরআন-হাদিসের উপর আমল করার পক্ষে এবং নিঃশর্ত ইনসাফ করে না। তারা তাদের মতকে অগ্রগণ্য মনে করে। এটা ভাবে না যে, হাদিসের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে হয়তো আমাদেরই ত্রুটি হয়ে গেছে। সাহাবায়েকেরাম যা কিছু করেছেন, হাদিস অনুযায়ীই করেছেন। এখন সমস্যা মনে হলে তুমি এতে সামঞ্জস্য বিধান কর, আর তা সম্ভবও। তা না করে অন্যের কথা মানতে গেলে তো হাদিসের মর্ম থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।

আমরা যদি প্রতিবাদমূলক কোনো কথা বলি, তখন বলে, তাওবা তাওবা, এমন কথা বলা উচিত নয়। কেন আমরা বলব না, আমাদের তো আল্লাহ এ ফিরকার হাদিস ও কুরআনের ব্যাখ্যার উপর আমল করার হুকুম দেননি। বরং আমাদের খুব ভাল করে জানা আছে, যদি ইমাম সাহেব কৃত কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে এক হাজারের মধ্যে একশ ভুল হয়, তাহলে অন্যদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হাজারের মধ্যে নয়শ ভুল হবে। আর তারা সুনির্দিষ্ট কিছু হাদিস, যা কোনো কোন সাহাবির জানা ছিল না, এগুলোকে সনদসহ সব জায়গায় পেশ করে এরপর নিজের পক্ষ থেকে এ হাদিসের একটা ব্যাখ্যা বেঁধে দেয় এবং মনে করে যে, পয়গমবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটাই বুঝেছেন। এরপর এমন একটা উত্তর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায় যে, অন্যান্য সাহাবিদের হাদিস এ হাদিসের সাথে বিরোধপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে, তাদের কাছে এ হাদিস পৌঁছেনি অথবা বলে, কুরআন ও হাদিসের বিপরীতে সাহাবির কথা মানার সুযোগ নেই। আর তারা নিজের বুঝকেই কুরআন-হাদিস বলে চালিয়ে দিতে চায়।

بریں عقل ودانش بباید گریست

বাস্তবতা হচ্ছে, ইমাম আযমের সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। আল্লাহ ও রাসুল আমাদের কোথাও এ হুকুম দেননি যে, কুরআন ও হাদিস কোনো বিষয়ে কেয়াসকে সমর্থন করা সত্ত্বেও এগুলোকে অনর্থক কেয়াসের বিপরীতে নিয়ে যাওয়া হবে। হ্যাঁ, যেখানে কুরআন ও হাদিস কেয়াসকে সমর্থন করবে না, সেখানে আমরা কুরআন ও হাদিসকেই কবুল করে নিব এবং নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে নিব; কিন্তু তা না করে এক কথা হুট

করে গ্রহণ করে ফেলা আর অন্য কথার ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে না চাওয়া, বরং নিজের আকলকে একেবারেই বেকার মনে করা জাহেরি ফিরকারই কাজ হতে পারে। আকল সমর্থিত উত্তম অর্থকে পরিত্যাগ করে একে আকল বিরোধী মনে করা ঐ ব্যক্তিদের নীতি, যারা মনে করে যে, আকল কেবল দুনিয়ার জন্যই দান করা হয়েছে, এর দ্বারা দীনের কোনো কাজ না নেওয়া চাই। শুধু তাই নয়, অন্য কেউ যদি একে দীনের কাজে লাগায় তাহলে তারা তার উপর হামলে পড়ে।

এক জাহেরির ঘটনা আছে, সে আকল ব্যবহারকারীদের অনেক গালমন্দ করত এবং বলত, এ অসভ্যরা সম্পূর্ণ কুরআন-হাদিস বিরোধী কাজ করেছে। বেশির ভাগ কথা উল্টাপাল্টা বলে গেছে। একদিন তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, জনাব, তাদের কোনো কথাটা কুরআন-হাদিস বিরোধী। সে বলল, একটা হলে তো বলা যেত, কিন্তু এর সংখ্যা তো শত শত। কোনটা রেখে কোনটা বলি। তবু ভাত একটা টেপাই যথেষ্ট এর নীতি অনুযায়ী একটা বলে দিচ্ছি যে, দেখুন, এ ব্যাপারে সকল মানতেকি (যুক্তিতর্কবিদ) একমত যে, দুটি বিপরীত জিনিস একাত্ম হওয়া অসম্ভব এবং হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক একত্র হতে পারে না। অথচ তাদের একথা কুরআন-হাদিসের সম্পূর্ণ বিরোধী। কীভাবে? দেখুন, لا إله এর মধ্যে নাকচ করা হয়েছে আর إلا الله এর মধ্যে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আসলে তারা তো কালিমাই জানে না। জানলে এমন সুস্পষ্ট বিরোধিতায় লিপ্ত হত না।

সারকথা, মানুষ এমন মনে করা যে, আমি যা বুঝেছি অন্যরা তা বুঝেনি, বরং তারা সুস্পষ্টভাবে কুরআন-হাদিসের বিপরীত বুঝেছে, সম্পূর্ণরূপে ভুল। চার ইমামের মতবিরোধের সকল কিতাব দলিলসহ বিদ্যমান রয়েছে; সেগুলো দেখে নিন। তারা তো এমন করেননি যে, চোখে পট্টি বেঁধে এক তরফা কথা লিখে গেছেন এবং বিপরীত দিকের কথা এড়িয়ে গেছেন, আর কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হুকুম লাগিয়ে দিয়েছেন, দেখ, এ হচ্ছে হাদিস বিরোধী। আর কাযি শাওকানির নাইনুল আওতারে জুমহুরের মত বিরোধী যাদের কথা রয়েছে তাদের এবং তাদের অনুসারীদের কথা উদ্ধৃত করে দেওয়া সুস্পষ্ট হঠকারিতা ও শিষ্টতা লঙ্ঘন। বরং এক্ষেত্রে তাদের মত আনা যেতে পারে, যারা উভয় পক্ষের কাছে স্বীকৃত। যেমন শাহ

ওয়ালিউল্লাহ, তিনি আকদুল মাজিদ ও ইনসাফ ফি বায়ানি সাবাবিল ইখতেলাফে লেখেন,

জেনে রাখ, উম্মাতের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, শরিয়ত বুঝার ক্ষেত্রে সালাফ বা পূর্বসূরিদের উপর নির্ভর করা চাই। আর তাই তাবেয়িন এক্ষেত্রে নির্ভর করেছেন সাহাবায়েকেরামের উপর আর তাবয়েতাবেয়িন নির্ভর করেছেন তাবেয়িনের উপর, এভাবে প্রত্যেক যুগের ওলামাগণ পূর্ববর্তী যুগের আলেমদের উপর নির্ভর করেছেন। আর আকলও এর যথার্থতাকে প্রমাণ করে। কারণ শরিয়ত নকল ও ইসতেমবাত ছাড়া বুঝা যায় না, আর নকল প্রত্যেক যুগের আলেমরা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে গ্রহণ করা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না, যাতে তাদের মতের বাইরে চলে যেতে না হয়। কারণ এমন হলে ইজমা লঙ্ঘনকারী হয়ে যেতে হবে। তাই এক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের উপর নির্ভর করা চাই এবং তাদের সহযোগিতা নেওয়া চাই। যখন সালাফের উপর নির্ভর করাটা প্রমাণিত হয়ে গেল, এখন জরুরি হচ্ছে যাদের কথার উপর নির্ভর করা হচ্ছে তাদের কথাগুলো সহিহ সনদে তাদের থেকে বর্ণিত হওয়া অথবা তাদের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোতে থাকা, আর তাদের মুহতামাল অর্থাৎ বহু অর্থের সম্ভাবনাযুক্ত কথাগুলোর প্রাধান্যপ্রাপ্ত অর্থ বলে দেওয়া, আম বা ব্যাপক অর্থবোধক কথাকে খাস বা সুনির্দিষ্ট করা, প্রয়োজনবোধে শর্তহীন কথাকে শর্তযুক্ত করা। আর সঠিক নিয়ম হচ্ছে, কোনো বিষয়ে কথা বলতে গেলে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকলে সকল মতগুলোকে একত্র করা এবং এ বিষয়ের সকল মতের হুকুমগুলোর কারণ বর্ণনা করা। আর কারণসহ সকল হুকুমের বর্ণনা সম্বলিত মাযহাব বলতে দুনিয়াতে বর্তমানে কেবল এ চার মাযহাবই রয়েছে। আর ইমামিয়া ও যায়দিয়া যে দুটি মাযহাব রয়েছে, এগুলোর উপর নির্ভর করা জায়েয নেই, কারণ এ মাযহাব দুটির লোকেরা বিদআতী।

অবশিষ্ট বিশ্লেষণ এ কিতাবের শুরুতে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি কারো মন চায়, দেখে নিতে পারেন। এখন আমরা ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে তার এ দাবির উপর যে, মাল ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে বিচারকের রায় জাহেরি ও বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়, কিছু দলিল পেশ করছি−

ফাতহুল কাদিরে আছে, ইমাম সাহেবের মতে যে বিষয়ে বিচারকের পক্ষে আকদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে, সে বিষয়ে জাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে বিচারকের রায় কার্যকর হবে। সুতরাং যদি কোনো মহিলা অন্যের ইদ্দতে থাকে অথবা অন্যের তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হয়ে থাকে তাহলে এ সুরতে বিচারকের আকদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। তাই এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মহিলাকে তার স্ত্রী বলে দাবি করে সাক্ষ্য পেশ করে এবং বিচারক তার পক্ষে রায়ও দেয়, তবু সে তার স্ত্রী হবে না এবং বিচারকের রায় কার্যকর হবে না। কিন্তু যদি এমন না হয় তাহলে বিচারকের রায় জাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে যাবে। কারণ বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝগড়া দূর করা, আর তা জাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে রায় কার্যকর না হলে হাসিল হবে না। কেননা এক্ষেত্রে সহবাস করতে গেলে এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় ঝগড়া সৃষ্টি হবে এবং আক্রান্তজন অপরজনকে বাধা দিবে। কারণ সে প্রকৃত ব্যাপারটি জানে। তাই এখানে অবশ্যই প্রথমে এ আকদটা সৃষ্টি হবে, যেন কাযি এভাবে বলেছেন, আমি তোমাকে তার কাছে বিবাহ দিলাম এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা দিলাম। এরপর ইবনুল হুমাম লিখেছেন, ইমাম সাহেবের কথা অধিক যৌক্তিক।

আর ইমাম তহাবি রহ. লেখেন,

فيثبت الحل عند الله تعالى وإن أثم المدعي إثم إقدامه على الدعوى الكاذبة.

অর্থাৎ, সুতরাং আল্লাহ তায়ালার কাছে হালাল হবে, যদিও বাদী মিথ্যা দাবি করার কারণে গুনাহগার হবে।

এ ইবারত থেকে বুঝা গেল, গুনাহ বাদীর ঘাড়েই চাপবে এবং এ ব্যাপারে যে শাস্তির কথা এসেছে তা তার মিথ্যা দাবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও ইমাম সাহেবের মত হাদিস পরিপন্থী হয়নি; বরং সম্পূর্ণ হাদিস অনুযায়ী হয়েছে। আর তাহতাবিতে আছে, ইমাম সাহেবের একটা দলিল এটাও যে, এ ব্যাপারে সকলের ইজমা রয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি একটা বাঁদী ক্রয় করে, এরপর সে আদালতে ক্রয়চুক্তি বাতিল করার মিথ্যা দাবি করে এবং সাক্ষী পেশ করে আর বিচারক এর ভিত্তিতে তার পক্ষে রায় দিয়ে দেয়, তাহলে এরপর বিক্রেতার জন্য এ বাঁদীর সাথে সহবাস করা

হালাল হয়ে যাবে এবং তার জন্য এ বাঁদী থেকে খেদমত নেওয়াও হালাল হবে। যদিও তার জানা আছে যে, ক্রেতা ক্রয়চুক্তি বাতিল করার যে দাবি করেছে তা মিথ্যা। অথচ এখানে বিক্রেতা এ বাঁদীকে আযাদ করেও এ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার সুযোগ ছিল। কারণ তাহলে অন্যের বাঁদীর সাথে তার সহবাস করতে হত না। কিন্তু শরিয়ত এ বিচারকে জাহেরি বাতেনি উভয়ভাবে কার্যকর করে দিয়েছে। কারণ এমন না হলে তার মাল নষ্ট হওয়া আবশ্যক হবে।

তাই ইমাম সাহেব রহ. বলেন, এখানে পার্থক্য সৃষ্টিকারী এমন কী বিষয় রয়েছে যে, বাঁদীর ক্ষেত্রে সহবাস জায়েয হবে আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে জায়েয হবে না। (আসলে এমন কিছুই নেই)। এগুলো ছাড়াও ইমাম আবু সাহেবের অনেক দলিল রয়েছে, যা সংক্ষিপ্ততার কারণে এখানে আনা হয়নি, নচেৎ এ আলোচনায় একটি বড়সড় কিতাব তৈরি হতে পারে। কিন্তু আফসোস! এতসব শক্তিশালী দলিল ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আপনারা ইমাম সাহেবকে কুরআন-হাদিস বিরোধী বলছেন। মূলত আপনারা দুই কারণে এমন জঘন্য কথা বলতে পারেন। একটা হচ্ছে, হয়তো আপনারা নিজেরাই হাদিসের মর্ম বুঝেননি, অথবা জেনে বুঝে আপনারা এ অন্যায় পথের পথিক হয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টা আমরা আপনাদের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি না, কারণ কোনো মুসলমানের পক্ষে কী এটা সম্ভব যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে এধরনের কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেকে গুনাহগার বানাবে। আমরা বরং মনে করি, আপনাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। যাইহোক, এটা একটা ইজতেহাদি ভুল। এতে আপনারা মা'যুর। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সঠিক বুঝ ও সুস্থ বিবেক দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।

আপত্তি : তেরো

মদিনা মুনাওয়ারা হারাম শরিফ হওয়ার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে মদিনা হারাম শরিফ হিসাবে গণ্য

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী মদিনা হারাম শরিফ। যেমনটি বুখারি শরিফে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"[২২০]

মদিনা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারাম। এর গাছ কাটা যাবে না, এতে কোনো বিদআত কাজ করা যাবে না। যে ব্যক্তি মদিনায় কোনো বিদআত কাজ করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল লোকদের লানত।

ফিকহে হানাফিতে মদিনা হারাম শরিফ নয়

এবার হানাফিদের কথা শুনুন, ইবনে আবিদিন রহ. বলেন,

لا حرم للمدينة عندنا

---

২২০. বুখারী, হাদিস নং ১৮৬৭।

আমাদের মতে মদিনা হারাম নয়।[২২১]

ত্রয়োদশ আপত্তির জবাব

জবাব নং (১)

এ মাসআলাটি মতবিরোধপূর্ণ। এতে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমনটি আল্লামা আবদুর রহমান দামেশকি শাফিয়ি রহ. বলেছেন,

وقتل صيد حرم المدينة حرام وكذا قطع شجره وهل يضمن؟ للشافعي قولان الجديد الراجح منهما لا يضمن وهو مذهب أبي حنيفة والقديم المختار أنه يضمن بسلب القاتل والقاطع وهو مذهب مالك وأحمد.

অর্থাৎ মদিনার হারামে শিকার করা এবং গাছ কাটার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিয়ি রহ. এর একটি মত অনুযায়ী (যা প্রাধান্যপ্রাপ্তও এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতের সাথে সামঞ্জস্যশীলও) এতে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। আর ইমাম শাফিয়ির অন্য মত অনুযায়ী (যা ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ এর মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল) এতে জরিমানা দিতে হবে।[২২২]

আল্লামা নুরুদ্দিন আলি ইবনে আহমদ সাহমুদি বলেন,

اتفق الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى على تحريم صيد حرم المدينة واصطيادة وقطع شجرة وقال أبو حنيفة لا يحرم شيئ من ذلك.

অর্থাৎ ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ রহ. এ ব্যাপারে একমত যে, মদিনার হারামে শিকার করা এবং গাছ কাটা হারাম। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তা হারাম নয়।[২২৩]

---

২২১. রদ্দুল মুহতার : ২/২৫৬। কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৭।

২২২. রহমাতুল উম্মাহ : পৃষ্ঠা ১৪০।

২২৩. ওয়াফাউল ওয়াফা বি আখবারিল মুসতাফা : ১/১০৫।

এর দ্বারা বুঝা যায়, এ মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। প্রথম মতপোষণকারীরা হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরি ও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ., তাদের মতে মদিনা মুনাওয়ারা মক্কা মুকাররমার মত হারাম নয়। এব্যাপারে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আদেশ রয়েছে, তা হচ্ছে এর সম্মান বোঝানোর জন্য, এটা কোনো অত্যাবশ্যকীয়ভাবে পালনীয় আদেশ নয়। এজন্য সেখানে শিকার এবং গাছ কাটা জায়েয। যেমনটা রদ্দুল মুহতার : ২/২৭৮ এ আছে, মদিনার হারামে শিকার ও গাছ কাটা নাজায়েয হওয়ার জন্য দালিলে কাতঈ (কুরআন বা হাদিসে মুতাওয়াতির থেকে দলিল) দরকার, যা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মত পোষণকারীরা হচ্ছেন ইমাম যুহরি, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক রহ. ও আরো অনেকে, তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মদিনা মুনাওয়ারার হারাম মক্কার হারামের মত। যেখানে না শিকার করা জায়েয আছে এবং না গাছ কাটা জায়েয আছে। অবশ্য যদি কেউ শিকার করে ফেলে অথবা গাছ কেটে ফেলে তাহলে তাকে শুধু ইসতেগফার করতে হবে, মাফ চাইতে হবে, কোনো জরিমানা দিতে হবে না।[২২৪]

আল্লামা সামহুদি বলেন,

وقد اختلف القائلون بالتحريم في حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاء فعن أحمد روايتان وللشافعي أيضا قولان الجديد منهما عدم الضمان وهو قول مالك.

অর্থাৎ মদিনা মুনাওয়ারাকে মক্কা মুকাররমার মত হারাম বলে মত প্রদানকারীদের মধ্যেও গাছ কাটা এবং শিকার করার জরিমানা ও শাস্তির ক্ষেত্রে মতবিরোধ হয়েছে। ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফিয়ি থেকে দু' ধরনের মত বর্ণিত আছে, পরবর্তী মত হচ্ছে জরিমানা না দেওয়ার, আর এটা ইমাম মালেকেরও মত।[২২৫]

---

২২৪. ই'লাউস সুনান : ১০/৪৮৪।

২২৫. ওয়াফাউল ওয়াফা : ১/২০৮।

ইমাম নববি রহ. বলেন, "ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ি ও জুমহুর আলেমের মত হচ্ছে, মদিনার হারামে শিকার করা ও গাছ কাটা জরিমানা বিহিন হারাম।"[২২৬]

তৃতীয় মতটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবু যিবের। তিনি বলেন, মদিনার হারামে শিকার করলে জরিমানা আবশ্যক হবে। এ মতবিরোধ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে, এটা নিরেট একটা ইজতেহাদি মাসআলা।

জবাব নং (২)

আল্লামা তুরপশতী রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা যে, আমি মদিনাকে হারাম করেছি, এর দ্বারা সম্মান বোঝানো উদ্দেশ্য। এর দলিল হচ্ছে, মুসলিম শরিফের হাদিস, যাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদিনার গাছসমূহের পাতা যেন প্রাণীকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ছাড়া না ঝরানো হয়। অথচ মক্কার হারামের গাছের পাতা কোনো উদ্দেশ্যেই ঝরানো জায়েয নেই। বাকি রইল মদিনায় শিকার করা প্রসঙ্গ, তো কয়েকজন সাহাবি যদিও একে নাজায়েয বলেছেন, কিন্তু জুমহুর সাহাবিগণ একে নাজায়েয বলেননি। আর মদিনায় শিকার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসও প্রমাণিত নেই।

---

২২৬. আশি'আতুল লামআত : ২/৩৮৮।

আপত্তি : চৌদ্দ

ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাতে কেরাতের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

সুরা ফাতেহা ও নামায

নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

যে ব্যক্তি নামাযে সুরা ফাতেহা পড়ে না তার নামায হয় না।[২২৭]

ফিকহে হানাফি ও সুরা ফাতেহা

হানাফিরা এ হাদিসের এ জবাব দেয় যে, এ হাদিসটি একাকী নামায আদায়কারীর জন্য, মুক্তাদীর জন্য নয়। এখন দেখুন, হানাফিরা একাকী নামায আদায়কারীকেও সুযোগ করে দিচ্ছে,

হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

والقراءة فى الفرض واجبة فى الركعتين.

আর কেরাত ফরয নামাযের মধ্যে কেবল দুই রাকাতেই ওয়াজিব।

---

২২৭. বুখারী : ৭৫৬।

وهو مخير فى الأخريين معناه إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح كذا روي عن أبي حنيفة[٢٢٨]

শেষ দুই রাকাতে নামাযীর স্বাধীনতা রয়েছে, চাইলে সে চুপ থাকবে আর চাইলে কেরাত পড়বে, আবার চাইলে সে তাসবিহও পড়তে পারে। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে এমনই বর্ণিত আছে।[২২৯]

চতুর্দশ আপত্তির জবাব

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

يقرأ فى الأولين ويسبح فى الأخريين.

প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়বে আর শেষ দুই রাকাতে তাসবীহ পড়বে।[২৩০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে,

قالا يقرأ فى الأولين ويسبح فى الأخريين.

এ দুই হযরত বলেছেন, প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়বে এবং শেষ দুই রাকাতে তাসবিহ পড়বে।[২৩১]

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় তো পূর্ণ একটি অনুচ্ছেদ باب من كان يقول يسبح فى الأخريين ولا يقرأ এব্যাপারে রয়েছে, যাতে এধরনের সকল আসার সনদসহ একত্র করা হয়েছে। তাই যদি কেউ এব্যাপারে আপত্তি তোলে, তাহলে তার আপত্তি বাস্তবিক অর্থে হযরত আলি ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উপরেই হবে, ফিকহে হানাফির উপর নয়। আর এ হযরতদ্বয়ের উপর আপত্তি তোলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ তারা

---

২২৮. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ১২৮।
২২৯. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৭,৩৮।
২৩০. মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা : ১/৩৭২।
২৩১. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ১/৩৭২।

সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজসমূহ কাছ থেকে দেখেছেন, এগুলো আত্মস্থ করেছেন এবং এগুলোর উপর আমল করেছেন।

বাকি হানাফি মাযহাবের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে, তাতে সকল আসারের প্রতি লক্ষ্য রেখে শেষ দুই রাকাতে ফাতেহা পড়াকে সুন্নত বলা হয়েছে, আর এটাই জাহেরুর রেওয়ায়েহ। যেমনটা তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ পৃষ্ঠা ১৪' এর মধ্যে আছে,

আর ফিকহে হানাফির মূলনীতি হচ্ছে, যখন যাহেরুর রেওয়ায়েহ ও গায়রে যাহেরুর রেওয়ায়েহ এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তখন যাহেরুর রেওয়ায়েহর মাসআলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এজন্য ফিকহে হানাফিতেও শেষ দুই রাকাতে ফাতেহা পড়া সুন্নত হওয়াটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর হিদায়ার ইবারত, যা গায়রে যাহেরুর রেওয়ায়েহ, এর সূত্র হচ্ছে, হযরত আলি ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রদত্ত মত।

আপত্তি : পনেরো

নামায ধীরস্থিরভাবে পড়ার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলাম ও ধীরস্থিরভাবে নামায

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে নামায দোহরানোর হুকুম দিচ্ছেন, যে রুকু ধীরস্থিরভাবে করছিল না। এ হাদিসটিকে ইমাম বুখারি রহ. এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا»

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তার সাথে আরেক ব্যক্তিও প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল। এরপর সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম দিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। সে পুনরায় নামায পড়ল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে রাসুলকে সালাম দিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবারও বললেন, ফিরে যাও এবং পুনরায় নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। এভাবে তিনি তার সাথে তিন বার করলেন। এরপর লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে ভাল করে নামায পড়তে পারি না। অতএব আপনি আমাকে নামাযের পদ্ধতি শিখিয়ে দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবির বল, এরপর কুরআন থেকে তোমার জন্য যতটুকু পড়া সহজ হয় পড়, এরপর ধীরস্থিরভাবে রুকু কর, এরপর ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াও, এরপর ধীরস্থিরভাবে সেজদা কর, এরপর ধীরস্থিরভাবে বস, এরপর ধীরস্থিরভাবে সেজদা কর। এভাবে তুমি নামায আদায় কর।

ফিকহে হানাফি ও ধীরস্থিরভাবে নামায

এবার হানাফিদের ফাতওয়া শুনুন। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে আছে,

أجمعوا على أن الاعتدال في قومة الركوع ليس بواجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في الظهيرية وكذا الطمأنينة في الجلسة. هكذا في الكافي(٧١/١)

হানাফি ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রুকুর পর দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রহ এর নিকট ওয়াজিব নয় এবং সেজদার বৈঠকেও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা ওয়াজিব নয়।[২৩২]

---

২৩২. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ও হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯।

পঞ্চদশ আপত্তির জবাব

হানাফি ফকিহগণের মতে রুকু ও সেজদা ধীরস্থিরভাবে করা ওয়াজিব। ধীরস্থিরতা তিন ধরনের হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে ঐ ধীরস্থিরতা, যা অবলম্বন করলে রুকু ও সেজদা পূর্ণাঙ্গ হয় এবং তা ছাড়া রুকু ও সেজদা একেবারে হয়ই না। আর তা হচ্ছে প্রথম দফার নড়াচড়া শেষ হয়ে যাওয়া। এটা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর নিকট ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতে এটা ফরয। অর্থাৎ রুকুর দিকে ঝুকার সময় যে নড়াচড়া তা পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ হয়ে যাওয়া এবং রুকুর অবস্থা শুরু হয়ে যাওয়া। এমনিভাবে সেজদার দিকে ঝুকার সময় যে নড়াচড়া তা পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ হয়ে যাওয়া এবং সেজদার অবস্থা শুরু হয়ে যাওয়া। আর তা তখনই হবে যখন প্রত্যেকটি জোড়া নিজ জায়গায় চলে আসবে। যেমনটি আল্লামা বারকালী মুআদ্দিলুস সালাতে লিখেছেন।

ধীরস্থিরতার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে রুকু ও সেজদার অবস্থা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর এ অবস্থাতেই এক তাসবিহ পরিমাণ থাকা। এটা অন্যান্য হযরতগণের নিকট ওয়াজিব আর ইমাম আবু হানিফা রহ. এর থেকে রেওয়ায়েত হচ্ছে এটা সুন্নত। আর ধীরস্থিরতার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে রুকু ও সেজদার অবস্থা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর তিন তাসবিহ পরিমাণ এ অবস্থাতেই থাকা। এটা সুন্নত। একেই আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ইমাম তহাবি রহ. থেকে নকল করে লেখেন, কোনো কোন হযরত এমন বলেছেন, তিন তাসবিহ পরিমাণ রুকু ও সেজদায় থাকা এটা রুকু ও সেজদার পরিমাণ।

وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ ثم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.[٢٣٣]

আর অন্যান্যরা এ মতটির বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি রুকুতে স্থির হয়ে যায় এবং সেজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে তাহলে তাও জায়েয হবে। আর এটা হচ্ছে আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মত।

---

২৩৩. ফাতহুল বারী : ১/৪২২।

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আল্লামা ওয়াহিদুয যামান সাহেব বলেন, রুকুর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি ধীরস্থিরতার সাথে এতটুকু পরিমাণ ঝুকা যে, সে তার হাতের তালু নিজ হাঁটুতে লাগাতে পারে। তাই যদি সে ঝুকার সময়ের নড়াচড়া এবং ওঠার সময়ের নড়াচড়ার মাঝে পার্থক্য না রাখে তাহলেও তার নামায জায়েয হয়ে যাবে। [২৩৪]

হানাফিগণের মতে হাদিসে একজন সাহাবিকে যে ধীরস্থিরভাবে নামায পড়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এর দ্বারা রুকু ও সেজদা পূর্ণ হওয়া পরিমাণ ধীরস্থিরতাও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং এর বেশিও উদ্দেশ্য হতে পারে। যদি এর দ্বারা ততটুকু পরিমাণ ধীরস্থিরতা উদ্দেশ্য হয়, যা দ্বারা সেজদা ও রুকু পূর্ণ হয় তাহলে তা হানাফিগণের মতেও ফরয। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার রুকু সেজদা না হওয়ার কারণে নামাযই হবে না।

ইমাম বুখারির কথার ধরন থেকেও এমন মনে হয় যে, তিনি এ ধীরস্থিরতাকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা ব্যতীত রুকু সেজদা পূর্ণ হয় না। কারণ তিনি অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, باب إذا لم يتم الركوع এবং باب أمر النبي عليه الصلوة والسلام الذي لا يتم ركوعه بالإعادة। এরপর তিনি ঐ নামাযের শিক্ষা সম্পর্কিত রেওয়ায়েতটিই উল্লেখ করেছেন।[২৩৫]

শিরোনাম দুটির অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি রুকু পূর্ণ না করে তার হুকুম প্রসঙ্গে, আর ঐ ব্যক্তিকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পুনরায় পড়ার আদেশ প্রসঙ্গে, যে রুকু পুরা করেনি। এছাড়া রুকু ও সেজদার পূর্ণতা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ রয়েছে,

لا تجزء صلوة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود.[٢٣٦]

মানুষের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় হয় না, যতক্ষণ না সে রুকু সেজদায় তার পিঠকে সোজা না করে।

---

২৩৪. নুযুলুল আবরার : ১/৭৮।

২৩৫. বুখারী : ১/১০৯।

২৩৬. আবু দাউদ : ১/১২৪।

আর যদি হাদিসে রুকু ও সেজদায় চলে যাওয়ার পর আরো কিছুক্ষণ ধীরস্থিরভাবে অবস্থান করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা একটা বিরোধপূর্ণ মাসআলা। ইমাম সাহেব রহ. একে সুন্নত, অন্যান্য হানাফি ফকিহগণ একে ওয়াজিব আর শাফিয়িগণ একে ফরয বলেছেন। ফরয না হওয়ার দলিল হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরস্থিরতা অবলম্বন না করাকে নামাযের ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আর নামাযে কোনো সুন্নত ছেড়ে দিলে নামায মাকরুহ অবস্থায় সহিহ হয়। এ কারণে ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে ইমাম সাহেব ও ইমাম মুহাম্মদের নিকট মাসআলার যে সুরত ছিল, একে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

فإن ترك الطمأنينة تجوز صلوته عند أبي حنيفة ومحمد.[২৩৭]

সুতরাং নামাযী যদি ধীরস্থিরভাবে নামায না পড়ে তাহলে তার নামায ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতে হয়ে যাবে। আর এ ধীরস্থিরতার দ্বারা উদ্দেশ্য তাসবিহ পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি ধীরস্থিরতা। এরপরে আলমগিরিতে আছে, যদি কেউ শুধু একবার তাসবিহ পড়ে তাহলে এটা জায়েয হবে, তবে মাকরুহ হবে।

আলমগিরির উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, এটা ফরয ওয়াজিব স্তরের কোনো আমল নয়, বরং এর চেয়ে নিচু স্তরের। এজন্যই ইমাম সাহেব থেকে এর সুন্নাত হওয়ার রেওয়ায়েত করেছেন, অথচ হানাফিগণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক মত হচ্ছে এটা ওয়াজিব হওয়া। যা কেউ ভুলে ছেড়ে দিলে সাহু সেজদা আবশ্যক হয়, আর জেনে বুঝে ছেড়ে দিলে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক হয়।[২৩৮]

---

২৩৭. আলমগিরী : ১/৭৪।

২৩৮. দেখুন, আল বাহরুর রায়েক : ১/২৯৯, ৩০০, বেহেশতী যেওর : ১১৯।

আপত্তি : ষোলো

সাত অঙ্গের উপর সেজদা করার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে সেজদা করার পদ্ধতি

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ[২৩৯]

আমাকে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন সাতটি হাঁড়ের উপর সেজদা করি– কপালের উপর; একথা বলে তিনি তার নাকের দিকে ইশারা করলেন, এবং উভয় হাতের উপর, উভয় হাঁটুর উপর ও উভয় পায়ের আঙ্গুলের উপর, আর যেন কাপড় ও চুল না সামলাই।

ফিকহে হানাফিতে সেজদার পদ্ধতি

চিন্তা করুন, এ হুকুম প্রদানকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে? আল্লাহ তায়ালার এ হুকুমের উপর হানাফিরা কীভাবে আমল করে, লক্ষ করুন, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে–

---

২৩৯. বুখারী, হাদিস নং ৮১২।

ولو ترك وضع اليدين والركبتين جازت صلاته بالإجماع كذا فى السراج الوهاج (٧٠/١)"[٢٤٠]

ষোড়ষ আপত্তির জবাব

আমাদের হানাফি মাযহাব এ হাদিসের অনুরূপই, যা আপত্তি উত্থাপনকারী তার আপত্তি প্রমাণ করার জন্য নকল করেছেন। আলমগিরির মাসআলা নিরুপায় ব্যক্তির জন্য।

হানাফি মাযহাবে সাত হাড়ের উপর সেজদা করার হুকুম লক্ষ্য করুন,

১. মাওলানা মুফতি জামিল আহমদ নযিরী হানাফি লেখেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে সাত হাঁড়ের উপর সেজদা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের কিনারা এবং আমি যেন না গুটাই আমার কাপড় ও চুলকে।[২৪১]

নোট : আমরা শুধু হাদিসের অনুবাদ নকল করেছি, আরবি ইবারত নকল করিনি।

(২) মাওলানা শায়েখ ইলিয়াস ফয়সাল হানাফি লেখেন, সেজদা হচ্ছে সাত হাড্ডিকে যমিনে রাখার নাম। যদি এগুলোর কোনো একটিও জমিন থেকে আলাদা থাকে তাহলে ঐ অনুপাতেই সেজদাটি অসম্পূর্ণ হবে। সেজদার অঙ্গসমূহের উল্লেখ হাদিসে এসেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন সাতটি হাড্ডির উপর সেজদা করি, কপাল, এবং তিনি নাকের দিকে ইশারা করলেন, উভয় হাতের উপর, উভয় হাঁটুর উপর এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের উপর। আর (আমাদের এ হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে,) আমরা যেন নামাযে

---

২৪০. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৩৯, ৪০।

২৪১. বুখারী : পৃষ্ঠা ১১২, মুসলিম : ১/১৯৩, রাসূলে আকরাম কা তরিকায়ে নামায : ১৯৩।

কাপড় ও চুল না গুটাই। (বুখারি : باب السجود على الأنف) আমরা শুধু অনুবাদ নকল করেছি, আরবী ইবারত নকল করিনি।[২৪২]

৩. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইরশাদ কাসেমী হানাফি মাদ্দা জিল্লুহু লেখেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে সাত হাড়ের উপর সেজদা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, কপালের উপর এবং তিনি তার হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করলেন (অর্থাৎ কপাল ও নাককে একটি অঙ্গ ধরেছেন) এবং উভয় হাতের উপর, হাঁটুর উপর এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলের মাথার উপর আর এই যে, আমি যেন কাপড় ও চুল না গুটাই।

সেজদায় সাতটি অঙ্গ ব্যবহার করা জরুরি। কপাল ও নাক একটি অঙ্গ হিসাবেই গণ্য। ইবনে মাজাহ তাউসের মত নকল করেছেন যে, তিনি উভয়টাকে এক অঙ্গ বলে গণ্য করতেন।[২৪৩]

৪. হযরত মাওলানা ফয়েয আহমদ হানাফি লেখেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান ইরশাদ রয়েছে যে, আমি এ কথার আদেশপ্রাপ্ত যে, আমি সাতটি অঙ্গের উপর সেজদা করব; কপাল, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের কিনারা অর্থাৎ সেজদা এমনভাবে করা হবে যে, এ সাতটি অঙ্গ জমিনে রাখা থাকবে।[২৪৪]

৫. মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা সুফি আবদুল হামিদ খান আখতার সোয়াতী লেখেন, সেজদা করার সময় সাতটি অঙ্গ জমিনে রাখবে, উভয় হাঁটু, উভয় হাত, উভয় পা এবং কপাল নাকসহ।[২৪৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি

---

২৪২. নামাযে পয়গামবর : পৃষ্ঠা ১৫০।

২৪৩. ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা ৬৩, সুন্নত মত নামায পড়ুন : পৃষ্ঠা ৬৭,৬৮।

২৪৪. বুখারী : ১/১১২, মুসলিম : ১/১৯৩, মেশকাত : পৃষ্ঠা ৮৩ আরবীতে নকল করা হয়নি, নামাযে মুদাল্লাল : পৃষ্ঠা ১১৪।

২৪৫. হেদায়া : ১/৭০, শরহে নেকায়া : পৃষ্ঠা ১/৭৮, কাবীরী : পৃষ্ঠা ৩২১।

যেন সাত অঙ্গ (সাত হাড্ডির উপর সেজদা করি, কপাল নাকসহ, উভয় হাত, উভয় হাঁটু, উভয় পা। আর এ হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযে কাপড় ও চুল না গুটাই।[২৪৬]

৬. মাওলানা ইরশাদ আহমদ ফারুকী মাদ্দা যিল্লুহূ হানাফি লেখেন, ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটি হাঁড়ের উপর সেজদা করার এবং তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের দিকে।[২৪৭]

সম্মানিত পাঠক, আমরা ছয়টি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করলাম, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত হাদিসের অনুরূপ। আপত্তি উত্থাপনকারী খামোখাই এ বিষয়টিকে হাদিসের পরিপন্থী বলছেন।

আলমগিরির মাসআলার সমাধান

এ পর্যায়ে এ বিষয়টির অবতারণা করার তো প্রয়োজন ছিল না, কারণ আপনাদের তো হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত জানাই হয়ে গেছে, যা থেকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বুঝে আসে যে, আলমগিরির এ মাসআলা কোনো অক্ষম ও অপারগ ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকবে। তবু আমরা প্রথমে সেজদা সম্পর্কে আলমগিরির হুকুম লিখছি, এরপর আমরা সমাধান পেশ করছি।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে আছে, চতুর্থ অনুচ্ছেদ নামাযের আমলসমূহ সম্পর্কে। এ অনুচ্ছেদে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, প্রথম পরিচ্ছেদ নামাযের ফরযসমূহ সম্পর্কে, এরপর পৃথক পৃথকভাবে সকল ফরযের হুকুম লেখা হয়েছে। সেজদাকে ফরযের মধ্যে গণ্য করে লেখা হয়েছে–

আর এগুলোর মধ্যে একটি হল সেজদা, দ্বিতীয় সেজদাও প্রথম সেজদার মত ফরয ইজমায়ে উম্মাতের কারণে। এটা যাহিদীতে আছে।[২৪৮]

---

২৪৬. বুখারী : ১/১১২, মুসলিম : ১/১৯৩, নামাযে মাসনূন কালাঁ : পৃষ্ঠা ৩৬১।

২৪৭. মুসলিম : ১/১৯৩, ই'লাউস সুনানঃ ২/১৯, আহকাম ওয়া আদাবে তহারাত, ওযূ আওর নামায : পৃষ্ঠা ১১১।

২৪৮. ফাতাওয়া আলমগিরী উর্দু : ১/১০৯।

এরপর সেজদা করার সুন্নত তরিকা লেখা হয়েছে–

আর সেজদার পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত তরিকা হচ্ছে, কপাল ও নাক উভয়টাকে সেজদার মধ্যে জমিনে লাগানো। এর কিছু পরে এ মাসআলা লেখা হয়েছে–

হুজ্জাত কিতাবে আছে, যদি সেজদার জায়গায় অনেক কাঁটা অথবা কাঁচের টুকরা থাকে আর সেজন্য সেখান থেকে মাথা উঠিয়ে অন্য জায়গায় রাখে, তাহলেও জায়েয হবে এবং এটা দ্বিতীয় সেজদা হিসাবে গণ্য হবে না, বরং পুরোটা মিলে একটা সেজদাই হবে। এটি তাতারখানিয়ায় আছে।

এরপর ঐ মাসআলা লেখা হয়েছে, যা আপত্তি উত্থাপনকারী নকল করেছেন। আপত্তি উত্থাপনকারী সম্পূর্ণ ভুল অনুবাদ করেছেন, যার কারণে মাসআলার ধরনই পাল্টে গেছে। আলমগিরিতে আলোচনা চলে আসছে কাঁটা ও কাঁচের, অর্থাৎ যদি সেজদা করার জায়গায় কাঁটা বা কাঁচের টুকরা থাকে, তাহলে নামাযী কী করবে? এ মাসআলা লেখা হয়েছে এমন নামাযীর ব্যাপারে, যে বাস্তবিক অর্থেই অপারগ যে, সে যদি হাত ও হাঁটু না রাখে তাহলে সর্বসম্মতভাবে নামায হয়ে যাবে। এটা সিরাজুল ওয়াহহাজে আছে। অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারায় সেজদা করে নিবে।[২৪৯]

২৪৯. ফাতাওয়া আলমগিরী : ১/১০৯,১১০।

আপত্তি : সতেরো

কুকুর ও গাধার গোশতের ব্যবসার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে হিংস্র প্রাণীর ব্যবসা

আবু মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ[২৫০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, পতিতা ও জাদুকরের উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন।

ফিকহে হানাফিতে হিংস্র প্রাণীর ব্যবসা

এবার হানাফিদের কথাও শুনুন। হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء.

কুকুর, বাঘ ও হিংস্র প্রাণী, চাই প্রশিক্ষিত হোক বা না হোক এগুলোর ব্যবসা জায়েয।[২৫১]

---

২৫০. বুখারী : হাদিস নং ২২৩৭।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে (৩/১১৫) এটাও আছে,

إذا ذبح كلبه وباع لحمه جاز وكذا إذا ذبح حماره وباع لحمه ويجوز بيع لحوم السباع والحمر المذبوحة فى الرواية الصحيحة.

যদি নিজ কুকুরকে জবাই করে এর গোশত বিক্রি করে, তাহলে জায়েয হবে। একই হুকুম নিজ গাধা জবাই করে এর গোশত বিক্রি করার ক্ষেত্রেও। সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হিংস্র প্রাণীর গোশত ও জবাইকৃত গাধার গোশত বিক্রি করা জায়েয।[২৫২]

সপ্তদশ আপত্তির জবাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মত হচ্ছে, হাদিসগুলোতে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা ঐ যুগের সাথে সম্পৃক্ত যখন কুকুরের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান অত্যন্ত কঠোর ছিল। আর এর কারণ ছিল, আরবদের অস্বাভাবিক কুকুরপ্রীতি এবং তাদের গৃহসমূহে শখ করে কুকুর পালনের প্রচলন। কুকুরের প্রতি তাদের এ প্রীতি, ভালবাসা ও হৃদ্যতাকে তাদের অন্তর থেকে বের করার জন্য প্রথম প্রথম অত্যন্ত কঠোর বিধান দেওয়া হয়েছিল, যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে শিথিল করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, প্রয়োজনের খাতিরে কুকুর রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে শখ করে কুকুর রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হাদিসগুলো লক্ষ্য করুন–

عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ،

হযরত ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম অবস্থায়) কুকুর হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, কুকুর লোকদের কী ক্ষতি করে। এরপর তিনি

---

২৫১. হেদায়া আখেরাইন : পৃষ্ঠা ১০৩।

২৫২. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪০, ৪১।

শিকারী কুকুর এবং ছাগলপাল (হেফাজত) এর (জন্য) কুকুর পালনের অনুমতি দিয়েছেন।[২৫৩]

এ হাদিসে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

১. প্রথম পর্যায়ে কুকুর হত্যা করার হুকুম ছিল।

২. এরপর হত্যা করার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৩. এরপর শিকারী কুকুর ও ছাগলপাল হেফাজতের কুকুর পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শিকার করার জন্য এবং ক্ষেত ও পশুপাল রক্ষার জন্য কুকুর পালনের অনুমতি সম্বলিত সুস্পষ্ট রেওয়ায়েতসমূহ আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা ও সুফিয়ান ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে।[২৫৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ»[٢٥٥]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকার করা এবং পশুপাল ও জমিন হেফাজতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করবে, এর শাস্তি স্বরূপ তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত করে কমতে থাকবে। এ হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, এ তিন কারণে কুকুর পালনের অনুমতি রয়েছে। এ অনুমতি পরবর্তী যুগেরই, যখন কুকুর হত্যার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছিল।

কুরআনে পাকেও কুকুরের শিকারের প্রসঙ্গ এসেছে–

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

---

২৫৩. মুসলিম শরিফ : ২/২৫।

২৫৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারাআহ।

২৫৫. মুসলিম মুতারজাম : ৪/৩০৬, হাদিস নং ৮১৯৩।

অতএব খাও ঐ শিকার থেকে, যা (শিকারী কুকুর ইত্যাদি) মেরে তোমাদের জন্য রেখে দিয়েছে এবং এর উপর আল্লাহর নাম পড়।[২৫৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন,

إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل.

যদি তুমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উপর ছেড়ে দাও আর ঐ কুকুর শিকার ধরে, তাহলে এমন শিকার খাওয়া তোমার জন্য জায়েয।[২৫৭]

এ রেওয়ায়েতগুলোর আলোকে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যখন কোনো জায়েয প্রয়োজনে কুকুর পালন করা এবং এর থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে তখন স্পষ্টতই এর ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয হবে। একারণেই যে সকল রেওয়ায়েতে কুকুরের ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলোতে প্রয়োজনের কুকুরকে সেই হুকুমের বাইরে রাখার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। সামনের রেওয়ায়েতগুলো লক্ষ্য করুন–

عن جابر أن النبي عليه الصلوة والسلام نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد.[٢٥٨]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল ও কুকুরের বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন, তবে শিকারের কুকুরের ব্যাপার ভিন্ন।

عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.[٢٥٩]

---

২৫৬. সুরা মায়েদা, আয়াত ৪।

২৫৭. নাসাঈ : ২/১৯২।

২৫৮. নাসাঈ, কিতাবুস সইদ : ২/১৯৫, দারাকুতনী : ৩/৭৩, সুনানে কুবরা বাইহাকী : ৬/৬, মুসনাদে আহমদ : ৩/৩১৭।

২৫৯. তিরমিযী : ১/১৫৪, সুনানে দারাকুতনী : ৩/৭৩, সুনানে কুবরা বাইহাকী : ২/৬।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন কুকুরের মূল্য থেকে, কিন্তু শিকারী কুকুরের কথা ভিন্ন। অর্থাৎ তা থেকে নিষেধ করেননি।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب الصيد.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী কুকুরের মূল্য নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[২৬০]

এছাড়া তহাবি ও সুনানে কুবরা বায়হাকিতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর সুনানে বায়হাকিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি কারো শিকারী কুকুরকে হত্যা করে ফেলল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما. অর্থাৎ ঐ কুকুরের হত্যাকারীকে এর মালিককে চল্লিশ দিরহাম ও বিশ উটের জরিমানা আদায় করার ফায়সালা দিলেন।[২৬১]

যদি শিকারী কুকুরের কোনো মূল্য না থাকত, তাহলে উল্লিখিত ফায়সালা কোনো অবস্থাতেই দেওয়া হত না।

এ সকল রেওয়ায়েতে শিকারী কুকুর বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আর ক্ষেত ও পশুপাল রক্ষার কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি এর উপর কেয়াস করা দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর আপত্তি উত্থাপনকারী যে সকল রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন তা ইসলামের প্রথম যুগের, যখন কুকুর হত্যার হুকুম ছিল। এরপর যখন শিকার, ক্ষেত ও পশুপাল রক্ষার জন্য কুকুর রাখার অনুমতি দেওয়া হল, তখন এর কিছুকাল পর শিকারী কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতিও দেওয়া হল।

---

২৬০. মুসনাদে ইমাম আযম : পৃষ্ঠা ১৬৯, নাসবুর রায়াহ : ৪/৫৪।

২৬১. বাইহাকী : ৮/৬, তহাবি : ২/২২৮।

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরির উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ

আপত্তি উত্থাপনকারী আলমগিরির যে মাসআলা নকল করেছেন, এর জবাব আমাদের পক্ষ থেকে মাওলামা মুহাম্মদ আইয়ুব অনেক বিস্তারিতভাবে মাওলানা আবদুল আজিজ নুরুসতানি গায়রে মুকাল্লিদকে দিয়েছেন। আমরা পাঠকের উপকারার্থে তাও এখানে তুলে ধরছি। এ প্রশ্নটি আবদুল আজিজ নুরুসতানি তার পুস্তিকায় হানাফি আলেমগণের কাছে করেছিল। মাওলানা আইয়ুব সাহেব এর জবাবে লেখেন,

যেমনিভাবে হাদিসের কিতাবসমূহে কিছু হাদিস সহিহ, কিছু রহিত এবং কিছু যয়িফ ও মাতরুক (পরিতাজ্য) হয়, এমনিভাবে ফিকহের কিতাবসমূহ এবং এগুলোর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফাতাওয়ার মধ্যেও কিছু মত مفتى به (ফাতওয়াযোগ্য) معمول به (আমলযোগ্য) থাকে। এ মতগুলোকেই হানাফি মাযহাব হিসাবে গণ্য করা হয়। এর বিপরীতে কিছু غير مفتى بها (ফাতওয়াযোগ্য নয়) مرجوح (প্রাধান্যপ্রাপ্ত নয়) এবং شاذ (মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন) মত থাকে, এগুলোকে মাযহাব হিসাবে গণ্য করা হয় না।

তাই মারজুহ ও গায়রে মুফতা বিহা মতামতকে পুঁজি করে হানাফি মাযহাবের উপর আপত্তি উত্থাপন করা এটা হাদিস অস্বীকারকারী দলের চরিত্র হতে পারে, কোনো মুসলমানের নয়। কেননা হাদিস অস্বীকারী দলের লোকেরাও যয়িফ ও জাল হাদিসকে পুঁজি করে হাদিসের অমূল্য ভাণ্ডারকে অস্বীকার করে এবং ইসলামের উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে। আসল মাসআলা হচ্ছে, কেউ যদি কুকুর ও গাধাকে শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করে এর গোশত বিক্রি করে, তাহলে এটা জায়েয হবে কিনা? এব্যাপারে হানাফি ফকিহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ জায়েযের পক্ষে মত দিয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ হানাফি মুহাক্কিক নাজায়েযের পক্ষে মত দিয়েছেন। যারা জায়েয মনে করেন তারা বলেছেন, জবাই করার পর এর গোশত থেকে নাপাকি দূর হয়ে যায়। আর যারা বিক্রয় করাকে নাজায়েয মনে করেন, তারা বলেন, জবাই করার দ্বারা গোশত থেকে নাপাকি দূর হয় না। এটাই হানাফি মাযহাবের ফাতওয়াযোগ্য ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

গায়রে মুকাল্লিদদের আপত্তি হল প্রথম মতের উপর।

গায়রে মুকাল্লিদদের খেয়ানত

গায়রে মুকাল্লিদরা ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী থেকে অর্ধেক ইবারত নকল করেছেন এবং এ মাসআলায় আলমগিরীতে যে মতবিরোধ বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে কবুতরের মত চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। আলমগিরিতে উল্লিখিত মাসআলার পর লেখা আছে,

وهذا فصل اختلف المشائخ فيه بناه على اختلافهم في طهارة هذا اللحم بعد الذبح.[٢٦٢]

এটি একটি পরিচ্ছেদ, মাশায়েখ এব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন, তাদের এ মতবিরোধের ভিত্তি হচ্ছে জবাইয়ের পর এ গোশতের ব্যাপারে তাদের মতবিরোধের উপর।

এমনিভাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী লেখেন,

فالظاهر منهما أن هذا الحكم على القول بطهارة عينه[٢٦٣]

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, এ হুকুমটির ভিত্তি হচ্ছে (ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়া ও নাজায়েয হওয়া) এর সত্তা পবিত্র হওয়ার উপর।

অর্থাৎ যারা জবাই করার পরও গোশতকে নাপাক বলেন তাদের মতে এর ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েয আর যারা বলেন যে, জবাই করার পর গোশত থেকে নাপাক দূর হয়ে যায় তাদের মতে এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। যদিও আলমগিরি ইত্যাদিতে আছে, "উল্লিখিত গোশতের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার প্রমাণ সহিহ রেওয়ায়েতে আছে।"[২৬৪]

কিন্তু ফাতওয়া নাপাক হওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয হওয়ার উপর। যেমনটা ইমাম বুখারি সহিহ বুখারিতে উরু সতর হওয়ার ব্যাপারে দুটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

---

২৬২. ফাতাওয়া আলমগিরী : ৩/১১৫।

২৬৩. আল বাহরুর রাইক : ১/১০৩।

২৬৪. ফাতাওয়া আলমগিরী : ৩/১১৫।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত থেকে মনে হয় যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর রেওয়ায়েত থেকে মনে হয় যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। উভয় রেওয়ায়েতই সহিহ। কিন্তু আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতের ব্যাপারে ইমাম বুখারি রহ. লেখেন, وحديث أنس أسند অর্থাৎ আর আনাসের হাদিস অধিক নির্ভরযোগ্য।[২৬৫]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতকে অধিক সহিহ বলা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইমাম বুখারির মতও এমন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তার মতে مفتى به ফাতওয়াযোগ্য মত এটা যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হানাফি মাযহাবের مفتى به ফাতওয়াযোগ্য মত

হানাফিগণের ফাতওয়াযোগ্য মত হচ্ছে, জবাই করার পর কুকুর ও গাধার গোশত থেকে নাপাক দূর হয় না, তাই এসব বিক্রি করাও জায়েয নেই।

সাহেবে বাহরুর রায়েক লেখেন,

وصح فى الأسرار والكفاية والتبيين نجاسة.[٢٦٦]

সাহেবে আসরার, সাহেবে কেফায়া ও সাহেবে তাবয়িন উক্ত গোশত নাপাক হওয়ার মতকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। বাহরুর রায়েকে আছে,

و فى المعراج أنه قول محققين من أصحابنا.[٢٦٧]

মি'রাজ কিতাবে আছে, উল্লিখিত গোশত নাপাক হওয়াটা হানাফি মুহাক্কিকগণের মত। সাহেবে বাহরুর রায়েক আরো লেখেন,

وفى الخلاصة وهو القول المختار واختاره قاضي خان فى التبيين إنه قول أكثر المشائخ.[٢٦٨]

---

২৬৫. বুখারী : ১/৫৩।
২৬৬. আল বাহরুর রায়েক : ১/১০৬।
২৬৭. আল বাহরুর রায়েক : ১/১০৬।
২৬৮. আল বাহরুর রায়েক : ১/১০৬।

খোলাসায় আছে, (উল্লিখিত গোশত নাপাক হওয়ার মতই) গ্রহণযোগ্য মত এবং কাযি খান একেই গ্রহণ করেছেন। তাবয়িনে আছে, এটা অধিকাংশ মাশায়েখের মত।

সাহেবে বাহার নিজেও নাপাক হওয়ার মতের ব্যাপারে বলেছেন, وهو الصحيح এটাই বিশুদ্ধ মত।[২৬৯]

সাহেবে দুররে মুখতার লেখেন,

لا يطهر لحمه هذا صح ما يفتى به.

এর গোশত পবিত্র হয় না, এটাই আসল কথা, যার উপর ফাতওয়া দেওয়া যায়।

মাওলানা আবদুল হাই হানাফি লেখেন,

قال كثير من المشائخ أنه يطهر جلده لا لحمه وهو الأصح.[٢٧٠]

অনেক মাশায়েখ বলেছেন, (জবাই করার পর) এর চামড়া পবিত্র হয়, গোশত পবিত্র হয় না। আর এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত।

আল্লাম ইবনুল হুমাম হানাফি লেখেন,

قال كثير من المشائخ أنه يطهر جلده لا لحمه وهو الأصح واختاره الشارحون.

অনেক মাশায়েখ বলেছেন, (জবাই করার পর) এর চামড়া পবিত্র হয়, গোশত পবিত্র হয় না। আর এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। একেই ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা শুরুমবুলালি লেখেন,

وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به.

---

২৬৯. আল বাহরুর রায়েক : ১/১০৬।

২৭০. হেদায়ার টীকা : ১/২৪।

শরয়ি পদ্ধতির জবাই যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম, এগুলোর চামড়াকে পবিত্র করে, গোশতকে পবিত্র করে না। অধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এর উপরই ফাতওয়া দেওয়া হবে।

সাহেবে খোলাসা লেখেন,

وهو المختار وبه أخذ الفقيه ذكره صدر الشهيد في صيد الفتاوى.[২৭১]

এটাই গ্রহণযোগ্য মত। ফুকাহায়েকেরাম একেই গ্রহণ করেছেন। সাহেবে মারাকিল ফালাহ লেখেন,

دون لحمه فلا يطهر على أصح ما يفتى به.[২৭২]

বিশুদ্ধতর ফাতওয়াযোগ্য মতে জবাই করার দ্বারা হারাম গোশত পবিত্র হয় না।

সাহেবে কাবিরি লেখেন,

الصحيح أن اللحم لا يطهر بالذكاة.[২৭৩]

বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হারাম প্রাণীর গোশত জবাই করার দ্বারা পবিত্র হয় না।

মোল্লা আলি কারি হানাফি রহ. পবিত্রতার পক্ষাবলম্বনকারীদের নাম উল্লেখ করার পর লেখেন,

وقال كثير من المشائخ يطهره جلده بها ولا يطهر لحمه كما لا يطهر بالدباغ.

قال شارح الكنز وهو الصحيح واختاره صاحب الغاية والنهاية.

অনেক মাশায়েখ বলেছেন, জবাই করার দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু গোশত পবিত্র হয় না, তদ্রূপ দাবাগাতের দ্বারাও পবিত্র হয় না। কানযের ব্যাখ্যাকার লিখেছেন, এটাই সহিহ। সাহেবে গায়াহ ও সাহেবে নেহায়া এটাই গ্রহণ করেছেন।[২৭৪]

---

২৭১. খোলাসাতুল ফাতাওয়া : পৃষ্ঠা ৪৩।

২৭২. মারাকিল ফালাহ।

২৭৩. কাবীরী : পৃষ্ঠা ১৪৪।

২৭৪. শরহুন নিকায়া : ১/২০।

এ সকল উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হয়, হানাফি মাযহাবে অধিক সহিহ ও ফাতওয়াযোগ্য মত এটাই যে, জবাই করার দ্বারা হারাম প্রাণীসমূহের গোশত পবিত্র হয় না, তাই তা বিক্রি করাও জায়েয নেই। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা চাই যে, গায়রে মুকাল্লিদদের আলেমগণ বলেন, শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করলে গোশত পবিত্র হয়ে যায়। যেমনটি গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা ওয়াহিদুয যামান লেখেন,

ما يطهر بالدباغة يطهر بالذكاة إلا لحم الخنزير فإنه رجس.

যা দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয় তা জবাই করার দ্বারাও পবিত্র হয়ে যায়, তবে শূকরের গোশতের কথা ভিন্ন, তা নাপাক।[২৭৫]

গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান কুকুরের গোশত, হাড্ডি, রক্ত, চুল ও ঘামকে নাপাক বলেননি।[২৭৬]

সিদ্দিক হাসান খানের ছেলে গায়রে মুকাল্লিদ নুরুল হাসান লেখেন, কুকুর ও শূকর নাপাক হওয়ার দাবি, প্রবাহিত রক্ত নাপাক হওয়ার দাবি এবং মৃত প্রাণীর নাপাক হওয়ার দাবি সঠিক নয়।[২৭৭]

নুরুসতানির দলিলসমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

নুরুসতানি যে সকল রেওয়ায়েত দ্বারা জবাইকৃত কুকুর ও গাধার গোশত বিক্রয় করা হারাম প্রমাণ করেছেন (তার দলের লোকদের দাবি অনুযায়ী)। এগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাস্তবে এ দলিলগুলো তার দাবিকে প্রমাণ করার জন্য এবং তার মতাদর্শী ও ভক্তদের খুশি করার জন্য তার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

১. আবু সা'লাবা খুশানী বলেন, নিঃসন্দেহে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র প্রাণীসমূহের মধ্যে থেকে ডোরাকাটা প্রাণীর গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।[২৭৮]

---

২৭৫. নুযুলুল আবরার : ১/৩০।
২৭৬. বুদুরুল আহিল্লাহঃ পৃষ্ঠা ১৬।
২৭৭. উরফুল জাদী।
২৭৮. বুখারী।

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষককে আদেশ করলেন, সে জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা দিল যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল তোমাদের গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে নিষেধ করেছেন।[২৭৯]

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদিদের ধ্বংস করুন। তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রয় করল এবং তার পয়সা খেল।[২৮০]

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মহান সত্তা একে (মদ) পান করা হারাম করেছেন, তিনিই এর বিক্রয় করাকেও হারাম করেছেন।[২৮১]

প্রসিদ্ধ আছে, لن يصلح العطار ما أفسده الدهر বাহ্যিকভাবে তো জাতি তার এ ইলমি জবাব শুনে তাকে উত্তম প্রতিদান দিয়েছে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি বাসী রুটি পেলেও আনন্দে আটখানা হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি জাতিকে অন্ধকারের মধ্যে রেখেছেন। আচ্ছা জনাব, বলুন তো, এ চারটি রেওয়ায়েতের কোনো একটিতেও কি জবেহ শব্দটি এসেছে? হযরত মাওলানা সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তো জবাইকৃত কুকুর ও গাধার গোশত বিক্রয় করা হারাম হওয়ার উপর দলিল চেয়েছিলেন, কিন্তু জনাব নুরুসতানি সাহেব জবাই ছাড়া হারাম প্রাণীসমূহের গোশত আর মদ বিক্রয় হারাম হওয়ার দলিলসমূহ পেশ করে দিলেন।

জনাব, আপনি হারাম প্রাণীসমূহের হারাম হওয়ার উপর দলিল পেশ করলেন। যদি প্রাণী হালালও হয়, কিন্তু শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই ছাড়া মারা যায়, তাহলে হানাফিগণ ও অন্যান্যরা তো এটাও হারাম হওয়ার পক্ষে, হারাম প্রাণী তো দূরের কথা।

মূলত এখানে কথা হচ্ছে শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করার ব্যাপারে যে, কারো কারো মতে এভাবে জবাই করার দ্বারা হারাম প্রাণীর অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। যেমন মৃত হালাল প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু এর চামড়াকে যদি দাবাগাত দেওয়া হয় তাহলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং এটা বিক্রয় করাও

---

২৭৯. বুখারী।

২৮০. বুখারী ও মুসলিম।

২৮১. মুসলিম, আল মাবনী লিল ফায়েল : ৪, ৫।

জায়েয। যেমন একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র দিয়ে অযু করার ইচ্ছা করলেন। কেউ বলল, এ পাত্রটি মৃত প্রাণীর চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ ধরনের চামড়া দাবাগাত করলে এর অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়।[২৮২]

যাইহোক, আলোচ্য মাসআলাটি এমন কিছু দলিল দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, যেগুলো ফাতওয়াযোগ্য ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত নয়। কিন্তু আরো অনেক দলিলের ভিত্তিতে হানাফি মাযহাবের মুহাক্কিকগণ অপবিত্রতা ও হারামের পক্ষের মতকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত ও ফাতওয়াযোগ্য আখ্যা দেন। যেমনটি বলা হয়েছে।[২৮৩]

---

২৮২. মুসনাদে আহমদ, ইবনে খুযায়মা, হাকেম, বাইহাকি, হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহীহ, তালখীসুল হাবীর : ২/১৯০।

২৮৩. আশেকে হক : পৃষ্ঠা ৮–১৮, সংযোজিত ও বিয়োজিত।

আপত্তি : আঠারো

পাগড়ির উপর মাসাহ্ করার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে পাগড়ির উপর মাসাহ

জাফর ইবনে আমর তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ[২৮৪]

আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগড়ি ও মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি।

ফিকহে হানাফিতে পাগড়ির উপর মাসাহ

যেহেতু হানাফিদের বাবা আদম আরেকজন, তাই হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

ولا يجوز المسح على العمامة

পাগড়ির উপর মাসাহ করা জায়েয নেই।[২৮৫]

---

২৮৪. বুখারী, হাদিস নং ২০৫।

২৮৫. হেদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৪৪।

অষ্টাদশ আপত্তির জবাব

আপত্তি উত্থাপনকারীর এ কথা, হানাফি মাযহাব এ হাদিসের বক্তব্যকে অস্বীকারকারী, এটা নির্জলা মিথ্যা। হানাফিগণ কোনো একটা হাদিসকেও অস্বীকার করেন না, বরং কোনো মাসআলার সকল দলিলগুলোকে সামনে রেখে সকল রেওয়ায়েতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং যেটাকে অধিক উত্তম ও অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়, তার উপর আমল করেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাথা মাসাহ করা অযুর ফরযসমূহের অন্তর্ভুক্ত, এজন্য শুধু পাগড়ির উপর মাসাহ সহিহ নয়।

হানাফিগণের দলিলসমূহ

প্রথম দলিল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন নিজ চেহারা ধৌত কর এবং নিজ হাতকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং নিজ মাথা মাসাহ কর এবং নিজ পা টাখনুসহ ধৌত কর।[২৮৬]

দ্বিতীয় দলিল

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ»

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছি। তার মাথার উপর

(কিয়া ফিকহে হানাফিয়্যাহ কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪১।

২৮৬. আল মাইদা : ৬।

কিতরি পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির নিচে হাত দিয়ে মাথার সামনের অংশ মাসাহ করেছেন এবং পাগড়ি খুলেননি।[২৮৭]

তৃতীয় দলিল

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَحَسِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ أَوْ قَالَ نَاصِيَتَهُ بِالْمَاءِ

হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন, তখন তিনি তার পাগড়িকে মাথা থেকে উপরে ওঠালেন এবং মাথার সামনের অংশ মাসাহ করলেন। অথবা আতা বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের نَاصِيَة (কপাল পরিমাণ জায়গার উপর) মাসাহ করেছেন পানি দ্বারা।[২৮৮]

চতুর্থ দলিল

عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ»[٢٨٩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা যখন মাথার উপর মাসাহ করতেন তখন মাথা থেকে টুপি সরিয়ে ফেলতেন এবং মাথার সামনের অংশ মাসাহ করতেন।

পঞ্চম দলিল

مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ. حَتَّى يَمْسَحَ الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.[٢٩٠]

---

২৮৭. আবু দাউদ : ১/১৯।

২৮৮. কিতাবুল উম্ম : ১/২৬।

২৮৯. رواه الدارقطني ١٠٧/١ في التعليق المغني، سنده صحيح ।

২৯০. মুয়াত্ত ইমাম মালেক : পৃষ্ঠা ২৩।

হযরত ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে এ হাদিস পৌঁছেছে যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর কাছে পাগড়ির উপর মাসাহ করার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বললেন, জায়েয নেই, যতক্ষণ না পানি দ্বারা চুলগুলোকে মাসাহ করবে।

ষষ্ঠ দলিল

مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ، وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ.

হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইরের ব্যাপারে বর্ণিত, তিনি মাথা থেকে পাগড়ি সরিয়ে মাথার উপর মাসাহ করতেন।[২৯১]

সপ্তম দলিল

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، امْرَأَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ. قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ. فَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلاَ خِمَارٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.[٢٩٢]

ইমাম নাফে থেকে বর্ণিত, তিনি আবু উবাইদের মেয়ে ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের স্ত্রীকে দেখেছেন যে, তারা মাথা থেকে দোপাট্টা সরিয়ে পানি দিয়ে মাথার উপর মাসাহ করেছেন। নাফে সে সময় ছোট ছিলেন। ইয়াহইয়া বলেন, ইমাম মালেকের কাছে পাগড়ি ও দোপাট্টার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি বললেন, পুরুষ ও মহিলার জন্য উচিত নয় যে পাগড়ি ও দোপাট্টার উপর মাসাহ করবে। তাদের জন্য উচিত হল মাথার উপর মাসাহ করা।

---

২৯১. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : পৃষ্ঠা ২৩।
২৯২. মুয়াত্তা ইমাম মালেক : পৃষ্ঠা ২৩।

সারকথা

আয়াতে কারিমা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অযুর মধ্যে মাথার উপর মাসাহ করা ফরয। আল্লাহ তায়ালা এর হুকুম দিয়েছেন। এজন্য যে ব্যক্তি অযুর মধ্যে মাথার উপর মাসাহ করবে না তার অযু হবে না।

উল্লিখিত হাদিস ও আসারসমূহ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কারো মাথার উপর পাগড়ি অথবা টুপি থাকে, তাহলে অযুর সময় হয়তো এর নিচে হাত দিয়ে মাথার উপর মাসাহ করবে অথবা মাথা থেকে পাগড়ি অথবা টুপি নামিয়ে মাসাহ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই করতেন। সাহাবায়েকেরামের আমলও এমন ছিল।

আপনারা দেখেছেন, আহনাফের মত সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপত্তি উত্থাপনকারী আহনাফের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছেন।

বাকি রইল ঐ রেওয়ায়েত প্রসঙ্গ, যা আপত্তি উত্থাপনকারী নকল করেছেন। এর কয়েকটি জবাব রয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে পাগড়ির নিচে অর্থাৎ ভিতরে হাত দিয়েই মাসাহ করেছেন, যেমনটি উপরে অনেকগুলো হাদিসে তা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু রাবি মনে করেছেন, তিনি পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। রাবি হতে পারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে ছিলেন। আমাদের এ সামঞ্জস্য বিধান হাদিসের সাথে সংগতিপূর্ণ, যেমনটি উপরের হাদিসসমূহে অতিক্রান্ত হয়েছে। আহনাফ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম কীভাবে ছাড়তে পারে?

আল্লাহ তায়ালা আহলে হাদিস ফেরকাকে হেদায়েত দান করুন, যারা অকারণে আহনাফের উপর আপত্তি উত্থাপন করে থাকে।

আপত্তি : উনিশ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশের রোযা রাখার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে ওয়ারিশের উপর রোযা

ইমাম বুখারি বুখারি শরিফে এ অনুচ্ছেদ লিখেছেন, باب من مات وعليه صوم অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা গেছে আর তার যিম্মায় রোযা রয়ে গেছে, তার প্রসঙ্গে। এবং তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»[২৯৩]

যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেছে আর তার যিম্মায় রোযা আছে তাহলে তার পক্ষ থেকে যেন তার অলি রোযা রাখে।

---

২৯৩. বুখারী : হাদিস নং ১৯৫২।

ফিকহে হানাফি ও ওয়ারিশদের দায়মুক্তি

হিদায়াগ্রন্থকার এর জবাব এভাবে দেন,

ولا يصوم عنه الولي.

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অলি রোযা রাখবে না।[২৯৪]

উনবিংশ আপত্তির জবাব

এ মাসআলায় ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, এমন ইবাদত যা শুধুই দৈহিক, যেমন– নামায ও রোযা, এ ধরনের ইবাদতে অন্যকোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব চলে না। অর্থাৎ এ সকল ইবাদত কারো পক্ষ থেকে অন্য কেউ আদায় করলে তা আদায় হয় না। তবে যে সকল ইবাদত শুধুই দৈহিক নয়, বরং এতে মালও খরচ হয়, যেমন হজ, এ সকল ইবাদতে যদি কেউ অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে অন্য ব্যক্তি প্রতিনিধি হয়ে তার ইবাদত আদায় করতে পারে। বাকি রইল ঐ সকল ইবাদত, যেগুলো শুধুই মাল দ্বারা করা হয়, যেমন যাকাত ও সদকায়ে ফিতর, তো এগুলোতে সর্বপ্রকার প্রতিনিধিত্ব জায়েয আছে।

এ বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইমাম সাহেবের মতে নামায বা রোযা কেউ কারো প্রতিনিধি হয়ে আদায় করতে পারে না, তবে রোযার ফিদইয়া একজন অপরজনের পক্ষ থেকে আদায় করতে পারে। এই একই মত ইমাম শাফিয়ি, ইমাম মালেক ও জুমহুর আহলে ইলমের। এবার এর উপর সুস্পষ্ট দলিলসমূহের প্রতি লক্ষ্য করুন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কেউ অন্যের পক্ষ থেকে নামায পড়বে না এবং কেউ অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখবে না, বরং প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে এক মুদ্দ খাবার খাইয়ে দিবে।[২৯৫]

---

২৯৪. হিদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ২০৩। কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪১।

২৯৫. মুশকিলুল আসার : ৩/১৪১।

ইবনে রহ. তালখীসুল হাবীর : ২/২০৯ এর মধ্যে এর সনদকে সহিহ বলেছেন।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার যিম্মায় রমযান মাসের রোযা রয়ে যায়, তাহলে তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।[২৯৬]

উমদাতুল কারীতে এর সনদকে ইমাম কুরতুবির উদ্ধৃতিতে হাসান বলা হয়েছে।

৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আমরা বিনতে আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন আর তার যিম্মায় রোযা রয়ে গেছে, আমি কি এখন তার পক্ষ থেকে রোযা কাযা করব? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না, বরং তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে সদকা কর, এটা তোমার রোযা রাখার চেয়ে উত্তম।

আল্লামা মারদীনী এর সনদকে সহিহ বলেছেন।[২৯৭]

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, কোনো ব্যক্তির যিম্মায় রমযানের রোযা বাকি থাকা অবস্থায় সে মারা গেলে তার পক্ষ থেকে ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।[২৯৮]

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, কোনো ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো অবস্থাতেই নামায না পড়ে এবং রোযা না রাখে। বরং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও, তাহলে তার পক্ষ থেকে সদকা করে দাও বা হাদিয়া দিয়ে দাও।[২৯৯]

---

২৯৬. তিরমিযি : ১/১৫২।

২৯৭. মুশকিলুল আসার : ২/১৪২, আল মুহাল্লা ইবনে হাযাম : ৭/৪। আল জাওহারুন নকী : ৪/২৫।

২৯৮. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৪/২৩৭। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৪/২৩৭। মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৪/২৩৭।

২৯৯. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯/৬১, সুনানুল কুবরা : ৪/২৫৪, মুয়াত্তা মালেক : পৃষ্ঠা ২৪৫।

৬. তাছাড়া সাহাবায়েকেরামের যুগে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, যার মধ্যে অন্য কারো পক্ষ থেকে নামায বা রোযা আদায় করাকে জায়েয বলা হয়েছে। ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমি মদিনা মুনাওয়ারায় সাহাবায়েকেরাম বা তাবেয়িন কারো ব্যাপারেই এরকম শুনিনি যে, তারা অন্য কারো পক্ষ থেকে নামায বা রোযার হুকুম দিয়েছেন। বরং তখনকার সময় সবাই নিজের জন্যই নিজের আমল করত এবং কেউ অন্যের পক্ষ থেকে আমল করত না।[৩০০]

বাকি রইল ঐ রেওয়ায়েত প্রসঙ্গ, যা আপত্তি উত্থাপনকারী উল্লেখ করেছেন। তো উল্লিখিত শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ দলিলসমূহের আলোকে এর এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া জরুরি, যা উল্লিখিত হাদিসসমূহের বিপরীত না হয়। বিশেষ করে যখন আমরা দেখছি যে, রেওয়ায়েতসমূহে বাহ্যত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিনিধি হয়ে রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ হাদিসগুলো রেওয়ায়েতকারী সাহাবায়েকেরামের মধ্যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা শামিল রয়েছেন। কিন্তু তাদের উভয়ের ফাতওয়া এর বিপরীত, যেমনটি উপরে অতিক্রান্ত হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতের একটা ব্যাখ্যা এমন দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমে প্রতিনিধি হয়ে রোযা রাখার অনুমতি ছিল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। আর তা রহিত হওয়ার প্রমাণ এই যে, হযরত আয়েশা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, যারা অনুমতির রেওয়ায়েতসমূহের রাবী, তাদের দিক থেকে এর বিপরীত ফাতওয়া রয়েছে। স্পষ্টতই যদি অনুমতি রহিত না হত, তাহলে এ দুইজন এর বিপরীত ফাতওয়া দিতেন না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, এ হাদিসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে রোযা রাখবে, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে নফল রোযা রেখে এর সাওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছে দিবে।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে, তার পক্ষ থেকে রোযা রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হল খাবারের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা। তাই যখন মৃত ব্যক্তির পক্ষ

---

৩০০. নাসবুর রায়াহ : ২/৪৬৩।

থেকে কেউ মিসকিনদের খাবার খাওয়ালে মৃত ব্যক্তি রোযা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তখন এ হিসাবে বলা যাবে যে, যে খাবার খাইয়েছে সে মৃতের পক্ষ থেকে রোযা আদায় করেছে।

স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে, যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয হত তাহলে সাহাবায়েকেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর বিপরীত ফাতওয়া দিতেন না।

আপত্তি : বিশ

শেষ তাশাহহুদে জেনে বুঝে অযু ভাঙ্গার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে অযুর অবস্থান

ইমাম বুখারি বুখারি শরিফে এ অনুচ্ছেদ লিখেছন, باب لا تقبل صلاة بغير طهور অর্থাৎ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল করা হয় না। এরপর তিনি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার হদস হয়েছে তার নামায কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে পুনরায় অযু করে। হাযরামাওতের এক ব্যক্তি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! হদস কি? তিনি বললেন, বাতাস বের করা অথবা পাদ মারা।[৩০১]

---

৩০১. বুখারি, হাদিস নং : ১৩৫।

ফিকহে হানাফিতে পাদ সালামের স্থলাভিষিক্ত

এবার হানাফিদের কথা শুনুন, হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأوسلم " لأن التسليم واجب فلا بد من التوضي ليأتي به " وإن لحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته.

যদি তাশাহহুদের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাতাস বেরিয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় বার অযু করবে, এরপর সালাম ফেরাবে। কেননা সালাম ফেরানো ওয়াজিব, আর সালাম ফেরানোর জন্য অযু জরুরি। কিন্তু যদি এ অবস্থায় জেনে বুঝে বাতাস বের করে দেয় অথবা কথা বলতে শুরু করে অথবা নামায পরিপন্থী কোনো কাজ করে, তাহলে তার নামায পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।[৩০২]

বিংশ আপত্তির জবাব

এ আপত্তি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরোপিত হয়। কারণ এ মাসআলার সূত্র হাদিসে রয়েছে। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারীর এ কথা যে, বাতাস বের করা ফুকাহায়েকেরামের মতে সালামের স্থলাভিষিক্ত, এটা একটা অপবাদ। এ ধরনের নিকৃষ্ট বুঝ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। বরং ফুকাহায়েকেরামের মতে যে এমন করবে, সে গুনাহগার হবে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে, তাহলে তার নামায মাকরুহ তাহরিমি হবে, যা পুনরায় পড়া তার জন্য ওয়াজিব হবে। কারণ সে সালাম বলে নামায থেকে বেরিয়ে আসেনি আর এই সালাম তার উপর ওয়াজিব ছিল, যেহেতু সে ঐ সালাম বাদ দিয়েছে, যা শরয়িভাবে তার উপর ওয়াজিব ছিল, তাই সে এর কারণে গুনাহগারও হয়েছে এবং তার উপর নামায দোহরানোও আবশ্যক হয়েছে। আর এমন ধারণা যে, হানাফিগণ এমন নামাযকে মাকরুহ তাহরিমির হুকুম প্রদান ব্যতীত জায়েয বলেন অথবা এ ধরনের কাজকে জায়েয মনে করেন, হানাফিদের উপর সুস্পষ্ট অপবাদ।

---

৩০২. হিদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ১১০।

খোদ গাইরে মুকাল্লিদদের নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব কাশফুল ইলতিবাসে এ আপত্তির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন। আপত্তি উত্থাপনকারীর উচিত তা দেখে নেওয়া।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযি ও তহাবি রহ. রেওয়ায়েত করেছেন যে, যখন ইমাম শেষ বৈঠকে বসে যায় এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে তার হদস হয়ে যায়, তখনকার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ অবস্থায় তার এবং তার পিছনে যারা নামায পড়ছে, সকলের নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লামা আলি কারি তার পুস্তিকা تشنيع الفقهاء الحنفية এর মধ্যে এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস লিখেছেন, যারা দেখতে চান তারা উমদাতুর রিআয়াহ হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়ার ১৮৫ পৃষ্ঠা দেখে নিতে পারেন। আপত্তি উত্থাপনকারীর তো নিজের ঈমানের ফিকির করা উচিত। হানাফিগণের মতে উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।[৩০৩]

জবাব নং (২)

নামাযের শেষে সালামের হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। নববি শরহে মুসলিম ১/১৯৫ এ আছে যে, ইমাম মালেক, ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমদ রহ. এর মতে সালাম ফরয, তা ব্যতীত নামায হয় না। আর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সুফিয়ান সাওরি, ইমাম আওযায়ি ও অন্যদের মতে সালাম সুন্নত, যদি কেউ একে ছেড়েও দেয় তাহলেও তার নামায হয়ে যাবে, তবে উচিত হচ্ছে সালাম না ছাড়া।

জবাব নং (৩)

শামি : ১/১৪৫ ও অন্যান্য ফিকহের কিতাবসমূহে আছে, সালাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব, যদি অন্যকোনভাবে নামায থেকে বের হয়, তাহলে গুনাহগার হবে।

---

৩০৩. দেখুন, মুনইয়া : পৃষ্ঠা ৮৬।

জবাব নং (৪)

উল্লিখিত হাদিসসমূহের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির নামাযকে পরিপূর্ণ বলেছেন। আবু দাউদ : ১/৯১ এ আছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ»

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শেষ বৈঠকে বসল এবং তারপর জেনে বুঝে বাতাস বের করে দিল তার নামায পূর্ণ হয়ে গেছে এবং তার পিছনে নামায আদায়কারীদের নামাযও পূর্ণ হয়ে গেছে।

আর তহাবি : ১/১৮৯ এর মধ্যে এই রেওয়ায়েতেই فلا يعود فيها কথাটিও রয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য নামায দোহরানো জরুরি নয়।

হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫/১১৭ এর মধ্যে রয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে তাশাহহুদ শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে ফিরতেন এবং বলতেন,

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا بَعْدَمَا يَفْرُغَ مِنَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

উপর্যুক্ত সকল রেওয়ায়েত ও হাদিসের আলোকে দীনদারীর সাথে ফয়সালা করুন যে, আপনাদের আপত্তি কি ফিকহের উপর না হাদিসের উপর?

জবাব নং (৫)

আপনাদের মতবাদের মুহসিনে আযম ও সিহাহ সিত্তার অনুবাদক নবাব ওয়াহিদুয যামান খান কানযুদ দাকাইক : পৃষ্ঠা ২৪ এর মধ্যে লেখেন, যদি কোনো ব্যক্তি নামায পড়ায় এবং সালামের পর ঘোষণা দেয় যে, আমি অযু ছাড়া নামায পড়িয়েছি, তাহলে নামায হয়ে যাবে, পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই।

নোট : আপত্তি নং ১১ থেকে ২০, এ দশটি আপত্তি হচ্ছে সেগুলো, যা আপত্তি উত্থাপনকারী বুখারি শরিফের সাথে ফিকহে হানাফির বিরোধিতা প্রমাণ করার জন্য নকল করেছেন। এরপর তিনি মুসলিম শরিফ ও হাদিসের অন্যান্য কিতাবের সাথে ফিকহে হানাফির বিরোধিতা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

আপত্তি : একুশ
ইমামতির শর্তাবলির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে ইমামতির শর্তাবলি

এবার মুসলিম ও হাদিসের অন্যান্য কিতাবের কিছু মাসআলা দেখুন, যেগুলোর বিরোধিতা হানাফিরা করেন। ইমামতের যোগ্য কে? এব্যাপারে আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وفي رواية فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমামতি গোত্রের সবচেয়ে বেশি কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি করবে (যে কেরাতে দক্ষ হবে)। যদি কেরাতে সবাই সমান হয়, তাহলে যে সবচেয়ে বেশি সুন্নত জানে সে ইমামতি করবে, যদি এতেও সবাই সমান হয়, তাহলে সবার পূর্বে হিজরতকারী করবে, যদি এতেও সবাই সমান হয়, তাহলে সর্বপ্রথম

ইসলামগ্রহণকারী (আর অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যে বয়সে সবচেয়ে বড় হবে) ইমামতি করবে।

ফিকহে হানাফিতে ইমামতির শর্তাবলি

এবার হানাফিদের মতে ইমামতির শর্তসমূহও শুনে নিন, ইবনে আবিদীন শামি বলেন,

ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها : ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأحسن زوجة ثم الأكثر مالا، ثم الأكثر جاها ثم الأنظف ثوبا ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا

ইমাম তিনি হবেন, যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এরপর তিনি, যিনি সুন্দর হবেন, এর তিনি যিনি সম্ভ্রান্ত বংশের হবেন। এরপর তিনি যিনি সুকণ্ঠের অধিকারী হবেন। এরপর তিনি যার ঘরে সুন্দরী বউ থাকবে। এরপর তিনি যিনি অধিক সম্পদশালী হবেন। এরপর তিনি যিনি বড় মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর তিনি যিনি পরিচ্ছন্ন কাপড়ের অধিকারী হবেন। এরপর তিনি যিনি বড় মাথা বিশিষ্ট ও ছোট অঙ্গের অধিকারী হবেন।[৩০৪]

একবিংশ আপত্তির জবাব

এ আপত্তির জবাবও আমরা তালাশে হক থেকে নকল করছি, যা গায়রে মুকাল্লিদ আবদুল আজিজ নুরুসতানির প্রশ্ন ও আপত্তিসমূহের উত্তরে আমাদের দোস্ত মুহাম্মদ আইয়ুব লিখেছেন। প্রশ্ন ও উত্তর লক্ষ্য করুন–

প্রশ্ন : প্রচারপত্রের মধ্যে তৃতীয় প্রশ্ন এটা করা হয়েছে যে, হানাফি মাযহাবে ইমামতের শর্তাবলির মধ্যে একটি শর্ত এটাও রয়েছে যে, যার স্ত্রী সুন্দরী হবে তাকে ইমাম বানাও। যদি এতে সবাই সমান হয়, তাহলে যার মাথা বড় ও অঙ্গ ছোট হবে তাকে ইমাম বানাও।

---

৩০৪. রদ্দুল মুহতার ১/৩৭৫।। কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩।

জবাব : গায়রে মুকাল্লিদরা খেয়ানতের মত বিরাট অপরাধকে গুনাহই মনে করে না। দুররে মুখতারে স্ত্রী সুন্দরী হওয়া, অঙ্গ ছোট হওয়াকে ইমামতের শর্ত হিসাবে নয়, বরং ইমামতের অধিকতর হকদার হওয়ার গুণাবলি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শর্ত তো সেটাকে বলা হয়, যা ছুটে যাওয়ার কারণে মাশরুতও (যার জন্য শর্ত করা হয়েছে) ছুটে যায়। অথচ যদি ইমামের মধ্যে এ সকল গুণ নাও থাকে, তবু নামাযে কোনো ত্রুটি হয় না। শুধু উত্তমতার জন্য এ সকল গুণাবলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসসমূহে ইমামতের যে সকল গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, যদি সে সকল গুণের ক্ষেত্রে সকলে সমান হয়, সেক্ষেত্রে ফুকাহায়েকেরাম ইমামতের অধিক হকদার নির্বাচনের জন্য কিছু গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, এ গুণাবলির মধ্য থেকে গায়রে মুকাল্লিদরা উল্লিখিত প্রচারপত্রে দুটি গুণ উল্লেখ করে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, এগুলোকে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণ করুন। আমরা প্রথমেই আরয করেছি যে, গায়রে মুকাল্লিদদের এ পদ্ধতিটা ভুল। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চার দলিল রয়েছে। তাই ফুকাহায়েকেরাম হাদিসসমূহকে সামনে রেখে কিয়াস করে উল্লিখিত গুণগুলো উল্লেখ করেছেন। এ গুণগুলো কেবল কেয়াস দ্বারাই প্রমাণিত নয়, বরং কিছু কিছু হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত।

হাদিস নং (১)

যেমনটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ، فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ[٣٠٥]

যদি তোমাদের মন চায় যে, তোমাদের নামায কবুল হোক, তাহলে তোমাদের উত্তম ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে। কেননা ইমাম তোমাদের মুখপাত্র তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মাঝে।

---

৩০৫. তাবারানি কাবির : ২০/৩২৮, দারাকুতনি, মুসতাদরাকে হাকেম, মেরকাত : ৩/১৯৬।

হাদিস নং (২) এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেন,

اجْعَلُوا أَئِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ

তোমাদের ভাল লোকদের তোমাদের ইমাম বানাও। কারণ ইমাম তোমাদের মুখপাত্র বিশেষ; তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মাঝে।[৩০৬]

সম্মানিত পাঠক, এ কথা আমরা অস্বীকার করছি না যে, মুহাদ্দিসগণ এ উভয় রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কিছু আপত্তি করেছেন। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, মুহাদ্দিসগণ এব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যয়িফ হাদিস দলিল হওয়ার উপযুক্ত।[৩০৭]

এসকল হাদিস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাকে বানানো হবে, যিনি সবচেয়ে উত্তম হবেন। এখন সবচেয়ে উত্তম লোক কারা, তাদের পরিচয় জেনে নিন।

ইমামতের অধিক উপযুক্ত হওয়ার জন্য প্রথম গুণ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীদের ক্ষেত্রে উত্তম।[৩০৮]

পবিত্র শরিয়তে তো কালো, গোরা, সুন্দর ও কুশ্রীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু অন্তর অনিচ্ছাকৃতভাবে সুন্দরী স্ত্রীর দিকে ঝুকে পড়ে। আর এটাও অভিজ্ঞতালব্ধ কথা যে, যার স্ত্রী সুন্দরী হয়, সাধারণত সে স্ত্রীর কাছে উত্তম হয়ে থাকে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেন, মুমিন বান্দা আল্লাহর তাকওয়ার পর সবচেয়ে বেশি যে উত্তম জিনিসটি পছন্দ করে তা হচ্ছে নেককার স্ত্রী।

---

৩০৬. সুনানুল কুবরা : ৩/৯০।

৩০৭. শরহুন নিকায়া : ১/৯, মুসতাদরাক : ১/৪৯০, ফাতহুল মুগিস : পৃষ্ঠা ১২০, ফাতাওয়া লি ইবনে তাইমিয়া : ১/৩৯, ফাতাওয়া নযিরিয়াহ : ১/২৬৫।

৩০৮. মেশকাত : ২/২৮৯।

إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سرته

যদি তাকে কোনো হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে তা পালন করে আর যখন স্বামী তার দিকে তাকায় সে স্বামীর অন্তরকে খুশি করে।[৩০৯]

মোল্লা আলি কারি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন,

جعلته مسرورا بحسن صورتها وسيرتها.

অর্থাৎ যদি স্বামী ঐ স্ত্রীকে দেখে, তাহলে সে নিজের আকৃতি ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দ্বারা তাকে খুশি করে। এমনিভাবে যার স্ত্রী সুন্দর হয়, অধিকাংশক্ষেত্রে সে কুদৃষ্টি, নির্লজ্জতা এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীকে স্বামীর পোশাক বলেছেন আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ দৃষ্টিকে অনেক নিয়ন্ত্রণ করে এবং লজ্জাস্থানকে অনেক হেফাজত করে।[৩১০]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিবাহিত হয়, তার দৃষ্টি বেগানা মহিলার দিকে যায় না এবং সে হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকে। মানবতার প্রতি দয়াবান পয়গমবর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে বিবাহকে নির্ধারণ করেছেন। এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন, যার স্ত্রী সুন্দরী হবে, সে কি আরো বেশি হারাম কাজ থেকে বাঁচবে না? ফুকাহায়েকেরামের দৃষ্টি এই সকল বিষয়ের প্রতি ছিল। সেজন্য তারা বলেছেন, যদি কারো স্ত্রী সুন্দরী হয়, তাহলে তাকে ইমাম বানানো হবে। আর এই কথা যে, ইমামের স্ত্রী সুন্দর কি না, তা কীভাবে জানা যাবে? তো এটা তার পাড়া-প্রতিবেশিদের স্ত্রীদের মাধ্যমে জানা হয়ে যায়। যেমন কেউ বিবাহ করতে গেলে পাত্রীর অবস্থা নিজের আত্মীয় মহিলাদের মাধ্যমে জেনে নেয়।

ইমামতের অধিক উপযুক্ত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় গুণ

বাকি রইল এপ্রসঙ্গ যে, ইমাম তাকে বানানো হবে, যার মাথা বড় হবে, আর অন্য অঙ্গগুলো ছোট হবে। এর উদ্দেশ্য হল, মাথা বড় হওয়া আর অন্যান্য

---

৩০৯. মেশকাত : ২/২৬৮।

৩১০. মেরকাত : ২/২৭৪। বুখারি, মুসলিম ও মেশকাত : ২/২৬৭।

অঙ্গসমূহ নিয়ম মাফিক হওয়া পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর একথাও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, যার মাথা বড় হয় এবং অন্য অঙ্গগুলো এর তুলনায় ছোট হয়, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়। পক্ষান্তরে ছোট মাথার লোক নির্বোধ হয়ে থাকে। আর এব্যাপারেও কারো কোনো দ্বিমত নেই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি নির্বোধের চেয়ে উত্তম। আর হাদিসেও উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠক, ভেবে দেখুন, ফিকহে হানাফির এ মাসআলা হাদিসের সাথে সংগতিপূর্ণ না হাদিস বিরোধী?

হানাফি ফকিহগণের উপর মারাত্মক অপবাদ

তথাকথিত সীমান্তের বাঘ, গায়রে মুকাল্লিদদের শিরোমণি জনাব নুরুসতানি সাহেব লেখেন, الأصغر عضوا। অর্থাৎ যার অঙ্গ ছোট হয়, একথার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষাঙ্গ ছোট হওয়া। অর্থাৎ ইমাম তাকে বানানো হবে, যার মাথা বড় ও পুরুষাঙ্গ ছোট হবে। তিনি দলিল এটা পেশ করেছেন যে, عضو শব্দটি একবচন আর সারা শরীরের মধ্যে একক অঙ্গ শুধু পুরুষাঙ্গই রয়েছে।[৩১১]

জবাব : কাফেরদের সব সময়ের চেষ্টা এটাই যে, মুসলমানদের কীভাবে বদনাম করা যায়। কাদিয়ানি, পারবেজি ও অন্যান্য বাতিল ফেরকা সবসময় এ অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, কীভাবে মুসলমানদের কিতাবসমূহে শাব্দিক ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করা যায়, ভুল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা যায়, কম-বেশি করা যায়। তাদের ক্রীড়নক গায়রে মুকাল্লিদদের চেষ্টাও এটাই যে, হানাফি ফকিহগণের কিতাব থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত নয় এমন এবং বর্জনকৃত মতগুলোকে বেছে বেছে লোকদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণ করা, তাদের কথার ভুল অনুবাদ করে আহলে বাতেলকে খুশি করা এবং মুসলমানদের অন্তরে নিজ ধর্মের প্রতি অভক্তি সৃষ্টি করা। বুঝে আসে না, নুরুসতানি ও তার সমমনারা কীভাবে عضو দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য নিয়েছেন,

بے حیا باش وہر چہ خواہی کن

---

৩১১. আল মাবনী লিল ফায়েল : ১৯।

জনাব, আপনার নেওয়া এ উদ্দেশ্যটা যদি আপনার দলের লোকেরাই কবুল করে নিত, যারা গায়রে মুকাল্লিদ হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি আস্থাবশত আপনার তাকলিদ করে অথবা অন্য কোনো বুদ্ধিমান শত্রুও যদি এর দ্বারা একথা উদ্দেশ্য নিত, যা আপনি নিয়েছেন! বরং আমরা বলি, এটা হচ্ছে বিষাক্ত লোকমা, যা অজ্ঞ লোকদের খাওয়ানো হয়েছে।

عضو দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য নেওয়া নির্জলা অপবাদ

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি হানাফি খোদ عضو দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য কথাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি লেখেন,

وفي حاشية أبي السعود؛ وقد نقل عن بعضهم في هذا المقام ما لا يليق أن يذكر فضلا عن أن يكتب اه وكأنه يشير إلى ما قيل أن المراد بالعضو الذكر

আবুস সুঊদের টীকায় এ জায়গায় কারো কারো থেকে এমন মারাত্মক কথা বর্ণিত আছে, যা লেখা তো দূরের কথা, মুখেও প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়। এর দ্বারা তিনি যেন এ দিকে ইশারা করেছেন, যা বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষাঙ্গ।[৩১২]

আর মিনহাতুল খালিক : ১/৩৪৮ পৃষ্ঠাও এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, অঙ্গ দ্বারা এখানে পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য।

ভেবে দেখুন, হানাফি ফকিহগণ একথা বলছেন যে, অঙ্গ দ্বারা এখানে পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য নয়, বরং শরীরের অবয়ব উদ্দেশ্য; কিন্তু তিনি এর উপর অটল অবিচল হয়ে বসে আছেন যে, এখানে অঙ্গ দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য। "من چہ گویم وطب نور من چہ گوید" মার্কা কথাবার্তা। জ্ঞানীজনের উক্তি রয়েছে, "كل إناء يترشح بما فيه"

দ্বিতীয়ত শরীরের মধ্যে একক অঙ্গ নাকও রয়েছে। সীমান্তের বাঘের নজর কেন শুধু পুরুষাঙ্গের দিকে গেল? প্রসিদ্ধ আছে, কোনো এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে

---

৩১২. রদ্দুল মুহতার : ১/৪১২।

কেউ জিজ্ঞেস করল, বল তো, দুই আর দুইয়ে কত হয়, সে উত্তর দিল, চার রুটি হয়।

তৃতীয়ত মানুষের শরীরের এক জাতীয় একাধিক অঙ্গসমূহের ক্ষেত্রেও অনেক সময় একবচন ব্যবহার করা হয় জিন্স বা একজাতীয় হিসাবে, এবং এর দ্বারা একটি অঙ্গ বোঝানো উদ্দেশ্য হয় না।

যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

এখানে হাতের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক হাত নয়, বরং উভয় হাতই উদ্দেশ্য। নুরুসতানির কথা অনুযায়ী এখানে যেহেতু হাতের ক্ষেত্রে একবচনের শব্দ আনা হয়েছে, তাই কেউ দুই হাত দিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করলে তা হাদিসের পরিপন্থী হবে।

এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অর্থাৎ মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। এখানেও একবচন শব্দ আনা হয়েছে। কিন্তু নুরুসতানির কথা অনুযায়ী এখানে অর্থ এমন হবে যে, যার এক হাত থেকে মুসলমান নিরাপদ হবে না, সে মুসলমান নয়, কিন্তু যদি দুই হাতের ক্ষতি থেকে নিরাপদ না হয় তাহলে সে মুসলমান।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

আমার চোখের শীতলতা নামাযে রয়েছে।

এখন জনাবের কাছে এ হাদিসের এমন উদ্দেশ্য হবে যে, নামাযে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চোখের শীতলতা রয়েছে, উভয় চোখের নয়। এ ধরনেরই উদ্দেশ্য জনাব "أصغر عضوا" থেকে নিয়েছেন, "عضوا" শব্দটি একবচন আর শরীরের মধ্যে একক অঙ্গ হচ্ছে পুরুষাঙ্গ।

থুথু নিক্ষেপ করি এমন আহলে হাদিসিয়্যতের উপর। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটা কি সে জেনে বুঝে বলছে, নাকি এর দ্বারা সে তার অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে?

চতুর্থত গায়রে মুকাল্লিদরা তাদের যে আলেমকে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে, সেই আল্লামা ওয়াহিদুয যামান আহনাফের মত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন,

وقال الأحناف : ... ثم الأكبر رأسا و الأصغر قدما

হানাফিগণ বলেন, এরপর ইমাম তাকে বানানো হবে, যারা মাথা বড় হবে এবং পা ছোট হবে, অর্থাৎ অঙ্গ দ্বারা সেটা উদ্দেশ্য নয়, যা তারা মনে করেছেন, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পা ইত্যাদি।[৩১৩]

পঞ্চমত عضو শরীরের এমন একটি অংশকে বলে, যার মধ্যে হাড্ডি থাকে আর পুরুষাঙ্গে তো কোনো হাড্ডি নেই। সাহেবে কামূস লেখেন,

١. والعضو بالضم والكسر كل لحم وافر بعظمه.[٣١٤]

عضو পেশ ও যেরের সাথে, প্রত্যেক ঐ গোশত, যা হাড্ডির সাথে মিলানো।

٢. وقيل هو كل عظم وافر لحمه وجمعها أعضاء.[٣١٥]

বলা হয়েছে, عضو প্রত্যেক ঐ হাড্ডি, যার সাথে গোশত মিলানো থাকে। এর বহুবচন أعضاء

٣. كل عظم وافر من الجسم بلحمه.[٣١٦]

শরীরের প্রত্যেক ঐ হাড্ডি, যার সাথে গোশত মিলানো থাকে।

٤. ولا يسمى القلب والكبد عضوا إلا لنحو تغليب ذكره ابن حجر في شرح العباب

---

৩১৩. নুযুলুল আবরার : ২/৯৬।

৩১৪. আলকামুস : ১/১৭২০।

৩১৫. লিসানুল আরব : ৫/৬৮।

৩১৬. আল মুনজিদ আরবি : ৫১২।

অন্তর ও কলিজাকে عضو বলা হয় না, (কারণ তাতে হাড্ডি থাকে না) তবে যেহেতু এটিও শরীরের অন্য অঙ্গগুলোর মত একটি অংশ, তাই সবগুলোর সাথে এটিকেও عضو বলা হয়ে থাকে। হাফেয ইবনে হাজার শরহুল উবাবে একথা বলেছেন।[৩১৭]

৫. প্রত্যেক ঐ গোশত, যা হাড্ডির সাথে জড়ানো থাকে।[৩১৮]

বোঝা গেল, এ সকল লোকেরা عضو দ্বারা পুরুষাঙ্গ উদ্দেশ্য নেওয়া হানাফিগণের উপর মারাত্মক অপবাদ। আর এটা توجيه القول بما لا يرضى به قائله ও "مدعی سست گواه چست" মার্কা কথা। (তালাশে হক থেকে সংগৃহীত : পৃষ্ঠা ৩১-৩৬, সংযোজন-বিয়োজনের সাথে)।

জবাব নং (২)

সাহেবে দুররে মুখতার ইমামতের সর্বপ্রথম উপযুক্ত নামাযের বিধানাবলি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তিকে বলেছেন। যদি উপস্থিত সকলেই নামাযের বিধানাবলির ব্যাপারে সমানভাবে জ্ঞাত হয়, তাহলে দ্বিতীয়ত সবচেয়ে ভালো তেলাওয়াতকারী অধিক উপযুক্ত হবে। এতেও যদি সবাই সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তাহলে তৃতীয়ত সংশয়যুক্ত জিনিসগুলো থেকে অধিক আত্মরক্ষাকারী, আর এতেও সমান হলে চতুর্থত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, এতেও সবাই সমান হলে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, এতেও সবাই সমান হলে অধিক তাহাজ্জুদ আদায়কারী, এরপর পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী, এরপর বংশীয় সম্মানের অধিকারী, এরপর সুকণ্ঠের অধিকারী ইমামতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যদি এই সকল গুণের মধ্যে সকলেই সমান হয়, তখন এ অবস্থায় যার স্ত্রী সুন্দরী হবে সে ইমামতের উপযুক্ত হবে।

কেননা সুন্দরী স্ত্রীর কারণে এ ব্যক্তি বেগানা মহিলাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না এবং অধিক পুতপবিত্র হবে। আর আল্লামা শামিও একথা লিখেছেন যে, একথা সাথি-সঙ্গী অথবা আত্মীয় স্বজন অথবা প্রতিবেশীদের দ্বারা জানা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য কখনই এটা নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর গুণ

---

৩১৭. হামিশে কামুস : ১/১৭২০।

৩১৮. মিফতাহুল কুরআন, ৫৩৪।

বর্ণনা করবে, যাতে তার স্ত্রী সুন্দরী হওয়ার কথা সকলে জানতে পারে। গায়রে মুকাল্লিদদের যদি এর উপর আপত্তি থাকে, তাহলে তারা নিজেদের সুন্দরী স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিক, আর এ কথা নুযুলুল আবরারে ওয়াহিদুয যামান ثم الأحسن زوجة কথাটির অধীনে ৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

আমরা এবার এ আপত্তিকে গায়রে মুকাল্লিদদের ঘাড়ে উঠিয়ে দিচ্ছি। কারণ ওয়াহিদুয যামান নুযুলুল আবরারে সুন্দর চেহারার অধিকারী ব্যক্তির পরে কে ইমাম হবে, এর ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এরপর যে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী, তারপর উঁচু মর্যাদার অধিকারী, এরপর পরিষ্কার কাপড় পরিধানকারী ইমামতের অধিক উপযুক্ত। যদি এই সকল গুণের ক্ষেত্রে সকলে সমান হয়, তাহলে নুযুলুল আবরারের কথা অনুযায়ী বড় মাথা ও ছোট পায়ের অধিকারী ইমামতের অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচ্য হবে। একথার ভিত্তি এই প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী দৃষ্টান্তের উপর–

سر وڈے سرداراں دے، پیر وڈے گنواراں دے

অর্থাৎ মাথা বড় হওয়া সরদারির আলামত আর পা বড় হওয়া গোঁড়ামির আলামত। তবে দুররে মুখতারে قدما এর স্থলে الأصغر عضوا শব্দ এসেছে। عضو এর অর্থ জোড়া। আল্লামা শামি বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হিসাবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী হওয়া। নচেৎ যদি তার মাথা অস্বাভাবিক বড় হয় এবং অন্য অঙ্গগুলো অস্বাভাবিক ছোট হয়, তাহলে এটা তার মানসিক গঠনগত সমস্যার পরিচায়ক, যা তার বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীনতাকে আবশ্যককারী। সারকথা হচ্ছে, ইমাম ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারী হওয়া চাই।

গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে যদি এটা ভাল না লাগে, তাহলে তাদের জন্য পাগল ইমামই মোবারক হোক। দাউদ রাশেদ দুররে মুখতারের ব্যাখ্যাগ্রন্থের যে পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে একথা লিখেছে যে, ব্যাখ্যাকার বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষাঙ্গ; এটা আল্লামা শামির উপর একটা মিথ্যা অপবাদ। আল্লামা শামি আবু সাউদের টীকা থেকে একথা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টি উদ্ধৃত করেছেন।

তিনি বলেন, হাশিয়ায়ে আবু সাউদে আছে, কোনো কোন ব্যক্তি থেকে এ জায়গায় এমন কথা নকল করা হয়েছে, যা মুখে বলার মত নয়, কিতাবে তা লেখা তো দূরের কথা। আল্লামা বলেন, আবু সাউদ যেন এদিকে ইশারা করছেন, যা বলা হয় যে, عضو দ্বারা উদ্দেশ্য পুরুষাঙ্গ।[৩১৯]

দেখা যাচ্ছে, দুররে মুখতারের ব্যাখ্যাকার একে প্রত্যাখ্যান করছেন, আর গায়রে মুকাল্লিদ তার এ প্রত্যাখ্যাত কথাকে পৃষ্ঠাসহ উদ্ধৃতি দিয়ে তারই কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

নোট : মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া রয়েছে। বুঝে আসছে না, দাউদ রাশেদ এ তিনশ ষাট জোড়া ছেড়ে কীভাবে এই একটি অঙ্গের সাথে জড়িয়ে গেলেন।

ফায়েদা : যদি এ অঙ্গ দ্বারা পুরুষাঙ্গই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে أصغر عضوا এর রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেগানা মহিলাদের পিছনে সময়ক্ষেপণকারী না হবে। নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী হবে। তাছাড়া যদি ইঙ্গিতসূচকভাবে লম্বা হাতের দ্বারা দানশীলতা এবং ছোট হাতের দ্বারা কৃপণতা উদ্দেশ্য নেওয়া যায় তাহলে একথার দ্বারা পূতপবিত্র উদ্দেশ্য নিলে এমন কী আসে যায়।[৩২০]

---

৩১৯. শামি : পৃষ্ঠা ৫৫৮।

৩২০. তাজাল্লিয়াতে আনওয়ার : ১/১৪৫-১৪৭।

আপত্তি : বাইশ

সমকালীন বাদশার উপর হদ (শরয়ি শাস্তি) এর মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলাম ও হদসমূহ

আল্লাহর হদসমূহের মধ্য থেকে কোনো হদকে তিরোহিত করে দেওয়া কারো সাধ্যের বিষয় নয়। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, যা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন–

أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

কুরাইশরদের মাখযুমি কবিলার এক মহিলার বিষয় ভোগান্তিতে ফেলল। মহিলাটি চুরি করেছিল। লোকেরা বলল, এর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কে সুপারিশ করবে? তারা বলল, এ কাজের সাহস উসামা ছাড়া আর কার আছে? কেননা সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহধন্য। এরপর হযরত উসামা যখন তার ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উসামা, তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদসমূহের মধ্য থেকে একটি হদের ক্ষেত্রে সুপারিশ করছ? এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন যে, হে লোকসকল, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি কোনো দুর্বল লোক এ কাজ করত তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম, যদি ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করত, আমি তার হাতও কেটে দিতাম।[৩২১]

ফিকহে হানাফি ও হদসমূহ

এবার হানাফিরা বাদশা ও খলিফাকে কী পরিমাণ ছাড় দিচ্ছে দেখুন, হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

وكل شيئ صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام لا حد عليه إلا القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال.

খলিফা যা মন চায়, করতে পারে। তার উপর কিসাস ছাড়া কোনো হদ নেই। আর তা তার থেকে ও তার মাল থেকে নেওয়া হবে।[৩২২]

দ্বাবিংশ আপত্তির জবাব

যেহেতু কিসাস বান্দার হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর এর দাবিদার হকের অধিকারী যে সে, তাই হকের অধিকারী দাবি করলে কিসাস নেওয়া হবে। কিন্তু হদসমূহ আল্লাহর হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং হদসমূহের প্রয়োগ ও

---

৩২১. মুসলিম, হাদিস নং ৬৮৮।

৩২২. হিদায়া আওয়ালাইন : ৫০০। কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৪।

বাস্তবায়ন সমকালীন খলিফার সাথে সম্পর্কিত। এখন যদি খলিফার উপরই হদ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তখন খেলাফত ও উম্মাতে মুসলিমার ঐক্যের কী হবে? আর এ হদ কায়েমই বা কে করবে? হ্যাঁ, এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে, সেক্ষেত্রে এমন খলিফাকে মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ পরিষদ অপসারণ করে তার উপর হদ লাগানোর ব্যবস্থা করবে, আর স্পষ্ট কথা হল, তখন সে আর খলিফা থাকবে না। হিদায়াগ্রন্থকার এখানে একথাটিই লিখেছেন।

আপত্তি : তেইশ

মদ থেকে সিরকা বানানোর মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে মদ থেকে সিরকা বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا»

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদকে সিরকা বানানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তিনি বললেন, না। (অর্থাৎ মদকে সিরকা বানানো যাবে না)।[৩২৩]

ফিকহে হানাফিতে মদ থেকে সিরকা বানানোর অনুমতি

আসুন, এবার হানাফিদের জিজ্ঞেস করুন। হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

"وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها، ولا يكره تخليلها"

---

৩২৩. মুসলিম : ৩/১৫৭৩।

যদি মদ নিজে নিজে সিরকা হয়ে যায় অথবা তাতে কোনো জিনিস মিলিয়ে একে সিরকা বানিয়ে ফেলা হয়, তাহলে এটা কোনো মাকরুহ কাজ নয়।[৩২৪]

ত্রয়োবিংশ আপত্তির জবাব

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, এই হুকুম (অর্থাৎ সিরকা বানানো থেকে নিষেধ করা) ইসলামের প্রথম যুগের। যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম নতুন নতুন অবতীর্ণ হয়েছিল, আর লোকদের অন্তর থেকে মদের ভালোবাসা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করার জন্য এ পরিমাণ কঠোরতা করা হয়েছিল যে, মদের জন্য ব্যবহৃত পাত্রগুলো ব্যবহার করা থেকেও নিষেধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন লোকদের অন্তরে মদের প্রতি ঘৃণাবোধ বদ্ধমূল হয়ে গেল, তখন পাত্রগুলো ব্যবহার করার এবং মদকে সিরকা বানানোর নিষেধাজ্ঞাও উঠিয়ে নেওয়া হল। পাত্রগুলো ব্যবহারের অনুমতি সম্বলিত হাদিসসমূহ হাদিসের কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে রয়েছে। এখানে মদকে সিরকা বানানোর অনুমতিসংবলিত রেওয়ায়েত ও আসারসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হাদিস নং (১)

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ

তোমাদের সিরকার মধ্যে সর্বোত্তম সিরকা হচ্ছে মদ থেকে তৈরি সিরকা।[৩২৫]

হাদিস নং (২)

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমাদের এখানে একটা ছাগল ছিল, আমরা যার দুধ দোহন করতাম। একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে না দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ছাগলের

---

৩২৪. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪৪. হিদায়া আখেরাইন : পৃষ্ঠা ৪৯৬।

৩২৫. সুনানুল কুবরা বায়হাকি : হাদিস নং ১১৭২৩।

কী হয়েছে? লোকেরা বলল, সেটা মারা গেছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া থেকে উপকৃত হলে না? আমরা বললাম, সেটা তো মৃত ছিল। তখন তিনি বললেন,

إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ

দাবাগাতের দ্বারা তা পবিত্র হয়ে যায়, যেমন মদকে সিরকা হালাল করে দেয়।[৩২৬]

হাদিস নং (৩)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حدثتني امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حِرَاشٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ "

উম্মে হেরাশ বলেন, তিনি হযরত আলিকে মদ থেকে তৈরি সিরকা সালুন হিসাবে খেতে দেখেছেন।[৩২৭]

হাদিস নং (৪)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ فِي خَلِّ الْخَمْرِ، فَسَأَلَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

জুবাইর ইবনে নুফাইর বলেন, হযরত মুয়াযের সহচরদের দুই ব্যক্তি মদ থেকে তৈরি সিরকার ব্যাপারে বিতর্কে জড়াল। তখন তারা হযরত আবুদ দারদা থেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই।[৩২৮]

হাদিস নং (৫)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَجُلٌ يَتَغَدَّى

---

৩২৬. দারাকুতনি : ৪/২৬৬, আল হিদায়া : ৪/৪০৪।

৩২৭. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯/২৫২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।

৩২৮. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১২।

فَدَعَاهُ إِلَى طَعَامِهِ» فَقَالَ: «وَمَا طَعَامُكَ؟» قَالَ: خُبْزٌ، وَمُرِيٌّ، وَزَيْتٌ قَالَ: «الْمُرِيُّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْخَمْرِ» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: " هُوَ خَمْرٌ فَتَوَاعَدَا إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَاهُ، فَقَالَ: ذَبَحَتْ خَمْرَهَا الشَّمْسُ، وَالْمَلْحُ، وَالْحِيتَانُ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

আতিয়্যা ইবনে কায়স বলেন, হযরত আবুদ দারদার সহচরদের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, লোকটি তখন খানা খাচ্ছিল। লোকটি তাকে খানা খাওয়ার দাওয়াত দিল। সে জিজ্ঞেস করল, কী খাবার? লোকটি বলল, রুটি, মুরি ও তেল। সে বলল, ঐ মুরি কী, যা মদ থেকে তৈরি করা হয়? লোকটি বলল, হ্যাঁ। সে বলল, এটা তো মদই। এরপর উভয়ে আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেল এবং তার কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এর নেশাকে রোদ, লবণ ও মাছের মিশ্রণ দূর করে দিয়েছে। অর্থাৎ এতে (এটা খাওয়াতে) কোনো সমস্যা নেই।[৩২৯]

হাদিস নং (৬)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْعَلُ الْخَمْرُ خَلًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِي: ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَهُ

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, মদকে কি সিরকা বানানো যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাকে আমর ইবনে দিনার এরকম বলেছেন।[৩৩০]

৩২৯. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯/২৫৩।
৩৩০. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯/২৫৩।

হাদিস নং (৭)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ اصْطَنَعَ خَلَّ خَمْرٍ» أَوْ قَالَ: «حَسَا خَلَّ خَمْرٍ»

আইয়ুব বলেন, আমি ইবনে সিরিনকে দেখেছি যে, তিনি মদ থেকে সিরকা বানিয়েছেন অথবা এরূপ বলেছেন, মদের সিরকার ঝোল।[৩৩১]

হাদিস নং (৮)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِخَلِّ الْخَمْرِ»

ইয়াহইয়া ইবনে আতিক বলেন, ইবনে সিরিন মদের সিরকায় কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করতেন না।[৩৩২]

হাদিস নং (৯)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: " كَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَقُولُ: خَلُّ خَمْرٍ، وَيَقُولُ: خَلُّ الْعِنَبِ، وَكَانَ يَصْطَبِغُ فِيهِ "

ইবনে আওন বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সিরিন 'মদের সিরকা' বলার পরিবর্তে 'আঙ্গুরের সিরকা' বলতেন এবং তা সালুন হিসাবে ব্যবহার করতেন।[৩৩৩]

---

৩৩১. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৯/২৫৩।

৩৩২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।

৩৩৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩, কিতাবুল আমওয়াল মুতারজাম : ১/২৪১,২৪২।

হাদিস নং (১০)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا كَانَ خَمْرًا فَصَارَ خَلًّا»

নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর মদ থেকে তৈরি সিরকা খেতে কোনো সমস্যা মনে করতেন না।[৩৩৪]

হাদিস নং (১১)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسَرْبَلٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ خَلِّ الْخَمْرِ، قَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ إِدَامٌ»

মুসারবাল আবদির মা বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মদের সিরকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। এটাও এক প্রকার তরকারি।[৩৩৫]

হাদিস নং (১২)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ»

সায়িদ ইবনে জুবাইর মদের তৈরি সিরকাকে তরকারি হিসাবে ব্যবহার করতেন।[৩৩৬]

---

৩৩৪. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।
৩৩৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।
৩৩৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।

হাদিস নং (১৩)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِخَلِّ خَمْرٍ»

হাসান বসরি বলেন, মদের তৈরি সিরকায় কোনো সমস্যা নেই।[৩৩৭]

হারেস উকলীর উদ্ধৃতি

শুবরুমা বর্ণনা করেন, হারেস উকলী ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে মিরাসের সম্পত্তি হিসাবে মদ পেয়েছিল, বলেছিলেন, সে এতে লবণ ঢেলে দিক, যাতে তা সিরকা হয়ে যায়।[৩৩৮]

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজের উদ্ধৃতি

মুসান্না ইবনে সায়িদ বলেন, উমর ইবনে আবদুল আজিজ তার কুফার প্রশাসক আবদুল হামিদ ইবনে আবদুর রহমানকে লিখে পাঠালেন, মদ যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর না করা হয়। আর তোমরা নৌকায় বোঝাইকৃত যে মদ পাবে তা সিরকায় পরিবর্তন করে ফেল। আবদুল হামিদ নির্দেশ অনুসারে এ হুকুম তার ওয়াসেতের প্রতিনিধি মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশিরের কাছে লিখলেন। তিনি নিজে গিয়ে নৌকাগুলো দেখলেন এবং প্রতিটি মদের মটকায় লবণ ও পানি ঢেলে সিরকা বানিয়ে ফেললেন।[৩৩৯]

সারকথা

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সিরকাকে হালাল করেছেন আর মদকে হারাম করেছেন, তাই আমরাও এর উপর আমল করছি যে, মদ হারাম আর সিরকা হালাল। আর সিরকা চাই মদ থেকে তৈরি হোক বা অন্য কোনো জিনিস

---

৩৩৭. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৮/১৩।

৩৩৮. কিতাবুল আমওয়াল মুতারজাম : পৃষ্ঠা ২৪২।

৩৩৯. কিতাবুল আমওয়াল মুতারজাম : পৃষ্ঠা ২৩৮।

থেকে তৈরি হোক, তা জায়েয ও হালাল। এর দলিল হিসাবে আমরা অনেকগুলো হাদিসে মারফু ও সাহাবায়েকেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবেয়িনের ফাতাওয়া নকল করেছি। এত কিছুর পরেও আপত্তি উত্থাপনকারীর পক্ষ থেকে এ অপবাদ আরোপ ও লাগামহীন উক্তি তার ভেতরকার বিদ্বেষকেই ফুটিয়ে তুলছে।

আপত্তি : চব্বিশ
হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করার মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলাম ও হিংস্র প্রাণীর চামড়া

আবুল মালিহ ইবনে উসামা তার পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার থেকে নিষেধ করেছেন।[৩৪০]

ফিকহে হানাফি ও কুকুরের চামড়া

এবার হানাফিদের মত শুনুন, হিদায়াগ্রন্থকার লেখেন,

١. وكل إهاب دبغ فقد طهرجازت الصلوة فيه والوضوء منه إلا جلد الآدمي والخنزير.

---

৩৪০. আবু দাউদ : হাদিস নং ৪১৩২।

সকল চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। এর উপর নামায এবং এর মাধ্যমে অযু করা জায়েয আছে, তবে মানুষ ও শুকরের চামড়ার কথা আলাদা।[৩৪১]

এরপর আরো বলেন,

২. ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة لأنه يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر لحمه وهو الصحيح.

যে প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করার দ্বারা পবিত্র হয়, তার চামড়া জবাই করার দ্বারাও পবিত্র হয়ে যায়, এমনিভাবে এর গোশতও পবিত্র হয়ে যায়, এবং এটাই সহিহ।[৩৪২]

এমনিভাবে রদ্দুল মুহতার (১/১৩৯) এ আছে,

৩. قال مشايخنا: من صلى وفي كمه جرو تجوز صلاته، وقيده الفقيه أبو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم.

আমাদের মাশায়েখ বলেছেন, কেউ যদি এ অবস্থায় নামায পড়ে যে, তার হাতায় কুকুরের পানকৃত উচ্ছিষ্ট পানি লেগে থাকে, তাহলে এ অবস্থায়ও তার নামায হয়ে যাবে। ফকিহ আবু জাফর হিন্দওয়ানী এ শর্ত যুক্ত করেছেন যে, কুকুরের মুখ বন্ধ থাকা উচিত।

এমনিভাবে দুররে মুখতারে আছে–

৪. ليس الكلب بنجس العين عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة، فيباع ويؤجر ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلوا، ولو أخرج حيا ولم يصب فمه الماء لا

---

৩৪১. হিদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ২৪।
৩৪২. হিদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ২৪।

يفسد ماء البئر ولا الثوب بانتفاضه ولا بعضه ما لم ير ريقه ولا صلاة حامله ولو كبيرا

ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক নয় আর এর উপরই ফাতওয়া। যদিও কেউ কেউ এর নাপাক হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যেমনটি ইবনুশ শাহনাহ উল্লেখ করেছেন। এজন্য কুকুর বিক্রি করা যায়, ভাড়া দেওয়া যায়, একে জামিন হিসাবে রাখা যায়, এর চামড়া দ্বারা জায়নামায বানানো যায় এবং এর দ্বারা পানি ওঠানোর ডোলও বানানো যায়, এমনিভাবে যদি কুপে পড়ে যাওয়া কুকুরকে জীবিত বের করা যায় এবং তার মুখ বাইরে থাকে তাহলে কূপের পানি পবিত্র এবং কাপড়ও পবিত্র, যতক্ষণ না এর লালা কাপড়ে লাগে। আর একে উঠিয়ে নামায আদায়কারীর নামায হয়ে যায়, যদিও তা বড় হয়।[৩৪৩]

চতুর্বিংশ আপত্তির জবাব

আমরা প্রথমে এ কথা প্রমাণ করব যে, দাবাগাত দেওয়ার পর চামড়া পবিত্র হয়ে যায়। এরপর হিদায়া ও রদ্দুল মুহতারের এবারতের বিশ্লেষণ করব।

দাবাগাত দেওয়ার দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়

ইমাম মুসলিম রহ. মুসলিম শরিফ কিতাবুল হায়যে একটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন, باب طهارة جلود الميتة بالدباغ অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদ এ প্রসঙ্গে যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত দেওয়ার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। এ অনুচ্ছেদে ইমাম মুসলিম আটটি হাদিস নকল করেছেন, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাবাগাত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

---

৩৪৩. রদ্দুল মুহতার : ১/১৩৯।।. কিয়া ফিকহে হানাফিয়াহ কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪৫,৪৬।

হাদিস নং (১)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, কেউ হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর বাঁদীক একটি ছাগল সদকা করল। এরপর ছাগলটি মরে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলটিকে এক জায়গায় ফেলে দেওয়া অবস্থায় দেখে বললেন, তোমরা কেন এ মৃত ছাগলটির চামড়া নিলে না। তোমারা এটাকে দাবাগাত করে কাজে লাগাতে। লোকেরা বল, আল্লাহর রাসুল, ছাগলটি তো মৃত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মৃত প্রাণী শুধু খাওয়া হারাম।

হাদিস নং (২)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাল্লাহু আনহা তাঁকে বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রীর ঘরে একটি প্রাণী পালন করা হয়েছিল। একদিন প্রাণীটি মরে গেল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন এর চামড়া নিলে না, এটা তোমরা কাজে লাগাতে পারতে।

হাদিস নং (৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন চামড়ায় দাবাগাত করা হয় তখন তা পবিত্র।

হাদিস নং (৪)

আবুল খায়ের থেকে বর্ণিত, আমি ইবনে ওয়ালাকে একটি পুস্তিন (চামড়ার জামা বা কোট) পরিহিত দেখলাম। আমি তাকে স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমাকে স্পর্শ করছ কেন? (তুমি কি একে নাপাক মনে কর?) আমি (ইবনু ওয়া'লা) আবদুল্লাহকে বলেছিলাম, আমরা পশ্চিমা দেশে থাকি। সেখানে বার্বারের অনেক কাফের ও অগ্নিপূজক রয়েছে। তারা জবাই

করে ছাগল নিয়ে আসে। আমরা তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাই না। আর তারা চর্বিভর্তি মশক আনে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছিলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চামড়া দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। (অর্থাৎ চামড়ায় যখন দাবাগাত দেওয়া হয়ে গেছে তখন তা পবিত্র, যদিও দাবাগাত কাফেরই দিক না কেন)

হাদিস নং (৫)

ইবনে ওয়ালা সাবায়ী থেকে বর্ণিত, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা পশ্চিমা দেশে বসবাস করি। সেখানে মাজুসিরা (অগ্নিপূজক) পানির মশক নিয়ে আসে, এগুলোতে চর্বি থাকে। তখন তিনি বললেন, তোমরা এতে পানাহার করতে পার। আমি বললাম, আপনি কি এটা নিজের রায় থেকে বলছেন? তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, দাবাগাত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

সম্মানিত পাঠক, আমরা এখানে মুসলিম শরিফের শুধু পাঁচটি রেওয়ায়েত নকল করেছি। এ মাসআলার উপর হাদিসের কিতাবসমূহে অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাবাগাত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়ে যায়।

হাদিস নং (৬)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত প্রাণীর শুধু গোশত (খাওয়া) হারাম বলেছেন। এটা ছাড়া এতে যে চামড়া, চুল ও পশম রয়েছে, এগুলো ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।[৩৪৪]

---

৩৪৪. দারাকুতনি, باب الدباغ।

হাদিস নং (৭)

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাওলা (আযাদকৃত) গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও সফরের ইচ্ছা করতেন তখন পরিবারের সকলের মধ্য থেকে কেবল হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে তার সর্বশেষ কথাবার্তা হত। আর যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন (সর্ব) প্রথম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে সাক্ষাত করতেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন, তখন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের দরজায় পর্দা টানিয়েছিলেন এবং হাসান ও হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়কে রুপার দুটি কাঁকন পরিয়েছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে যখন এসব দেখলেন, তিনি ফাতেমার ঘরে তাশরিফ আনলেন না। (অর্থাৎ যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল।) তখন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ধারণা করলেন, এ জিনিসগুলোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়েছে। জিজ্ঞেস করার পর এ ধারণাই সত্য হল।

হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন দরজা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেললেন। এরপর উভয় সাহেবজাদার হাত থেকে ঐ অলংকারও খুলে ফেললেন এবং কেটে তাদের সামনে ফেলে দিলেন। দুই ভাই কাঁদতে কাঁদতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে আসলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে ঐ কাটা টুকরাগুলো নিয়ে বললেন, হে সাওবান, এগুলো নিয়ে অমুক ঘরের লোকদের দিয়ে দাও। এরপর বললেন, এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত। (অর্থাৎ ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন) আমি এটা অপছন্দ করি যে, এরা দুনিয়াতেই তাদের স্বাদ-আহ্লাদ ভোগ করে ফেলবে। হে সাওবান, ফাতেমার জন্য রেশম ফুলের একটি হার আর হাতির দাঁতের দুটি কাঁকন কিনে নাও।[৩৪৫]

---

৩৪৫. আবু দাউদ, باب في الانتفاع بالعاج, কিতাবুত তারাজ্জুল।

গায়রে মুকাল্লিদ আল্লামা ওয়াহিদুয যামান এ হাদিসের আলোচনায় লেখেন, এ হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, হাতির দাঁত পবিত্র এবং তা ব্যবহার করা জায়েয। বুখারিতে আছে, পূর্বের আলেমগণ এর দ্বারা চিরুনি করতেন এবং এতে তেল রাখতেন।[৩৪৬]

এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মৃত প্রাণীর হাড্ডি পবিত্র।

হাদিস নং (৮)

সাইয়িদাহ হযরত সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, আমাদের একটি ছাগল মারা গেল, তখন আমরা এর চামড়ায় রঙ লাগালাম। এরপর থেকে আমরা সবসময় এতে নাবিয বানাতাম, এমনকি তা পুরোনো হয়ে যায়।[৩৪৭]

হাদিস নং (৯)

সালামা ইবনে মুহাব্বিক থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে তাবুকে এক মহিলার কাছে পানি চাইলেন। ঐ মহিলা বলল, আমার কাছে যে পানি আছে, তা তো মৃত প্রাণীর মশকে রাখা আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তা দাবাগাত করেছিলে? মহিলা বলল, হ্যাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তা দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয়ে গেছে।[৩৪৮]

একটি মাসআলার বিশ্লেষণ

এখন এ মাসআলা থেকে যায় যে, দাবাগত কোনো কোন জিনিস দ্বারা দেওয়া যায় এবং এর পদ্ধতি কী। এর সহজবোধ্য জবাব হচ্ছে, যে জিনিস দ্বারাই দাবাগাত হাসিল হয় তা দ্বারাই দাবাগাত দেওয়া জায়েয আছে। আর যে পদ্ধতিটি সহজ তাই গ্রহণ করা উচিত। মূল কথা হচ্ছে দাবাগাত দেওয়া।

---

৩৪৬. আবু দাউদ মুতারজাম : ৩/২৯৮।

৩৪৭. নাসাই, باب جلود الميتة।

৩৪৮. নাসাই, باب جلود الميتة।

হাদিসসমূহের মধ্যে কয়েকটি জিনিসের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমনটা ইমাম নাসায়ি রহ. একটি অনুচ্ছেদ লিখেছেন, ما يدبغ به جلود الميتة অর্থাৎ মৃত প্রাণীর চামড়াকে যেসব জিনিস দ্বারা দাবাগাত দেওয়া যায়। এরপর তিনি হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদিস নকল করেছেন।

হাদিস নং (১০)

হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কুরাইশের কিছু লোক আসল। তারা একটি ছাগলকে গাধার মত টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমরা এর চামড়া নিয়ে নিতে, তাহলে ভালো হত। তারা আরয করল, এটা তো মৃত প্রাণী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে পানি ও কুরয পাক-পরিষ্কার করে দেয়।

নোট : কুরয এক ধরনের ঘাস বা গাছের চামড়া বিশেষ, যা দিয়ে চামড়া দাবাগাত দেওয়া হয়। (নাসায়ী, باب ما يدبغ به جلود الميتة)

হাদিস নং (১১)

ইমাম বুখারি নকল করেন, وقال حماد لا بأس بريش الميتة আর হাম্মাদ বলেছেন, মৃত পাখির পালক ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।[৩৪৯]

হাদিস নং (১২)

হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, মৃত প্রাণীর পশম ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই, তবে এটা ধুয়ে নিতে হবে। এমনিভাবে মৃত পাখির পালক ব্যবহারেও কোনো সমস্যা নেই।[৩৫০]

---

৩৪৯. বুখারি, باب ما يقع من النجاسات فى السمن والماء কিতাবুল অযু।

৩৫০. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ২০৬।

হাদিস নং (১৩)

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন,

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " فِي عِظَامِ المَوْتَى، نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ، يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا "

আর যুহরি মৃত প্রাণী উদাহরণত হাতি ইত্যাদির হাড্ডির ব্যাপারে বলেছেন, আমি পূর্ববর্তী আলেমদের দেখেছি যে, তারা এটা দিয়ে চিরুনি করতেন এবং এতে তেল রাখতেন আর তারা এটাকে কোনো সমস্যা মনে করতেন না।[৩৫১]

হাদিস নং (১৪)

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন,

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: «وَلاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ»

আর ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম বলেছেন, হাতির দাঁতের ব্যবসা করতে কোনো সমস্যা নেই।[৩৫২]

হাদিস নং (১৫)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক দিয়ে অযু করার ইচ্ছা করলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, এটা মৃত প্রাণী থেকে তৈরি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে দাবাগাত দেওয়ার দ্বারা এর দুর্গন্ধ ও নাপাকি দূর হয়ে যায়।[৩৫৩]

---

৩৫১. বুখারি, কিতাবুল অযু ওয়াত তাহারাহ, باب ما يقع من النجاسات।

৩৫২. বুখারি, باب ما يقع من النجاسات, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : পৃষ্ঠা ২১১।

৩৫৩. ইবনে খুযায়মা, হাদিস নং ১১৪, আস সুনানুল কুবরা বায়হাকি, হাদিস নং ৪৫১, মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ২১১৭।

আশ্চর্যের বিষয় হল, আপত্তি উত্থাপনকারী এটা খেয়াল করলেন না যে, আমি এ আপত্তি ফিকহে হানাফির উপর করছি না কি খোদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর করছি? ফিকহে হানাফি তো সে কথাই বলছে, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এরপরও যদি এটা নোংরা মাসআলা হয়, তাহলে আপনাদের এটা দেখে লজ্জা করা উচিত যে, এ মাসআলা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? আপনাদের আল্লামা ওয়াহিদুয যামান কুকুর, হিংস্র প্রাণী, বাঘ তো পরের কথা, শুকরের চামড়া পর্যন্ত দাবাগাত দ্বারা পবিত্র হয়ে যাওয়ার কথা লিখেছেন।

হানাফি ফকিহগণ তো তাও মানুষ ও শুকরকে এ হুকুম থেকে বা রেখেছেন, কিন্তু এ হযরত তো এসবকেও বাদ রাখেননি। তিনি লেখেন,

أيما إهاب دبغ فقد طهر ومثله المثانة والكرش واستثنى بعض أصحابنا جلد الخنزير والآدمي والصحيح عدم الاستثناء.

অর্থাৎ যে কোনো চামড়াকেই দাবাগাত দিলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। মূত্রথলি ও পাকস্থলিরও একই হুকুম। আমাদের কোনো কোন আলেম শূকর ও মানুষকে এ হুকুম থেকে বাদ দিয়েছেন, কিন্তু সহিহ কথা হচ্ছে, এগুলোও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।[৩৫৪]

রদ্দুল মুহতারের এবারতের বিশ্লেষণ

এ কথা প্রথমেই বলা হয়েছে যে, শূকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পবিত্র হয় না, চাই তা দাবাগাত দেওয়া হোক বা না হোক। কেননা শূকর তার সত্তাগতভাবেই অপবিত্র। অর্থাৎ তা পেশাব ও পায়খানার মত ভেতর ও বাইরে নাপাক। এটা ছাড়া অন্যান্য হারাম প্রাণীসমূহ সত্তাগতভাবে অপবিত্র নয়, এগুলোর দেহ পেশাব-পায়খানার মতো অপবিত্র নয়, বরং এগুলোর দেহের উপরিভাগ পবিত্র। অবশ্য এগুলোর ভেতরের ভেজা জিনিসগুলো নাপাক। আর এই হিসাবে মানুষ ও হালাল প্রাণীর একই হুকুম। অর্থাৎ এদের শরীরের বাইরের অংশ পবিত্র, কিন্তু ভিতরের ভেজা জিনিসগুলো

---

৩৫৪. নুযুলুল আবরার : ১/২৯।

নাপাক। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরের ভেজা নাপাকির চিহ্ন শরীরের উপরে প্রকাশ না পাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীরকে পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হবে। আর ভিতরের ভেজা নাপাকির চিহ্ন শরীরের উপর দুইভাবে প্রকাশ পায়–

মৃত্যুর পর; কেননা মৃত্যুর পর মানুষ হোক বা প্রাণী হোক, সকলের শরীর নাপাক হিসাবে গণ্য হয়। এ কারণেই কূপ ও হাউজে কুকুর মারা গেলে তা নাপাক হয়ে যায়। এমনিভাবে যদি এগুলোর মধ্যে কোনো মানুষ পড়ে মারা যায়, তাহলে তখনও এগুলো নাপাক হয়ে যায়।

ভিতরের নাপাক শরীর থেকে বেরিয়ে আসলে তা যে জিনিসের সাথে লাগবে তা নাপাক হয়ে যাবে। যেমন অপবিত্র জিনিস মানুষের শরীরের ভিতরে আছে, এরপরও মানুষকে পবিত্র মনে করা হয়, কিন্তু এ নাপাকিই যখন মানুষের শরীর থেকে বেরিয়ে তার নিজের শরীরের উপর বা অন্য কোনো জিনিসে লেগে যায় তখন তা নাপাক হয়ে যায়।

একই অবস্থা হালাল ও হারাম প্রাণীরও; যদি এগুলোর ভিতরের নাপাকি এগুলোর শরীরের উপরে লেগে যায় তাহলে শরীর নাপাক হবে; নচেৎ এগুলোর শরীর পবিত্র বলে গণ্য। বাকি রইল এ সকল প্রাণীর ব্যাপারে স্বভাবজাত ঘেন্না, তো এটা ভিন্ন জিনিস।

একটি বিষয় স্মরণ রাখা চাই যে, হারাম প্রাণীসমূহের ভেজা জিনিসগুলোর মধ্যে পেশাব, পায়খানা, রক্ত, ঘাম, থুথু ও লালা নাপাক। পক্ষান্তরে মানুষ ও হালাল প্রাণীর ভেজা জিনিসগুলোর মধ্যে শুধু পেশাব, পায়খানা ও রক্ত নাপাক, আর বাকিগুলো পাক।

এ মৌলিক আলোচনার পর আলোচ্য মাসআলা বুঝা কোনো কঠিন কিছু নয় যে, কুকুর যদি জীবিত হয় এবং এর শরীরের উপরে অন্য কোনো নাপাকি লেগে না থাকে এবং ঘামও না থাকে, তাহলে তার শরীর উপর থেকে পাক। বাকি রইল ভেতরের নাপাকিগুলো, তো যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ভেতরে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এর চিহ্ন শরীরের উপরে প্রকাশ পায় না।

এজন্য যদি কোনো ব্যক্তি নামাযে কুকুরের ছোট বাচ্চা ওঠায়, শর্ত হচ্ছে সে সময় এর শরীরের উপর নাপাক না থাকতে হবে এবং এর মুখ বাঁধা থাকতে হবে, যাতে এর থুথু ও লালা না লাগে এবং নামায শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত

এর কোনো ভেজা জিনিস কাপড় ও শরীর ইত্যাদিতে না লাগতে হবে তাহলে নামায হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে নামায ভঙ্গকারী কোনো কিছু পাওয়া যায়নি, আর পবিত্র জিনিস আমলে কাসির ব্যতীত ওঠানো নামায ভঙ্গকারী নয়।

আপত্তি উত্থাপনকারীর অজ্ঞতা না খেয়ানত

আপত্তি উত্থাপনকারীর نجس العين বা সত্তাগতভাবে নাপাক ও نجس الغير সত্তাগতভাবে নাপাক না হওয়ার মধ্যকার পার্থক্য জানা নেই। কুকুর সত্তাগতভাবে নাপাক নয় আর এমন প্রাণীর শরীর পবিত্র, যতক্ষণ না শরীরে কোনো নাপাকি লাগে। তো এ সব বিষয় না জানা আপত্তি উত্থাপনকারীর মূর্খতা হিসাবে গণ্য। আর যদি এই সব কিছু জানার পরেও শুধু ফিকহের প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি আপত্তি তুলে থাকেন, তাহলে এটা তার খেয়ানত ছাড়া কিছু নয়।

গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে প্রশ্ন

১. যদি কোনো ব্যক্তি কুকুরের বাচ্চা উঠিয়ে নামায পড়ে, যেটার শরীরের উপর কোনো নাপাক নেই, আর নামাযের মধ্যেও কুকুরের কোনো নাপাক নামাযীর শরীর ও কাপড়ে লাগেনি, এছাড়া নামাযীর থেকে আমলে কাসিরও পাওয়া যায়নি, তাহলে এ নামায কি সহিহ না ফাসেদ? সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদিস দ্বারা জবাব দিন।

২. যদি কোনো ব্যক্তি ঘোড়া, গাভী বা এর বাচ্চা উঠিয়ে নামায পড়ে, তাহলে নামায জায়েয না নাজায়েয? সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস দিয়ে জবাব দিন।

৩. কোনো বাচ্চাকে উঠিয়ে নামায শুরু করল আর নামাযের মধ্যে বাচ্চা পেশাব করে দিল, এখন নামায সহিহ না ফাসেদ? সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস দিয়ে জবাব দিন।

৪. কুকুর জায়নামাযের উপর পেশাব বা পায়খানা করে দিল, তাহলে ধৌত করার ব্যতীত এর উপর নামায জায়েয না নাজায়েয? সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদিস দিয়ে জবাব দিন।

৫. কুকুর মসজিদে পেশাব করে দিয়েছে, এ অবস্থায় মসজিদ ধৌত করা জরুরি কি না? কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা জবাব দিন।

গায়রে মুকাল্লিদিনের মাযহাব

গায়রে মুকাল্লিদিনের মাযহাবে নাপাকি ওঠানো অবস্থায় এবং নাপাক কাপড়ে নামায জায়েয।[৩৫৫]

৩৫৫. বুদুরুল আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ৩৯, গায়রে মুকাল্লিদ নবাব সিদ্দিক হাসান খান রচিত।

আপত্তি : পঁচিশ

জোরপূর্বক তালাকের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে জোরপূর্বক তালাক

আরেকটি মাসআলা শুনুন, যার মধ্যে হানাফিরা হাদিসের বিরোধিতা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের অন্তরে সৃষ্টি হওয়া ওয়াসওয়াসাসমূহকে মাফ করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না সে ঐ অনুযায়ী আমল করে বা কথা বলে। এবং কাউকে কোনো কিছুতে বাধ্য করা হলে তাও মাফ।[৩৫৬]

অন্য হাদিসে এমন বলা হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

---

৩৫৬. ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২০৪৪।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মাতের উপর থেকে ভুল, ত্রুটি ও জোরপূর্বক করানো বিষয়গুলো মাফ করে দিয়েছেন।[৩৫৭]

ফিকহে হানাফি ও জোরপূর্বক তালাক

এর বিপরীতে হিদায়াগ্রন্থকার বলেন,

وطلاق المكره واقع.

জোরজবরদস্তির কারণে দেওয়া তালাক পতিত হয়ে যায়।[৩৫৮]

পঞ্চবিংশ আপত্তির জবাব

জোরজবরদস্তির কারণে দেওয়া তালাক পতিত হওয়ার দাবি হানাফিগণের কোনো একক বিষয় নয়, এ ব্যাপারে হানাফিগণের কাছে অনেক দলিল রয়েছে। যদি আপত্তি উত্থাপনকারীর মতে এ মাসআলা ভুল হয়ে থাকে তাহলে তারা দেখুক, এ ফাতওয়া কোথায় গিয়ে ঠেকে এবং কোন কোন সাহাবি ও তাবেয়ি তাদের নিশানার শিকার হন।

জোরজবরদস্তির কারণে দেওয়া তালাক পতিত হয়ে যাওয়ার দলিলসমূহ

দলিল নং (১)

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»[٣٥٩]

এ আসরের মধ্যে রয়েছে, জোরজবরদস্তির তালাক পতিত হয়ে যায়।

---

৩৫৭. ইবনে মাজাহ : হাদিস নং ২০৪৫।

৩৫৮. হিদায়া আওয়ালাইন : পৃষ্ঠা ৩৩৮। কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪৬, ৪৭।

৩৫৯. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ٣١٧/٦ باب طلاق الكره, হাদিস নং ১১৪৬৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ٨٠/٤ باب كان يرى طلاق المكره جائز, হাদিস নং ১৮০৩৫,

দলিল নং (২)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ»

এ আসারে রয়েছে, জবরদস্তির তালাক হয়ে যাবে। একই কথা শাবি, কাযি শুরাইহ, সায়িদ ইবনে মুসাইয়িব, ইবনে সিরিন ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন।[৩৬০]

দলিল নং (৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস রয়েছে, এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে করুক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে করুক, এগুলো সংঘটিত হয়ে যাবে। একটি হচ্ছে বিবাহ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তালাক, আর তৃতীয়টি হচ্ছে রাজ'আত (নিজ স্ত্রীকে তালাকের পর ফিরিয়ে নেওয়া)।[৩৬১]

যখন ঠাট্টাচ্ছলে তালাক দিলে তা পতিত হতে পারে তাহলে জবরদস্তির কারণে দিলে তা পতিত হওয়াটা তো স্বাভাবিক বিষয়।

দলিল নং (৪)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, مخبوط الحواس (পাগল) ব্যতীত প্রত্যেক (প্রাপ্তবয়স্ক) ব্যক্তির তালাক জায়েয। (অর্থাৎ পতিত হয়ে যায়)।[৩৬২]

এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, নেশাগ্রস্ত ও জবরদস্তির শিকার ব্যক্তির তালাক পতিত হয়ে যায়। এটাই হানাফিগণের মত।

---

৩৬০. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, ৩১৭/٦ ,باب طلاق الكره, হাদিস নং ১১৪৬৫।

৩৬১. আবু দাউদ শরিফ, باب فى الطلاق على الهزل পৃষ্ঠা ৩১৭, হাদিস নং ২১৯৪, তিরমিযি শরিফ, باب ما جاء فى الجد والهزل فى الطلاق পৃষ্ঠা ২৮৮, হাদিস নং ১১৮৪।

৩৬২. বুখারি তা'লীকীভাবে, ٧٩٤/٢ باب الطلاق فى الإعلاق والكره।

দলিল নং (৫)

সাফওয়া ইবনে ইমরান তাঈ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি শুয়েছিল, এরই মধ্যে তার স্ত্রী ছুরি নিয়ে আসল এবং বুকের উপর ছুরি ধরে বলল, আমাকে তালাক দিয়ে দে, নচেৎ আমি তোকে জবাই করে দিব। তখন লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তালাক দিয়ে দিল। এরপর সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনাটি খুলে বলল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, لا قيلولة في الطلاق অর্থাৎ তালাক হয়ে গেছে।[৩৬৩]

দলিল নং (৬)

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে ইবনে উমরের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি জবরদস্তির শিকার ব্যক্তির তালাককে কার্যকর করে দিয়েছেন।

দলিল নং (৭)

এভাবে শাবি, নাখয়ি, যুহরি, কাতাদা ও আবু কিলাবার ব্যাপারেও হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, তারা জবরদস্তির শিকার ব্যক্তির তালাককে কার্যকর করে দিয়েছেন।[৩৬৪]

---

৩৬৩. ইহইয়াউস সুনান : ৩/৩৪৯।

৩৬৪. ইহইয়াউস সুনান : ৩/৩৪৯।

আপত্তি : ছাব্বিশ

গোস্তাখে রাসুল (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি)-এর শাস্তির মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া কুফর

ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে এ অনুচ্ছেদ লিখেছেন, باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, তার ব্যাপারে বিধান কী। এরপর তিনি নিম্নে উল্লিখিত হাদিস নকল করেছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ»، فَقَامَ

الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, এক অন্ধ ব্যক্তি, তার এক স্ত্রী ছিল, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করত, তাঁকে গালিগালাজ করত। অন্ধ ব্যক্তি তাকে নিষেধ করত এবং ধমক দিত, কিন্তু সে শুনত না। এক রাতে সে আবারো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করল এবং তাকে গালিগালাজ করল। তখন অন্ধ লোকটি খঞ্জর বের করে তার পেটের উপর রাখল এবং ঢুকিয়ে দিল, এভাবে সে তাকে মেরে ফেলল। তার দু' পায়ের মাঝে একটি শিশু পড়ে রইল এবং রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করা হল। এদিকে লোকেরাও একত্র হল। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক এ কাজ করেছে, আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তার উপর যদি আমার কোনো হক থাকে, তাহলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। তখন অন্ধ লোকটি দাঁড়াল, সে লোকদের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসতে লাগল এবং কাঁপতে লাগল, একপর্যায়ে সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বসে গেল এবং বলল, আল্লাহর রাসুল, আমি এ মহিলার স্বামী, আমার স্ত্রী আপনাকে গালি দিত এবং আপনাকে ব্যঙ্গ করত। আমি তাকে নিষেধ করতাম, কিন্তু সে শুনত না। আমি তাকে ধমক দিতাম, কিন্তু সে পাত্তা দিত না। তার গর্ভ থেকে আমার মুক্তার মত দুটি বাচ্চা আছে, সে আমার জীবনসঙ্গিনী ছিল। গতরাতে সে আবারো আপনাকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করল এবং গালি দিতে লাগল। আমি খনজর নিয়ে তার পেটে রাখলাম এবং চাপ দিলাম, একপর্যায়ে আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। নবি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে লোকসকল, তোমরা সাক্ষী থাক, এ মহিলার রক্ত মূল্যহীন।[৩৬৫]

ফিকহে হানাফিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া প্রসঙ্গ

এবার হানাফিদের মতও শুনে নিন, তারা বলেন,

ومن امتنع من الجزية أو قتل مسلما أو سب النبي - عليه الصلاة والسلام - أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده

কোন যিম্মি যদি জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে অথবা কোনো মুসলমানকে হত্যা করে অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় অথবা কোনো মুসলমান মহিলার সাথে যিনা করে, তাহলে এরপরও তার চুক্তি (নিরাপত্তা) ভঙ্গ হবে না।[৩৬৬]

ষড়বিংশ আপত্তির জবাব

কুরআন কারিম, হাদিস শরিফ, আসারে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মত অনুযায়ী গোস্তাখে রাসুলের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এরই উপর ভিত্তি করে ফিকহে হানাফিতেও গোস্তাখে রাসুলের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে আর তা মৃত্যুদণ্ডই। লক্ষ্য করুন,

ফিকহে হানাফির মুহাক্কিক আলাল ইতলাক ইবনে হুমাম হানাফি বলেন,

كل من أبغض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقلبه كان مرتدا، فالسباب بطريق أولى، ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في إسقاط القتل. قالوا: هذا مذهب أهل الكوفة ومالك، ونقل عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه،

---

৩৬৫. আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৩৬১।

৩৬৬. হিদায়া আওয়ালাইন : ৫৭৮।।. কিয়া ফিকহে হানাফিয়া কুরআন ওয়া হাদিস কা নিচোড় হায় : পৃষ্ঠা ৪৭,৪৮।

যে ব্যক্তি তার অন্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্বেষ লালন করে সে মুরতাদ। তাহলে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি গালাজ করে সে তো অবশ্যই মুরতাদ। আমাদের মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে এবং সে তাওবা করলেও এটা তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করার ক্ষেত্রে কাজে আসবে না। এ মতটি আহলে কুফা ও ইমাম মালেকের। হযরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।[৩৬৭]

আল্লামা শামি বলেন,

أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه

অধিকাংশ হানাফি আলেম এমন যিম্মিকে হত্যা করার ফাতওয়া দেন, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, যদিও গ্রেপ্তারের পর সে ঈমান নিয়ে আসে।[৩৬৮]

দুররে মুখতারে আছে,

والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যদি সে প্রকাশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মন্দ কিছু বলে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৩৬৯]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানি বলেন,

وبالجملة فلا خلاف بين العلماء فى قتل الذمي أو الذمية إذا أعلن بشتم الرسول أو طعن في دين الإسلام طعنا ظاهرا.

ওলামায়ে ইসলামের এ মাসআলায় কোনো মতবিরোধ নেই যে, যদি যিম্মি পুরুষ বা নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে প্রকাশ্যে

---

৩৬৭. শরহে ফাতহুল কাদির : ৫/৯৮।

৩৬৮. রদ্দুল মুহতার : ৪/২১৫।

৩৬৯.. দুররে মুখতার : ৪/২১৪৬।

গোস্তাখি করে অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।[৩৭০]

মাওলানা আবদুল মালেক কান্ধলবী হানাফি লেখেন,

উম্মতের সকল ফুকাহা এবং আইম্মায়ে মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীন এর সিদ্ধান্ত হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।[৩৭১]

এ সকল হানাফি ওলামায়েকেরামের কথা থেকে বুঝা গেল যে, হানাফি মাযহাবে গোস্তাখে রাসুলের শাস্তি রয়েছে, আর তা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। সর্বশেষ হানাফিগণের সূত্র ছাড়া অন্য একটি সূত্র থেকে একথা প্রমাণ করার জন্য একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি যে, হানাফিগণের মতে গোস্তাখে রাসুলের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

কাযি ইয়ায রহ. বলেন,

أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال ذلك: مالك بن أنس، والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي . قال القاضي أبو الفضل : وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا تقبل توبته عند هؤلاء. وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه

সকল আহলে ইলমের এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, যে কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখি করবে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক ইবনে আনাস, ইমাম লাইস, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতও এমনটি। কাযি আবুল ফযল বলেন, হযরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার উদ্দেশ্য এটাই। আর এই সকল ইমামগণের মতে এমন ব্যক্তির তাওবারও বিবেচনা করা হবে না। ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার সহচরগণের মতও এমনটি।[৩৭২]

এখন আমরা হিদায়া এবারতের বিশ্লেষণে যাব।

---

৩৭০. ই'লাউস সুনান : ১২/৫৩৯।

৩৭১. নামূসে রাসুল : পৃষ্ঠা ২১০।

৩৭২. আশ শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা : ২/২১৫।

হিদায়ার এবারতের বিশ্লেষণ

এ মাসআলা হিদায়া ছাড়া ফিকহে হানাফির আরো অন্যান্য কিতাব যেমন ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি, দুররে মুখতার ইত্যাদিতেও আছে। কিন্তু মাসআলাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন যে, যদি ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক কোনো কাফের দেশ জয় করে এবং তারপর তাদের সাথে চুক্তি করে তাদের নিজের নিরাপত্তায় আশ্রয় দেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের চুক্তির বরখেলাফ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আবশ্যক হল, তাদের চুক্তিকে আপন অবস্থায় বহাল রাখা। তবে যদি তারা শরিয়ত নিষিদ্ধ কোনো অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে শরীয়তের আইন মাফিক তাদের উপর হদ কার্যকর করা হবে। তাই যদি কোনো মুসলিম নারীর সাথে কোনো যিম্মি যিনা করে অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখি করে আর তাদের সাথে কৃত চুক্তিনামায় এধরনের কোনো শর্তের উল্লেখ না থাকে, তাহলে তার সাথে কৃত চুক্তি আপন অবস্থায় বহাল থেকে যাবে। অবশ্য এ দুই অপরাধের শাস্তি তাকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যিনা করে করে থাকলে তার উপর যিনার হদ কার্যকর করা হবে।

দুররে মুখতারে আছে,

ولا بالزنا بمسلمة بل يقام عليه موجبه وهو الحد.

অর্থাৎ মুসলিম নারীর সাথে যিনা চুক্তি নষ্ট করবে না, বরং তার উপর যিনার হদ কার্যকর করা হবে। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মন্দ কিছু বলার ক্ষেত্রে যদি গোপনে এক দুই বার নিজের দলের মধ্যে বলে থাকে এবং চুক্তিনামায় এধরনের কোনো কিছুর না বলার শর্তের উল্লেখ না থাকে, তাহলে এ অবস্থায়ও যদিও তাদের সাথে কৃত চুক্তি আগের মত বহাল থাকবে, তবে রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে এবং ভয় দেখানোর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। আর হানাফিগণের মতে রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আর এধরনের গোস্তাখকে মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হবে।

দুররে মুখতারে আছে,

ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي قال العيني: واختياري في السب أن يقتل وتبعه ابن الهمام. قلت: وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي.

অর্থাৎ যিম্মি দীন ইসলাম বা কুরআন বা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে খারাপ কোনো মন্তব্য করলে তাকে উচিত শিক্ষা ও শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লামা আইনি বলেন, আমার মত হচ্ছে, তাকে হত্যা করা হবে। ইবনে হুমাম এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন এবং শায়েখ রামাল্লী এই ফাতওয়াই দিয়েছেন আর ইমাম শাফিয়ি রহ. এর মতও এটি।

উপর্যুক্ত বিধানাবলি কেবল তখনকার জন্য, যখন তার সাথে চুক্তির সময় এধরনের কিছু না বলার কোনো শর্ত না করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার সাথে চুক্তির সময় এধরনের শর্ত দেওয়া হয় যে, ইসলাম ধর্ম, কুরআন মাজিদ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করতে পারবে না, অথবা অমুক অমুক কাজ করা যাবে না, আর তারপর সে এর বিপরীত করে, তাহলে তার চুক্তিও বহাল থাকবে না, বরং তার রক্ত তখন হালাল হয়ে যাবে।

রদ্দুল মুহতারে আছে,

أقول: هذا إن لم يشترط انتقاضه به أما إذا شرط انتقض به كما هو ظاهر.

অর্থাৎ চুক্তি ভঙ্গ না হওয়ার বিষয়টি কেবল তখনই প্রযোজ্য, যখন চুক্তির সময় তার সাথে এধরনের কোনো শর্ত না করা হয়ে থাকে। এমন না হলে খারাপ মন্তব্য করলে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।

এমনিভাবে যদিও চুক্তির সময় তার সাথে এমন শর্ত করা হয়নি, কিন্তু সে প্রকাশ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি-গালাজ করে বেড়ায়, তাহলে এক্ষেত্রেও চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং এর কারণে তাকে হত্যা করা হবে।

রদ্দে মুহতারে আছে,

وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا لم يعلن، فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل، ولو امرأة وبه يفتى اليوم

অর্থাৎ চুক্তি না ভাঙ্গার বিষয়টা তখন, যখন সে প্রকাশ্যে গালি গালাজ না করবে। কিন্তু যদি সে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করে অথবা এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে, যদিও সে নারীই হোক না কেন। আর হানাফি মাযহাবে এখন এর উপরই ফাতওয়া।

সম্মানিত পাঠক, আপনারা লক্ষ্য করেছেন, হানাফি মাযহাবে গোস্তাখের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আপত্তি উত্থাপনকারীর তা জানা নেই। এমন একটা স্পর্শকাতর মাসআলায় হানাফি মাযহাবের উপর অপবাদ দিতে লজ্জা করল না?

আপত্তি : সাতাইশ

মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ করার ক্ষেত্রে হদের মাসআলা

আপত্তি উত্থাপনকারী লেখেন,

ইসলামে মাহরাম নারীদের সাথে বিবাহ হারাম

ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে এ অনুচ্ছেদ লিখেছেন, باب فى الرجل يزني بحريمه অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের মাহরাম নারীর সাথে বিবাহ করে, তার প্রসঙ্গে। এরপর তিনি নিম্নের হাদিসটি নকল করেছেন–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ، إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ - أَوْ فَوَارِسُ - مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يَطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَوْا قُبَّةً، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ»

বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ভ্রমণকালে এক কাফেলার সাথে মিলিত হলাম। যখন তারা তাদের আবাসস্থলে পৌঁছল, তারা তাদের এক ব্যক্তিকে বের করে আনল এবং তার

গর্দান আলাদা করে ফেলল। আমি তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, সে তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছিল।[৩৭৩]

দ্বিতীয় হাদিসে এভাবে বলা হয়েছে–

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ»

হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তার কাছে একটি ঝান্ডা ছিল। আমি বললাম, কোনো দিকে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি যেন তাকে হত্যা করে ফেলি এবং তার সম্পদ জব্দ করি।

ফিকহে হানাফিতে মাহরাম নারীদের বিবাহ

এবার হানাফিদের ফাতওয়া দেখুন, ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে আছে,

وكذلك لو تزوج بذات رحم محرم نحو البنت والأخت والأم والعمة والخالة وجامعها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن قال علمت أنها علي حرام.

এমনিভাবে যদি কেউ চিরকালীন হারাম কোনো মহিলাকে বিবাহ করে, যেমন মেয়ে, বোন, মা, ফুফু অথবা খালা এবং তারপর তার সাথে সহবাস করে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর মতে তার উপর কোনো হদ আসবে না, চাই সে একথা জেনেই করুক যে, একাজ আমার উপর হারাম।[৩৭৪]

---

৩৭৩. আবু দাউদ : ৪৪৫৬।

৩৭৪. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি : ৩/৪৬৮।

সপ্তবিংশ আপত্তির জবাব

এ আপত্তির কয়েকটি জবাব রয়েছে–

জবাব নং (১)

শরিয়ত যিনাকারীর জন্য যে হদ নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে রজম (পাথর মেরে হত্যা) অথবা জালদ (বেত্রাঘাত)। কোনো একটা হাদিসেও একথা আসেনি যে, যে ব্যক্তি চিরকালীন হারাম কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করবে তাকে রজমের শাস্তি দেওয়া হবে বা বেত্রাঘাত করা হবে। এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহ. এমন ব্যক্তির জন্য এই হদ (রজম বা জালদ) এর কথা বলেননি। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর এ মাসআলাকে যদি আপত্তি উত্থাপনকারী হাদিসের খেলাফ মনে করে, তাহলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে এমন কোনো হাদিস বর্ণনা করা, যার মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্য হদের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য হাদিসসমূহের মধ্যে হত্যা করার হুকুম এসেছে, কিন্তু এর দ্বারা ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এর মত ও মাযহাবই প্রমাণিত হয়। কেননা, হত্যা করা অথবা সম্পত্তি জব্দ করা যিনার ঐ দুই হদের কোনো হদ নয়। ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. বলেন, এ ধরনের ব্যক্তিকে যে শাস্তিই দেওয়া হোক, তা কম, এজন্য শাসক তাকে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি দেবে। ফাতহুল কাদীরে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

ألا ترى أن أبا حنيفة ألزم عقوبة بأشد ما يكون وإنما لم يثبت عقوبة هي الحد فعرف أنه زنا محض عنده إلا أن فيه شبهة.

তুমি কি দেখ না, ইমাম আবু হানিফা রহ. তার জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন? (তবে) বিবাহের কারণে হদ প্রমাণিত নয়। সুতরাং তিনি একে যিনাই মনে করেন, তবে যেহেতু এখানে একটা বিবাহ হয়েছে, তাই এতে এক ধরনের সংশয় এসে গেছে, যার ফলে তার উপর রজম বা জালদের হদ আসছে না। এ এবারতের উদ্দেশ্য কখনই এটা নয় যে, তার উপর কোনো শাস্তিই নেই, বরং তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে হত্যার মাধ্যমে।

জবাব : (২)

তহাবি ২/৭৩ পৃষ্ঠা আছে, এ ব্যক্তি সৎ মাকে বিবাহ করার কারণে মুরতাদ হয়ে গেছে। কারণ সে হারামকে হালাল মনে করেছে। এ জন্য তার উপর মুরতাদ হওয়ার শাস্তি কার্যকর করা হবে আর এটা শুধু বিবাহের আকদ পাওয়া গেলেই কার্যকর করা হবে, এর জন্য সহবাস পাওয়া শর্ত নয়। তবে যদি সে এ বিবাহ হারাম মনে করেই করে, তাহলে সহবাস পাওয়া গেলে তখন এ শাস্তি কার্যকর করা হবে। এমনিভাবে যদি মাহরামের সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করে, তাহলে তখনও হদ কার্যকর হবে। এটাই ইমাম আবু হানিফা ও সুফিয়ান সাওরি রহ. এর মত।

মুহতারাম, একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে, মাসআলার তিনটি সুরত রয়েছে।

প্রথম সুরত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি মাহরাম নারীদের কাউকে বিবাহ করল, যদি সে হালাল ও জায়েয মনে করে এ কাজ করে তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ হয়ে যাবে। তাই তার উপর মুরতাদ হওয়ার শরয়ি শাস্তি কার্যকর করা হবে। আর যদি সে নাজায়েয ও হারাম মনে করে এ কাজ করে, তাহলে তার জন্য শরিয়তের কোনো হদ নির্ধারিত নেই, তবে বিচারক নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন এবং সেটা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে।

দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে, বিবাহের পর যদি সে সহবাসও করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে, অথবা বিচারক যে শাস্তি ইচ্ছা দেবে। তাই বিবাহ ছাড়া যদি কেউ মাহরাম নারীদের কারো সাথে যিনা করে, তাহলে তার উপরও যিনার হদ কার্যকর করা হবে।

জবাব : (৩)

বাকি রইল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য হত্যার শাস্তির হুকুম প্রদান প্রসঙ্গ, তো এ ব্যাপারে কাযি শাওকানি বলেন, সে হারাম কাজকে হালাল মনে করেছে, যা কুফরকে আবশ্যক করে, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে।[৩৭৫]

---

৩৭৫. নাইলুল আওতার : ৭/১২২।

বোঝা গেল, এ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হদ হিসাবে ছিল না, বরং মুরতাদ হওয়ার শাস্তি ছিল। ইমাম হাফেয ইবনুল হুমাম হানাফি রহ. বলেন, এ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ছিল।[৩৭৬]

এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মতবিরোধ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির ক্ষেত্রে নয়, বরং এক্ষেত্রে যে, এ মৃত্যুদণ্ড কি হদ বা শরয়ি শাস্তি না রাষ্ট্রীয় শাস্তি? দুররে মুখতার : ৩/১৭৯ এর মধ্যে আছে, তাকে রাষ্ট্রীয় শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আলমগিরী : ২/১৪৮ এর মধ্যে আছে, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। তহাবি : ২/৯৭ এ আছে, এটা যিনা থেকেও বড় গোনাহ।

ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة.

তার উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে কঠিন শাস্তি ওয়াজিব হবে। হাফেয ইবনে হুমাম রহ. বলেন, যদি কেউ বলে, মা-মেয়ে ও এ ধরনের অন্যদের সাথে বিবাহ জায়েয, তাহলে সে কাফের, মুরতাদ এবং তার উপর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।[৩৭৭]

জবাব : (৪)

আপনাদের খ্যাতনামা শায়েখ নবাব নুরুল হাসান খান রহ. বলেন, যিনার মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।[৩৭৮]

আহলে হাদিস শায়েখ সানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, দাদির সাথে নাতির বিবাহ জায়েয, এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো নস নেই।[৩৭৯]

মুহতারাম, আবু হানিফা রহ. তো না এ বিবাহকে জায়েয বলেছেন, না এটা নসের ভিত্তিতে হারাম হওয়াকে অস্বীকার করেছেন এবং না এর শাস্তিকে অস্বীকার করেছেন। তিনি শুধু এর শাস্তিকে শরয়ি শাস্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় শাস্তি বলেছেন। এর জন্য আপনারা আসমান মাথায় তুলে ফেলেছেন। কিন্তু আপনাদের অঙ্গনে তো সবকিছু কুরআন-হাদিসের লেবেল লাগিয়ে করা হচ্ছে, এর ব্যাপারেও কিছু বিশ্লেষণ তো পেশ করুন।

---

৩৭৬. ফাতহুল কাদীর, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৩৭৭. ফাতহুল কাদীর : ৫/৪২, ত্বহাবী : ২/৯৬।

৩৭৮. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ১১৩।

৩৭৯. আখবারে আহলে হাদীস রমযান ১৩৮৮ হি. মুঈনুল ফিকহের সূত্রে : পৃষ্ঠা ৯৫।

গায়রে মুকাল্লিদদের কিছু মাসআলা

সম্মানিত পাঠক, ফিকহে হানাফির উপর আপত্তিসমূহের জবাব থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমরা উচিত মনে করছি যে, 'যে কোনো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে' এর ভিত্তিতে গায়রে মুকাল্লিদদের কাছে সমাদৃত তাদের শায়েখদের কিতাবসমূহ থেকে কিছু মাসআলা আপনাদের সামনে নমুনা হিসাবে পেশ করা। আর এই বিচারের দায়ভার আমরা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম যে, এ ফিরকা কুরআন-হাদিসের নাম ব্যবহার করে কী পরিমাণ গোমরাহি ও বেহায়াপনা ছড়াচ্ছে।

বীর্য পবিত্র

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, বীর্য সর্বাবস্থায় পবিত্র[৩৮০]

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আল্লামা ওয়াহিদুয যামান খান লেখেন, বীর্য গাঢ় হোক বা পাতলা, শুষ্ক হোক বা ভেজা, সর্বাবস্থায় তা পবিত্র।[৩৮১]

বীর্য খাওয়া জায়েয

খ্যাতনামা গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা আবুল হাসান মুহিউদ্দীন লেখেন, বীর্য পবিত্র এবং একটি মতানুযায়ী এটা খাওয়ারও অনুমতি আছে।[৩৮২]

---

৩৮০. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ১০।

৩৮১. নুযুলুল আবরার : ১/৪৯।

৩৮২. ফিকহে মুহাম্মাদিয়াহ : ১/৪৬।

লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা পবিত্র

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে নারীর লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা পবিত্র। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম ওয়াহিদুয যামান লেখেন, নারীর লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা পবিত্র।[৩৮৩]

লজ্জাস্থান খোলা থাকলেও নামায জায়েয

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, নামাযের মধ্যে যার লজ্জাস্থান সবার সামনে খোলা থাকে, তার নামায সহিহ।[৩৮৪]

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, নারী একান্তে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নামায পড়তে পারবে। এমনিভাবে যদি অনেক নারী একসাথে সবাই নগ্ন হয়ে নামায পড়ে, তাহলেও নামায সহিহ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রী একসাথে জন্মের সময়ের মতো নগ্ন হয়ে নামায পড়লে নামায সহিহ হয়ে যাবে। নারী তার পিতা, ছেলে, ভাই, চাচা, মামা সবার সাথে জন্মের সময়ের মতো নগ্ন হয়ে নামায পড়লেও নামায সহিহ হয়ে যাবে।[৩৮৫]

এমন মনে করবেন না, এগুলো নিরুপায় অবস্থার মাসআলা। আল্লামা ওয়াহিদুয যামান বলেন, কাপড় থাকা অবস্থায়ও যদি নগ্ন হয়ে নামায পড়ে তাহলে নামায সহিহ।[৩৮৬]

পুরুষাঙ্গ অন্যকে দিয়ে স্পর্শ করানো জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের বড় শায়েখ মিয়া নযির হোসাইন লেখেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বোন, মেয়ে ও ছেলে বউকে দিয়ে নিজের রান মালিশ করাতে পারবে, এবং প্রয়োজনের সময় সে নিজের পুরুষাঙ্গও স্পর্শ করাতে পারবে।[৩৮৭]

---

৩৮৩. কানযুল হাকাইক : পৃষ্ঠা ১৬।

৩৮৪. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২২।

৩৮৫. বুদূরুল আহিল্লাহ : ৩৯।

৩৮৬. নুযুলুল আবরার : ১/৬৫।

৩৮৭. ফাতাওয়া নযীরিয়্যাহ : ৩/১৭৬।

পায়ুপথে সহবাস জায়েয

পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করা গায়রে মুকাল্লিদদের মতে জায়েয, এতে গোসলও ওয়াজিব হয় না। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, লজ্জাস্থানের ভেতরে তাকানো মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই।[৩৮৮]

এরপর লেখেন, উরুতে সহবাস করা এবং পায়ুপথে (পেছনের রাস্তায়) সহবাস করা জায়েয, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বরং এটা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। (নাউযুবিল্লাহ)।[৩৮৯]

স্ত্রী ও বাঁদিদের স্বভাবজাত জায়গা ছাড়া অন্য জায়গার ব্যবহারকে অস্বীকার করা জায়েয নেই।[৩৯০]

এরপর লেখেন, পায়ুপথে সহবাস করার দ্বারা গোসলও ওয়াজিব হয় না।[৩৯১]

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান গায়রে মুকাল্লিদদের জন্য একটি বিস্ময়কর ও বিরল মাসআলা এটাও বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ নিজের পায়ুপথে প্রবেশ করায় তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না।[৩৯২]

মুতআ জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের নিকট মুতআ জায়েয। আল্লামা ওয়াহিদুয যামান খান লেখেন, মুতআ জায়েয হওয়া কুরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।[৩৯৩]

যিনা জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে যিনা জায়েয। এতে কোনো হদও আসবে না। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, যাদের

---

৩৮৮. বুদূরুল আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ১৭৫।
৩৮৯. বুদূরুল আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ১৭৫।
৩৯০. হাদিয়্যাতুল মাহদী : ১/১১৮।
৩৯১. হাদিয়্যাতুল মাহদী : পৃষ্ঠা ৩৪।
৩৯২. নুযুলুল আবরার : ১/৪১।
৩৯৩. নুযুলুল আবরার : ২/৩।

যিনা করতে বাধ্য করা হয়, তাদের জন্য যিনা করা জায়েয এবং কোনো হদও ওয়াজিব হবে না। নারী বাধ্য হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, পুরুষও যদি বলে, আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমাকে কামতাড়না বাধ্য করেছে, তাহলে মেনে নেওয়া হবে।[৩৯৪]

মা, বোন ও মেয়ের শরীর দেখা জায়েয

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, মা, বোন, মেয়ে ও এ রকম যারা আছে, তাদের লজ্জাস্থান ও পায়ুপথ ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর দেখা জায়েয আছে।[৩৯৫]

বেগানা মহিলা দাড়ি বিশিষ্ট পুরুষকে দুধ পান করানো জায়েয

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, এটা জায়েয আছে যে, মহিলা বেগানা পুরুষকে সরাসরি স্তন থেকে দুধ পান করাবে, যদিও ঐ পুরুষ দাড়ি বিশিষ্ট হয়, যাতে তাদের একজন অন্যজনের সাথে দেখা দেওয়া জায়েয হয়ে যায়।[৩৯৬]

চারজনের বেশি বিবাহ করা জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে মানুষ একই সময়ে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারে। নবাব সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, চারজনের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, যত ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারবে।[৩৯৭]

নিজের মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে নিজেরই বীর্য থেকে জন্ম নেওয়া মেয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

---

৩৯৪. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২০৮।

৩৯৫. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ৫২।

৩৯৬. নুযুলুল আবরার : ২/৭৭।

৩৯৭. যফারুল আমানী : পৃষ্ঠা ১৪১।

নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, যদি কোনো মহিলার সাথে যায়েদ যিনা করে আর ঐ যিনা থেকে মেয়ে জন্ম হয়, তাহলে যায়েদ তার এই মেয়েকে বিবাহ করতে পারে।[৩৯৮]

হস্তমৈথুন জায়েয

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে হস্তমৈথুন জায়েয। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, যদি গুনাহ থেকে বাঁচা মুশকিল হয় তাহলে হস্তমৈথুন ওয়াজিব।[৩৯৯]

এরপর লেখেন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যেও কেউ কেউ হস্তমৈথুন করতেন। (নাউযুবিল্লাহ)[৪০০]

একই নারী পিতা-পুত্র উভয়ের জন্য হালাল

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, যদি পুত্র কোনো নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে এ নারী পিতার জন্য হালাল। এমনিভাবে এর বিপরীত ক্ষেত্রেও হালাল হবে।[৪০১]

পিতা ও পুত্রের অংশীদারিত্বপূর্ণ স্ত্রী

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, যদি কেউ নিজের মায়ের সাথে যিনা করে, যিনাকারী বালেগ হোক বা নাবালেগ হোক অথবা বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী হোক, তাহলে এ মহিলা তার স্বামীর জন্য হারাম হবে না।[৪০২]

যিনার সন্তান বণ্টনের পদ্ধতি

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, এক নারীর সাথে তিন পুরুষ পালাক্রমে সহবাস করল এবং এ তিনজনের সহবাসের পর সন্তান জন্ম নিল, এ

---

৩৯৮. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ১০৯।
৩৯৯. উরফুল জাদী : পৃ. ২০৭।
৪০০. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২০৭।
৪০১. নুযুলুল আবরার : ১/২৮।
৪০২. নুযুলুল আবরার : ২/২৮।

অবস্থায় এ সন্তানের ব্যাপারে লটারি দেওয়া হবে, যার নাম লটারিতে আসবে সে এই সন্তান পেয়ে যাবে এবং সে অন্য দুজনকে এক দিয়তের দুই তৃতীয়াংশ দেবে।[৪০৩]

গায়রে মুকাল্লিদদের দৃষ্টিতে উত্তম নারী

গায়রে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আল্লামা ওয়াহিদুয যামান উত্তম নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখেন, উত্তম নারী সে, যার লজ্জাস্থান সরু হয় এবং যে কামতাড়নায় দাঁতে দাঁত চাপে এবং সহবাস করানোর সময় কাত হয়ে শোয়।[৪০৪]

লজ্জাস্থানের জায়গা ঠিক রাখার টিপ্স

গায়রে মুকাল্লিদদের সর্বজনবিদিত শায়েখ মিয়া নযির হোসাইন দেহলবী লেখেন, নারী তার নাভির নিচের পশম ক্ষুর ইত্যাদি দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত নয়, কারণ এগুলো উপড়ালে লজ্জাস্থানের জায়গা ঢিলা হয়ে যায়।[৪০৫]

নারী হায়েয থেকে কীভাবে পবিত্র হবে

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আল্লামা ওয়াহিদুয যামান নারীদের হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, নারী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে, তখন দেওয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং এক পা এভাবে ওঠাবে, যেমন কুকুর পেশাব করার সময় ওঠায় এবং তুলার দলা লজ্জাস্থানে ঢুকাবে, এরপর তা বের করবে, এভাবে সে পরিপূর্ণ পবিত্র হবে।[৪০৬]

---

৪০৩. নুযুলুল আবরার : ২/৭৫।
৪০৪. লুগাতুল হাদীস : ৬/১৫৬।
৪০৫. ফাতাওয়া নযীরিয়্যাহ : ২/৫২৬।
৪০৬. লুগাতুল হাদীস।

হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মৌলবি আবুল হাসান মুহিউদ্দীন লেখেন, হায়েযা হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে গোসল করে নেবে, এরপর তুলার দলার সাথে সুগন্ধি লাগিয়ে লজ্জাস্থানের ভেতর রাখবে।[৪০৭]

শূকরের সম্মান

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, শূকর পবিত্র, শূকরের হাড়, মেরুদণ্ড, খুর, শিং ও থুতনি সব পবিত্র।[৪০৮]

শূকর মায়ের মত পবিত্র

আল্লামা সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, শূকর হারাম হওয়া দ্বারা এর নাপাক হওয়া কোনো অবস্থাতেই প্রমাণিত হয় না। যেমন মা হারাম, কিন্তু অপবিত্র নন।[৪০৯]

শূকরের ঝুটা ও কুকুরের পেশাব-পায়খানা পবিত্র

আল্লামা ওয়াহিদুয যামান লেখেন, লোকেরা কুকুর ও শূকর এবং এগুলোর ঝুটার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে। অধিক অগ্রগণ্য মত এই যে, এগুলোর ঝুটা পবিত্র। এমনিভাবে লোকেরা কুকুরের পেশাব-পায়খানার ব্যাপারেও মতবিরোধ করেছে, সত্য কথা হচ্ছে, এগুলো অপবিত্র হওয়ার উপর কোনো দলিল নেই।[৪১০]

গাধী, কুত্তি ও শূকরীর দুধ গায়রে মুকাল্লিদদের মতে পবিত্র

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম নবাব সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, গাধী, কুত্তি, ও শূকরীর দুধ পবিত্র।[৪১১]

---

৪০৭. ফিকহে মুহাম্মাদিয়্যাহ : ১/৩২।
৪০৮. কানযুল হাকাইক : পৃষ্ঠা ১৩।
৪০৯. বুদূরুল আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ১৬।
৪১০. নুযুলুল আবরার : ১/৫০।
৪১১. বুদূরুল আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ১৮।

গায়রে মুকাল্লিদদের মতে হালাল প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র

মুফতি আবদুস সাত্তার কুরআনে পাকের অনুবাদ তরজমায়ে সাত্তারিয়্যাহ এর লেখক বলেন, হালাল প্রাণীসমূহের পেশাব ও পায়খানা পবিত্র। কোনো কাপড়ে লাগলে তাতে নামায নামায পড়া জায়েয। এছাড়া এগুলোকে ওষুধ হিসাবেও ব্যবহার করা জায়েয।[৪১২]

ঘোড়া হালাল

নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, ঘোড়া খাওয়া হালাল।[৪১৩]

ঘোড়ার কুরবানি জরুরি

মুফতি আবদুস সাত্তার সাহেব লেখেন, ঘোড়ার কুরবানি করাও প্রমাণিত বরং জরুরি।[৪১৪]

গুইসাপ হালাল

নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, গুইসাপ হালাল।[৪১৫]

সজারু হালাল

নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, সজারু খাওয়া হালাল।[৪১৬]

সামুদ্রিক মৃত প্রাণী হালাল

নবাব নুরুল হাসান খান লেখেন, সামুদ্রিক মৃত প্রাণী হালাল।[৪১৭]

---

৪১২. ফাতাওয়া সাত্তারিয়্যাহ : ১/৪৯-৫৬।
৪১৩. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২৩৬।
৪১৪. ফাতাওয়া সাত্তারিয়্যাহ : ১/১২৭, ১২৮।
৪১৫. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২৩৬।
৪১৬. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২৩৫।
৪১৭. উরফুল জাদী : পৃষ্ঠা ২৩৮।

স্থলভাগের ঐ সকল প্রাণী হালাল, যেগুলোতে রক্ত নেই

নবাব সিদ্দিক হাসান খান লেখেন, স্থলভাগের যে সকল প্রাণীতে রক্ত নেই, এগুলো সব হালাল।[৪১৮]

আবদুল্লাহ রোপড়ীর কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডার

প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম ও গায়রে মুকাল্লিদদের বড় মুহাদ্দিস হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী (তিনি মুনাযেরে ইসলাম হাফেয আবদুল কাদের রোপড়ীর চাচা, ফাতাওয়া আহলে হাদিস তারই ফাতওয়ার সংকলন) কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার বর্ণনা করতে গিয়ে নারী ও পুরুষের লজ্জাস্থানের আকৃতি এবং নারী-পুরুষের যৌন সঙ্গমের পদ্ধতির মতো অনর্থক ও অশ্লীল কথাবার্তা বর্ণনা করেছেন। আসুন, এ জ্ঞানভাণ্ডারের সামান্য নমুনা দেখুন।

নারীর জরায়ুর আকৃতি

গায়রে মুকাল্লিদদের মুহাদ্দিসে আযম আবদুল্লাহ রোপড়ী বলেন, জরায়ুর আকৃতি অনেকটা পাত্রের মত। জরায়ুর গর্দান সাধারণত যার জরায়ু তার আঙ্গুল হিসাবে ছয় থেকে এগারো আঙ্গুল পর্যন্ত হয়ে থাকে। সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ জরায়ুর গর্দানে প্রবেশ করে এবং ঐ রাস্তায় বীর্য জরায়ুতে পৌঁছে। যদি জরায়ুর গর্দান ও পুরুষাঙ্গ লম্বায় সমান হয় তাহলে বীর্য জরায়ুর মধ্যখানে (গভীরে) পৌঁছে যায়, নচেৎ তা পশ্চাতে থেকে যায়।

বীর্য জরায়ুতে পৌঁছানোর অন্য পদ্ধতি

হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী লেখেন, কোনো কোনো সময় পুরুষের বীর্য খুব জোরে বের হয়, তো এটাও জরায়ুর গভীরে পৌঁছানোর একটা উপায়। কিন্তু এটা পুরুষত্বের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

জরায়ুর পূর্ণ চিত্র

হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী লেখেন, জরায়ু মূত্রথলি ও পায়খানা বেরুনোর নাড়ির মধ্যখান বরাবর মেরুদণ্ডের মতো সাদা রঙের গর্দান-বিশিষ্ট একটি

---

৪১৮. বুদূরুর আহিল্লাহ : পৃষ্ঠা ২৪৮।

অঙ্গ, যার আকৃতি অনেকটা উল্টানো পাত্রের মতো বলা হয়। কিন্তু কুদরত এর পূর্ণ চিত্র একজন পুরুষের মধ্যেও রেখেছেন। পুরুষ যদি তার লিঙ্গকে উঠিয়ে নিম্নাঙ্গের সাথে লাগায় তাহলে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ একসাথে মিলে জরায়ুর পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে।[৪১৯]

পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থানের সঙ্গম এবং গর্ভধারণ

গায়রে মুকাল্লিদদের মুহাদ্দিস রোপড়ী সাহেব লেখেন, পুরুষাঙ্গ জরায়ুর গর্দানের মতো আর অণ্ডকোষদ্বয় জরায়ুর পেছনের অংশের মতো। জরায়ুর পেছনের অংশ নাভির কাছ থেকে শুরু হয় আর জরায়ুর গর্দান নারীর লজ্জাস্থানে অবস্থিত। যেমন একটা হাতা অন্য একটা হাতার মধ্যে থাকে। জরায়ুর গর্দানে অতিরিক্ত কিছু গোশত থাকে, একে জরায়ুর মুখ বলে এবং এ মুখ সব সময় বন্ধ থাকে। সহবাসের সময় পুরুষাঙ্গ ভেতরে গেলে খোলে অথবা বাচ্চা জন্ম হওয়ার সময় খোলে।

কুদরত জরায়ুর মুখে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় একধরনের আনন্দদায়ক অনুভূতি রেখেছেন। যদি পুরুষাঙ্গ একে স্পর্শ করে, তাহলে পুরুষ-নারী উভয়ে পুলক অনুভব করে। বিশেষ করে যখন পুরুষাঙ্গ ও জরায়ুর গর্দানের দৈর্ঘ্য এক সমান হয়, তখন এটা পুরুষ ও নারীর ভালোবাসার পূর্ণতা, চরম সুখ ও গর্ভধারণের মাধ্যম হয়।

জরায়ু বীর্যের জন্য পাগলপারা থাকে, তাই সহবাসের সময় জরায়ুর দেহ গর্দানের দিকে ঝুঁকে যায়। গর্দান সাধারণত যার জরায়ু তার ছয় আঙ্গুল পরিমাণ হয় আর বেশির থেকে বেশি এগারো আঙ্গুল পরিমাণ হয়।

জরায়ুর অবস্থানস্থল

হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী লেখেন, জরায়ুর মুখ নারীর লজ্জাস্থানের মধ্যে পেশাবের ছিদ্রের এক আঙ্গুলের চেয়ে কিছুটা কম পেছনে হয়।[৪২০]

---

৪১৯. প্রাগুক্ত।

৪২০. প্রাগুক্ত।

ভেতরের খবর

হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী লেখেন, আর জরায়ুর গর্দান কোনো নারীর ক্ষেত্রে ডান দিকে আর কোনো নারীর ক্ষেত্রে বাম দিকে ঝুঁকে থাকে। জরায়ুর বাইরের দিক যদিও এত নরম হয় না, কিন্তু এর অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত নরম ও কুঁচকানো থাকে, যাতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করার সময় উভয়ে পুলক অনুভব করে। এ ছাড়া তা রাবারের মতো প্রসারিত ও কুঞ্চিত হয়, যাতে যতটুকু লিঙ্গ প্রবেশ করে ততটুকু তা বড় হতে পারে। কুমারী মেয়েদের জরায়ু মুখে কিছু রগ জালের মতো থাকে, যা প্রথম সহবাসের সময় ছিঁড়ে যায়, এটাকে কুমারীত্ব শেষ হয়ে যাওয়া বলে।[৪২১]

সহবাসের উত্তম পদ্ধতি

গায়রে মুকাল্লিদদের মুহাদ্দিসে আযম হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী লেখেন, আর সহবাসের উত্তম পদ্ধতি হলো, নারী চিৎ হয়ে নিচে শুয়ে থাকবে আর পুরুষ তার উপরে থাকবে। নারীর ঊরু উঠিয়ে অনেক শৃঙ্গারের পর যখন নারীর চোখের রং পাল্টে যাবে এবং তার পূর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এবং সে পুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকবে তখনই লিঙ্গ প্রবেশ করাবে। এ রকম করা হলে পুরুষ ও নারীর পানি একসাথে বের হয়ে সাধারণত গর্ভধারণ হয়ে যায়।[৪২২]

পাঠক, এই হচ্ছে হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ীর কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডার। প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীও এ জ্ঞানভাণ্ডার তার আখবারে মুহাম্মদীতে নকল করেছেন এবং শিরোনাম দিয়েছেন, আবদুল্লাহ রোপড়ী, তানযিমে মাআরেফে কুরআনির এডিটর, এটা যৌনবিজ্ঞান না রমণীসুখ না ব্যভিচারে উসকানি?

---

৪২১. তানযীমে আহলে হাদীস রোবড়ী, ১লা জুন ১৯৩২ ইং, পৃষ্ঠা ৩, কলাম নম্বর ৩।

৪২২. আখবারে মুহাম্মাদী সূত্রে, ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৯ ইং, কলাম ৩।

এ কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপারে মাওলানা জুনাগড়ীর পর্যালোচনা

এ কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপারে পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ গায়রে মুকাল্লিদ আলেম মুহাম্মদ জুনাগড়ী গায়রে মুকাল্লিদদের মুফাসসিরে কুরআন ও বড় মুহাদ্দিস হাফেয আবদুল্লাহ রোপড়ী সম্পর্কে লেখেন, রোপড়ী কুরআনী জ্ঞানভাণ্ডার বর্ণনা করতে গিয়ে বেশ্যা ও বেশ্যার দালালদের বাসনা পূরণ করেছেন এবং কৌতুকামোদী লম্পটদের সকল মনস্কামনা পূরণ করেছেন।[৪২৩]

মাওলানা জুনাগড়ীর শালীন ভাষা

পাঠক, জুনাগড়ী সাহেবের 'শালীন' ভাষার নমুনা আপনারা লক্ষ করেছেন। আফসোস! বর্তমানে সউদি আরবে কুরআনে কারিমের যে উর্দু তরজমা বিলি করা হচ্ছে, তা এই শায়েখ জুনাগড়ীর।

শেষকথা

পাঠক, এগুলো তো নমুনা হিসাবে গায়রে মুকাল্লিদদের কিছু কিতাবের সামান্য সংখ্যক উদ্ধৃতি। নচেৎ যদি আপনারা গায়রে মুকাল্লিদদের কিতাবগুলোকে একত্র করে দেখেন, তাহলে অসংখ্য নির্লজ্জতাপূর্ণ ও নোংরা মাসআলা আপনাদের চোখে পড়বে। আর তাও কুরআন ও হাদিসের লেবেলে।

আমরা এ সকল মাসআলা বাধ্য হয়ে লিখেছি। যদি আপত্তি উত্থাপনকারী এমন কাজ না করে অথবা গায়রে মুকাল্লিদদের আরো যারা আছে, তারা এমন কাজ না করে, তাহলে আমাদেরও এসব করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যদি ফিকহে হানাফির উপর অসার সব আপত্তি করা হয় এবং ফিকহে হানাফির কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত মাসআলাকে—নাউযুবিল্লাহ—নোংরা, কুরআন ও হাদিস বিরোধী এবং নির্লজ্জ বলা হয়, তাহলে

---

৪২৩. আখবারে মুহাম্মাদী : ১৫ এপ্রিল ১৯৩৯ ইং, পৃষ্ঠা ১৩।

আমাদেরও এ অধিকার আছে যে, আমরা গায়রে মুকাল্লিদদের আসল চেহারা তাদেরই কিতাব থেকে দেখিয়ে দেব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহর উপর সত্যিকার আমলকারী বানান এবং আল্লাহর নেককার বান্দা ও সালাফে সালিহিনের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ থেকে হেফাজত করেন। আমিন।

মাকতাবুল হেরা কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ ও সৃজনশীল বইসমূহ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর গ্রন্থসমূহ

১. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস [১-৭]
২. নবীয়ে রহমত
৩. আমার আম্মা
৪. ঈমান যখন জাগল
৫. ইসলাম ধর্ম : সমাজ : সংস্কৃতি
৬. কাদিয়ানী মতবাদ : ইসলাম ও নবীজীর বিপক্ষে বিদ্রোহ
৭. ছোটদের সীরাতুন্নবী সা.
৮. প্রাচ্যের উপহার
৯. শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. জীবন ও কর্ম
১০. সীরাতে রাসুলে আকরাম সা.
১১. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল? [প্রকাশের পথে]
১২. নারীদের দীনি খেদমত
১৩. ইসলামী জাগরণের রূপরেখা

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী-এর গ্রন্থসমূহ

১৪. ফিকহী মাকালাত [১]
১৫. ফিকহী মাকালাত [২]
১৬. ফিকহী মাকালাত [৩]
১৭. ফিকহী মাকালাত [৪]
১৮. ফিকহী মাকালাত [৫]
১৯. ফিকহী মাকালাত [৬]
২০. ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাযায়িল ও মাসায়িল
২১. বেচাকেনার জায়েয-নাজায়েয পদ্ধতি
২২. ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি ও ইসলামী বিনিয়োগপদ্ধতি
২৩. বীমা তাকাফুল : প্রচলিত পদ্ধতি ও শরয়ী রূপরেখা
২৪. ইসলাম ও রাজনীতি
২৫. নাঙ্গা তলোয়ার [গোস্তাখে রাসুল হুঁশিয়ার]
২৬. চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী আহকাম
২৭. বুজুর্গ মনীষীদের নির্বাচিত বাণী
২৮. বিবেকের আদালত ও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস

২৯. নারীর ভূষণ
৩০. খেলাধুলা ও বিনোদন : শরয়ী সীমারেখা
৩১. ইসলামী সাংবাদিকতা
৩২. হত্যা ও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে রাসূল সা. এর বাণী
৩৩. ইতেকাফের ফাযায়েল ও মাসায়েল
৩৪. রেডিও পাকিস্তানে আল্লামা তাকী উসমানী-এর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
৩৫. সূরায়ে ফাতেহার তাফসীর
৩৬. আসুন সংশোধন হই
৩৭. অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা
৩৮. বর্তমান প্রেক্ষাপটে ফারেগীন ছাত্রদের দায়িত্ব-কর্তব্য
৩৯. দরসে কুরআন (১-৫) [প্রকাশের পথে]

আকাবির সিরিজ

৪০. হযরত আববুকর সিদ্দিক রা. জীবন ও সংগ্রাম
৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. জীবন ও কর্ম
৪২. ইমামু দারিল হিজরাহ মালিক বিন আনাস রহ. জীবন ও কর্ম
৪৩. সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. জীবন ও কর্ম
৪৪. মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশমীরী রহ. জীবন ও কর্ম
৪৫. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. জীবন ও কর্ম
৪৬. মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. জীবন ও কর্ম
৪৭. শাইখুল হাদিস যাকারিয়া রহ.-এর আব্বাজান
মাওলানা ইয়াহহিয়া কান্ধলভী রহ. জীবন ও কর্ম
৪৮. মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. জীবন ও কর্ম
৪৯. শাইখুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. জীবন ও কর্ম
৫০. মাওলানা উবায়দুল হক রহ. জীবন ও কর্ম
৫১. আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ. জীবন ও কর্ম
৫২. মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী : জীবন ও কর্ম
৫৩. বুজুর্গ মনীষীদের নির্বাচিত বাণী
৫৪. আকাবিরের ইলম সাধনা : বিস্ময়কর ঘটনাবলী
৫৫. বড়দের তাহাজ্জুদ ও রাত জাগরণ
৫৬. আকাবিরে দেওবন্দের ছাত্রজীবন
৫৭. মানাযির আহসান গিলানী রহ. জীবন ও কর্ম

৫৮. আকাবিরে সিত্তাহ
[দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ছয় মনীষীর জীবন ও কর্ম]
৫৯. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. জীবন ও কর্ম
৬০. আরেফবিল্লাহ শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার রহ. জীবন ও কর্ম

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

৬১. পরকাল [৪ কালার]
৬২. হতাশ হবেন না [২ কালার]
৬৩. তুমি সেই ভাগ্যবতী [২ কালার]
৬৪. শানে রিসালাত
৬৫. শানে সাহাবা
৬৬. মহানবী সা. এর প্রতিরক্ষা কৌশল
৬৭. গুনাহমুক্ত জীবন
৬৮. কালোজীবন
৬৯. সুন্দর জীবন
৭০. কুরআন সংকলনের ইতিহাস
৭১. হে বোন, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?
৭২. নারী নেতৃত্বের শরয়ী বিধান
৭৩. আমালিয়াতে কাশমীরী [পরীক্ষিত তদবীরের একটি কিতাব]
৭৪. ১০০ রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
৭৫. মাকবূল দোয়া ও মাসনূন আমল
৭৬. কোন পথে ইউরোপের ইসলাম?
৭৭. ফিলিস্তিনের জন্য ভালোবাসা
৭৮. এই পৃথিবীর পাতায় পাতায় (ছোটদের গল্প)
৭৯. যেভাবে যোগ্য আলেম হবেন
৮০. সীরাত ও মিলাদের ব্যবধান
৮১. আলকুরআনে নারীর কাহিনী
৮২. নাস্তিকতার স্বরূপ সন্ধানে
৮৩. নির্বাচিত ৯৯ মোযাকারা
৮৪. হাদিসের আলোক আহনাফ ও আহলে হাদিসের নামায
৮৫. বার চাঁদের ফাযায়িল ও মাসায়িল
৮৬. ইসলামী শিষ্টাচার
৮৭. কবিরা গুনাহ
৮৮. মিলাদ-কিয়াম ও হাযির-নাযির [বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা]

৮৯. সন্তানপ্রতিপালনের মৌলিক গুণাবলি
৯০. এই সেই লেলিহান আগুন
৯১. হাদিস অস্বীকারের পরিণতি
৯২. আহলে হাদিস সম্প্রদায় : ইতিহাস, ভ্রান্তি ও তার সমুচিত জবাব
৯৩. ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে লা-মাযহাবী
৯৪. আপনি কেন মাযহাব মানবেন
৯৫. ফিকহে হানাফীর শ্রেষ্ঠত্ব
৯৬. আহলে হাদিসের কাঠগড়ায় সহীহ বুখারী
৯৭. জীবনের লক্ষ্য
৯৮. আত্মার পরিচয়
৯৯. আলকুরআনে আদেশসূচক ক্রিয়া
১০০. আল-কুরআনে নিষেধসূচক ক্রিয়া
১০১. সহজে আরবী শিখি
১০২. আধুনিক আরবী যেভাবে বলবেন
১০৩. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.
১০৪. মুহাম্মদ বিন কাসিম : জীবন ও সংগ্রাম
১০৫. মনীষীদের দৃষ্টিতে সময়ের মূল্য
১০৬. আহলে হাদিসের প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন
১০৭. হাদীস ও আহলে হাদীস
১০৮. নীল সবুজের দেশে
১০৯. এ যুগের পয়গাম
১১০. উসওয়ায়ে রাসুলে আকরাম সা.
১১১. আদর্শ শিক্ষক : রাসূলুল্লাহ সা.
১১২. আলাইকুম বিসুন্নাতি
১১৩. আমালে কুরআনী
১১৪. কালিলা ও দিমনার বুদ্ধির গল্প
১১৫. বক্তৃতার আসর
১১৬. মায়ের জন্য ভালোবাসা
১১৭. মৃত্যুর সাথে বসবাস
১১৮. যিকর ও ফিকর
১১৯. শওকে হাদিস
১২০. আমাদের প্রিয়নবী সা.

মাকতাবাতুল হেরা

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
মী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), দোকান নং-৩, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২২

যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা বিক্রয়কেন্দ্র
৮২/১২ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২৩

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী বিক্রয়কেন্দ্র
কিতাব মার্কেট, দোকান নং-২৩,২৪ মাদ্রাসা রোড, ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৯৬১-৪৬৭১৮১, ০১৯৫৫-২৪২৫২৩

cover ■ kazi jubair mahmud . 01830338105